ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

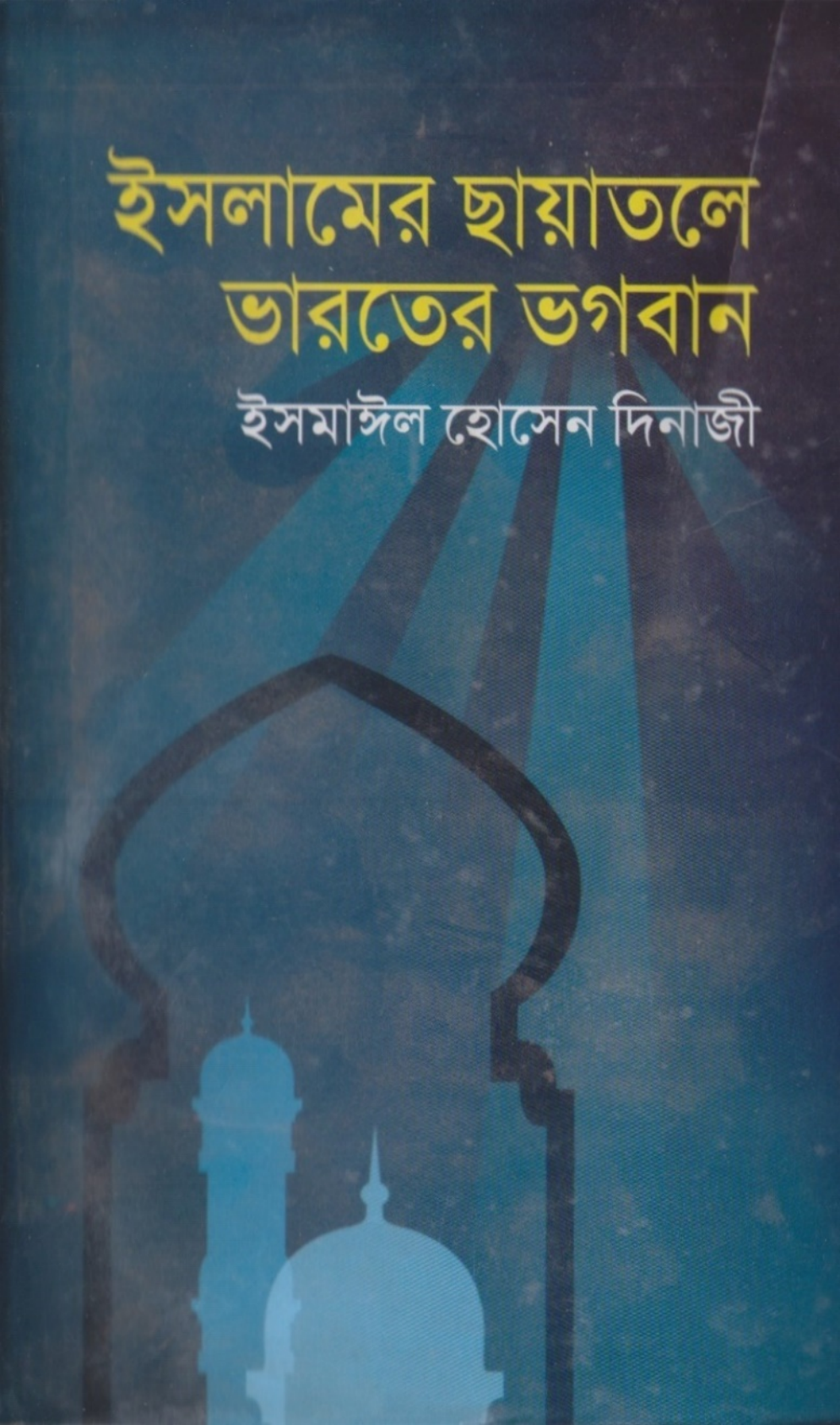

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী। মা-বাবার রাখা নাম সুরেন্দ্র নাথ রায়। বাবা শান্তরাম রায়। মা শ্রীমতি পার্বতী রায়। জন্ম বৃহত্তর দিনাজপুর (বর্তমান ঠাকুরগাঁও) এর পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নভুক্ত নিভৃত ছোট্টগ্রাম গিলাবাড়িতে। স্কুলে ভর্তির সময় জন্মতারিখ লেখা হয় অনুমানভিত্তিক ১-১০-১৯৫৮ ঈসায়ী। মা-বাবা নিজেদেরই জন্মতারিখ জানেন না। সন্তানের জন্মতারিখের গুরুত্ব তাঁরা কী বুঝবেন? পারিবারিক দুর্ঘটনাক্রমে সুরেন্দ্রকে বাবার সঙ্গে গিলাবাড়ি থেকে ৪মাইল দূরে মল্লিকপুর গিয়ে থাকতে হয়। বাবা নিজেই ভগ্নস্বাস্থ্য। সন্তানের সেবাযত্নের সুযোগ কোথায়? মা কাছে নেই। একদম শৈশবে মায়ের পিতামহী পদ্মেশ্বরী রায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনিও বেশিদিন বেঁচে থাকেননি। বাবা ১৯৬৪ সালের একদিন হঠাৎ করে ছেলেকে বুড়ো আঙুলে ছাপ দেখিয়ে বললেন, "তোকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। কাল থেকে পড়তে যাস।" অবশ্য একজন প্রতিবেশি ছাত্রের কাছ থেকে তখনকার প্রথমশ্রেণীর 'সবুজ সাথী' বইখানাসহ অনেকের সংখ্যাসমূহ তাঁর শেখা হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে ভর্তির পরের দিন থেকেই নিয়মিত পড়ালেখা শুরু করেন তিনি। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকদের কাছ থেকে আদরস্নেহ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন স্কুলজীবনের শুরুতেই। ১৯৭০ সালে জাবরহাট হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় দিনাজপুর আদালতের প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট দাখিল করে পৈত্রিক ধর্মত্যাগ করে ইসলামগ্রহণ করেন। বয়স কম থাকায় এসময় তাঁকে আদালত থেকে দু'বার ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার প্রবল আগ্রহের কাছে আদালত কিছুটা নমনীয় হয়। ১৯৭৭ সালে রাজশাহীর গোদাগাড়ি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, ঢাকার আদর্শ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, সরকারি ঢাকা কলেজ থেকে বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে বিএ (অনার্স) ও সর্বশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে পড়ালেখা করে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। স্কুলজীবন থেকেই লেখালেখিসহ সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর হাতেখড়ি। এখনও একটি জাতীয় দৈনিকে কর্মরত। ১৯৯৭ সালে মক্কাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার দাওয়াতে পবিত্র হজ্ব পালন করেন। কলাম, গবেষণামূলক রচনা, ছড়া ও কবিতা লেখেন নিয়মিত। ১৯৭৫ সালে রাজশাহী থেকে তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'আবেহায়াত' প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণামূলক প্রকাশনাসমূহ ইতোমধ্যে শুভানুধ্যায়ীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

–প্রকাশক

ইসলামের ছায়াতলে
ভারতের ভগবান

ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

(সুরেন্দ্রনাথ রায়)

বিএ (অনার্স), এমএ,

বাংলাভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞান বিতরণী

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১২

প্রচ্ছদ
আক্কাছ খান

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি. কে. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১, মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
২৫০ টাকা U.S.$-10.00

ISLAMER CHHAYATOLE VAROTER VOGOWAN
(Indian God is under the Shadow of Islam)
By **Ismil Hossain Dinaji**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 978-984-90108-0-7

পূর্বকথা

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত এবং নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি. ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত 'সরল বাংলা অভিধান'-এর ১০১১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, 'ভগ' শব্দের অন্যান্য অর্থের সঙ্গে গুহ্যদেশ, যোনি, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, যত্ন, ইচ্ছা, মোক্ষ, জ্ঞান, কীর্তি ইত্যাদি এবং 'ভগবান' শব্দের অর্থ ভগযুক্ত, জ্ঞানাদি, ষড়ৈশ্বর্যশালী, মান্য, পূজনীয়, দেবতুল্য ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে।

খুব সহজ এবং সরলভাবে বললে বলতে হয়— জ্ঞান যার আছে তাকে বলে জ্ঞানবান; ধন যার আছে তাকে বলে ধনবান; রূপ যার আছে তাকে বলে রূপবান, গুন যার আছে তাকে বলে গুনবান (স্ত্রীলিঙ্গ হলে জ্ঞানবতী, ধনবতী, রূপবতী, গুনবতী)।

অতএব 'ভগ' যার আছে তিনি 'ভগবান' অথবা 'ভগবতী'। তার মানে সৃষ্টিজগতের ভগযুক্ত সকল প্রাণীই 'ভগবান' আর 'ভগবতী'। এছাড়া লোভ, মোহ, মাৎশর্য, কামনা, বাসনা, মৈথুন্যেচ্ছা প্রভৃতি যে নর-নারী বা প্রাণীর রয়েছে তাও ভগবান বা ভগবতী। এজন্যই ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে বলা হয় নরই নারায়ণ। অর্থাৎ সমস্ত জীবই নারায়ণ বা ভগবান।

ভারতীয় উপমহাদেশে দেবতার কোনও সীমা-সংখ্যা নেই। মানুষ, পশু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, সবই ভগবান। ভগবান বা ভগবতীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা সবই রয়েছে। ভারতীয় ভগবান-ভগবতীরা যেমন বিয়ে-শাদি করেন, তেমনি সন্তানাদিরও জন্ম দেন। তাই এখানকার ভগবান-ভগবতীরা কখনও জন্মদাতা, কখনও জন্মগ্রহণকারী। কখনও পিতা, কখনও পুত্র। কখনও মাতা, কখনও কন্যা। কখনও গৃহী, কখনও বনচারী।

বৃন্দাবনের মঠস্বামী শিবশাক্তি স্বরূপজী তাই কোটি কোটি ভারতীয়ের সাক্ষাৎভগবান বৈকি। তিনি ছিলেন সত্তুর কোটি ভারতীয় হিন্দুর ভগবান। ভক্তরা এসে তার পদমূলে যেমন লুটিয়ে পড়তেন, তেমনি অনেকে তাঁর পাদপদ্মে সপে দিতেন সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থও। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তখন, তিনি যখন

স্ত্রী-কন্যাসহ ভগবানের সিংহাসন থেকে ধূলোর ধরণিতে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হলেন। ভারতীয় মুসলমানরা যখন তাঁকে সাদর বরণ করে বুকে টেনে নিলেন; সারা ভারত এবং আশপাশের দেশগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল অপপ্রচার আর রটনার তান্ডব।

মোহন্ত ড. শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন ধর্মাচার্য। একসময় তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দু ও আর্যসমাজের 'সাক্ষাৎভগবান' হিসেবে বিবেচিত হতেন। ভারতের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ধনী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ তথা সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর কাছে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। এমনকি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গেও শিবশক্তি মহাশয়ের গভীর সখ্য ছিল বলে জানা যায়।

শিবশক্তি স্বরূপজী ১৯৮৬ সালের পবিত্র রমযান মাসে সপরিবার ইসলামগ্রহণ করেন। নিজের নাম রাখেন ইসলাম-উল-হক। স্ত্রীর নাম রাখেন খাদিজা হক। কনিষ্ঠ কন্যা অপরাজিতার নাম রাখা হয় আয়েশা হক। উল্লেখ্য, শিবশক্তির বড়মেয়ে অর্চনার বিয়ে তাদের ইসলামগ্রহণের আগেই সম্পন্ন হয়। সে বর্তমানে ভারতের মুম্বাইতে স্বামীর ঘর-সংসার করছে।

ভুপালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মাহবুব আলী লিখেছেন, 'শিখধর্মের প্রবর্তক গুরুনানকের বংশধর ড. ইসলাম-উল-হক এক অসাধারণ পান্ডিত্যসম্পন্ন গ্রন্থকার, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক, বহু ভাষাবিদ এবং মনো-দৈহিক রোগের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বৃন্দাবনে নিজের আশ্রমে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং পরে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ডিভাইনিটি ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ভ্যাটিক্যানের ষষ্ঠ পোপ পল তাঁকে সম্মানসূচক ও.এফ. এম. ক্যাপ খেতাবে ভূষিত করেন।"*

ইসলামগ্রহণের পূর্বপর্যন্ত শিবশক্তি স্বরূপজীকে ভারতের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ পূজনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করতো বলে নয়াদিল্লির উর্দু সাপ্তাহিক নয়ী

* লিজিয়ে আপ ভি সোচিয়ে, ভুপাল, ভারত।

দুনিয়া, সাপ্তাহিক কান্তি ও গুজরাটের সাপ্তাহিক শাহীনসহ আরও অনেক পত্রিকায় সেসময় বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

১৯৮৭ সালের ১ লা মার্চে প্রকাশিত সাপ্তাহিক শাহীনের সাক্ষাতকারটি একই বছর ৭ মে ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাকেও মুদ্রিত হয়। বৃন্দাবনে, মুম্বাইতে ও দেবালেইনে তাঁর তিনটি আশ্রম ছিল বলে জানা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর পেশা ছিল মোহন্তগিরি।

শিবশক্তির জন্ম ১৯৩৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার তীর্থভূমি বৃন্দাবনে। পিতার নাম মোহন্ত প্রিতমদাস উদাসেন। মাতা ভানুমতি কর। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে শিবশক্তি সবার ছোট। তাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে সর্বস্বামী বা মোহন্ত পুরোহিত।

ইসলামগ্রহণের পর থেকেই শিবশক্তি ও তাঁর পরিবার ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে বাধার সম্মুখীন হতে থাকেন। ভারতীয় মুসলমানদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওপর মহলের চাপে বা ভয়ে কেউই ইসলাম-উল-হক বা তাঁর পরিবারটিকে তেমন সহযোগিতা করতে পারেননি। ফলে তাদের মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভুপাল থেকে উত্তর প্রদেশের ছোট জেলাশহর জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ ও নয়াদিল্লিতে ছুটে বেড়াতে হয়েছে।

১৯৮৯ সালের দিকে বাংলাদেশের একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আমন্ত্রণে ইসলাম-উল-হক সপরিবার এদেশে বেড়াতে আসেন। সেসময় ঢাকাসহ খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নরায়াণগঞ্জ প্রভৃতি শহরে আয়োজিত জলসা বা ধর্মসভায় তাঁর সপরিবার ইসলামগ্রহণের ব্যাখ্যাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগময় বক্তৃতা দিয়ে তিনি সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা দিয়ে সিক্ত করেন। ফলে তিনি ভারতের প্রতিকূল পরিবেশে ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশেই থাকতে চান এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভারতীয় লবির একটি প্রভাবশালী মহলের প্ররোচনায় সেসময় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে একরকম জোর করেই মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকেও তিনি পরিবার নিয়ে ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং জৌনপুর শহরে আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা শুরু করেন। এর ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু সেমিনার-সিম্পোজিয়ামেও তিনি ধর্ম ও দর্শনের ওপর বক্তৃতা দিতেন।

১৯৯৪ সালের দিকে তিনি সপরিবার পাকিস্তান ও ইরান সফরে যান। সেখান থেকে দেশে ফেরার পথে আকস্মিকভাবে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে স্ত্রী খাদিজা ও কন্যা আয়েশা অনেকটা অপ্রস্তুত এবং হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। এ সুযোগে বড় মেয়ে ও জামাতা ইসলাম-উল-হকের লাশগ্রহণ করে মুম্বাইতে নিয়ে তা দাহ্ করবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। কিন্তু স্ত্রী খাদিজা ও কনিষ্ঠ কন্যা আয়েশা বাধা দেন। ইসলাম-উল-হকের লাশ দাহ করবেন কেন? তিনি তো মুসলমান। এ জেদি মেয়েটির আপ্রাণ চেষ্টা ও মুম্বাইয়ের কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সহযোগিতায় লাশটি উদ্ধার করে জানাযা ও দাফনকাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর সঙ্গীহারা খাদিজা ও পিতৃহীন আয়েশা লক্ষ্ণৌর ভাড়াবাসায় গিয়ে দেখেন রেখে যাওয়া জিনিসপত্র সবই লুট হয়ে গেছে। শেষমেশ তাঁরা নয়াদিল্লির নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজার এলাকায় গিয়ে কোনওরকমে মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করে নেন এবং কষ্টেশিষ্টে দিন গুজরান করতে থাকেন। এর মধ্যে বড়মেয়ে আর্চনা ও জামাতা তাঁদের পূর্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্ররোচনা দেয় এবং মুম্বাইয়ে নেবার চেষ্টা চালায়। এমনকি ওপর মহলের পক্ষ থেকেও বারবার বলা হতে থাকে যে, "শিবশক্তিজী তো মস্তবড় ভুল করেছেন, তোমরা মা ও মেয়ে তা শুধরে নাও।" এছাড়াও নানাভাবে তাদের ইসলামত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

নানা হুমকি-ধমকি, অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেই তাঁদের দিন অতিবাহিত করতে হয় নয়াদিল্লিতে। আত্মীয়-স্বজনদের বিদ্রুপ ও পূর্বধর্মে ফিরে যাবার নানা প্রলোভন তো রয়েছেই। তাঁরা আত্মীয়-অনাত্মীয়দের বিদ্রূপবাণ, ওপর মহলের চাপ ও তাঁদের কোনওরূপ সহায়তার ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমানদের অসহায়ত্ব দেখে বেঁচে থাকবার প্রেরণাও কোনও কোনও সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু পবিত্র ইসলামে আত্মহত্যার মতো কোনও ব্যাপার ঘটানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলে তা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইসলাম-উল-হকের বিধবা পত্নী খাদিজা হক শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেকটা বিপন্ন হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ভীষণ রোগাক্রান্ত থাকবার পর কয়েক বছর আগে তিনি নয়াদিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ ঈসায়ী সালের ৩০ জুলাই মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভুপালের নীলম কোলনিতে ড. হকের বাসায় বসে তাঁর যে সাক্ষাতকারটি আমি

গ্রহণ করি, সেটি প্রকৃত অর্থে একটা ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়। সাক্ষাতকারটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাবসহ প্রায় ৩০টিরও বেশি পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে ফলাও করে এবং কোনও কোনওটিতে প্রচ্ছদকাহিনী হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। মরহুম আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মাসিক কাফেলাসহ সেখানকার কয়েকটি কাগজেও সেটি মুদ্রিত হয়।

লন্ডন ও নিউইয়র্কেরও কোনও কোনও বাংলাকাগজে সেটি ছাপা হয়েছিল বলে সেসময় আমাকে অবহিত করা হয়। এমনকি সিসেল দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রকাশিত একটি প্রখ্যাত ইংরেজি সাময়িকীতে আমার গৃহীত সাক্ষাতকারটি ছাপা হয়েছিল, যেটি আমাকে জৌনপুরে ড. হক নিজে দেখিয়েছিলেন।

ড. হকের বাংলাদেশে অবস্থানকালে দৈনিক সংগ্রাম ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁর ওপর অনেকগুলো দীর্ঘ রিপোর্ট করি।

সেই রিপোর্টগুলোর একটি সিরিজের মূল শিরোনাম ছিল **'ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান'**। যেটি সোনার বাংলায় ১৯৮৯ ঈসায়ী সালের ১৯ আগস্ট থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৬ কিস্তিতে অনেকগুলো দুর্লভ ছবিসহ ছাপা হয়। দৈনিক সংগ্রামেও ড. হকের ওপর আমার অনেকগুলো সিরিজ লেখা সেসময় ছাপা হয়েছিল।

পরবর্তীতে ড. হকের ওপর আমার লেখার মূল শিরোনামটির প্রথম ও প্রধান অংশ ব্যবহার করে নাটোরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ এম.এ. হামিদ 'ইসলামের ছায়াতলে' শীর্ষক একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে আমার লেখা হুবহু না থাকলেও ড. হক সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যসমূহ প্রায় আমারই সংগৃহীত ও গ্রন্থিত বৈকি। তাঁর এ উদ্দেশ্যকে আমি কোনওক্রমেই খাটো করে দেখছি না। তবে গ্রন্থটিতে আমার সম্পর্কে কিছু ত্রুটিপূর্ণ তথ্যসহ একটি পরিচিতিও বিবৃত করেছেন তিনি। অবশ্য এজন্য আমি তাঁকে কোনও দায়ী করছি না। কারণ গ্রন্থটি প্রকাশের আগে তিনি বেশ কয়েকবার চিঠি লিখে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। কিন্তু সেসময় তাঁকে সহযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক উপদেষ্টা সম্পাদক ও রাষ্ট্রদূত আমার বড়ভাই তুল্য মরহুম আখতার-উ-আলমও 'সত্য মুক্তি

মানবতা' শিরোনাম দিয়ে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটিতেও আমার গৃহীত ড. ইসলাম-উল-হকের মূল সাক্ষাতকারটিসহ আগ্রার প্রখ্যাত সাংবাদিক সম্পাদক নওমুসলিম দাউদ খান দেশমুখ (দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ)-এর ওপর লেখাটি গুরুত্বসহকারে সংকলিত হয়।

যা হোক, সঙ্গত কারণে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির শিরোনামে 'ইসলামের ছায়াতলে' অংশটুকু আমি ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু 'জ্ঞান বিতরণী'র স্বত্ত্বাধিকারী চৌকস প্রকাশক জনাব মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম আমার অনাগ্রহে বাঁধসাধেন। তাই বাধ্য হয়ে এ গ্রন্থের শিরোনামে আলোচ্য অংশটুকু ব্যবহার করতেই হলো।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি হচ্ছে অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ এবং বড়ভাই আখতার-উল-আলম যেমন আমার লেখা থেকে নিয়ে তাঁদের গ্রন্থে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেছেন, তেমনি আমিও তাঁদের উভয়ের গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এটি সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। অতঃপর আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলের নেক আমল কবুল করেন। আমিন!

বিনয়াবনত
ইসমাঈল হোসেন দিনাজী
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২
ঢাকা

সূচিপত্র

ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান	:	১৩
ইসলাম-উল-হকের বাংলাদেশ সফর	:	৩৩
ড. ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার	:	৩৭
অতীত ও বর্তমানের আয়নায় ইসলাম-উল-হক	:	৪৯
ড. ইসলাম-উল-হকের লেখা থেকে	:	৫১
ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের পটভূমি	:	৫৩
ভগবান যখন মুসলমান	:	৬৩
ভুপালের ডায়েরি	:	৬৯
বাংলাদেশে ড. ইসলাম-উল-হক ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা	:	৭৬
রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে ড. হকের ভাষণ	:	৮০
ভগবানের রাজশাহী সফর	:	৮৩
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য	:	৮৮
ভেলেরিয়া বোরোচভা	:	৯০
কে. এল গাউবা	:	১০২
বশির পিকার্ড	:	১০৪
লর্ড হেডলি আল-ফারুক	:	১০৯
জোনাথন ইয়াহিয়া	:	১১৫
ইউসুফ ইসলাম	:	১১৮
স্যার আব্দুল্লাহ্ আর্চিবল্ড হ্যামিলটন	:	১২২
সানথা হুদা	:	১২৬
আয়েশা জান	:	১২৯
প্রফেসর হারুন মুস্তফা লিওন	:	১৩৩
স্যার জালাল উদ্দিন লডার ব্রান্টন	:	১৩৭
মেভিস বি. জলি	:	১৩৯
আমিনুল ইসলাম খান চক্রবর্তী	:	১৪১
বেগম রওশন রিজিয়া খানম	:	১৪৪
ইভা স্রোভিক আয়েশা	:	১৪৫
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম	:	১৪৬
রেভারেন্ড পল	:	১৪৭

দাবুবু দামারিস : ১৪৮
ড. জিয়াউর রহমান আযমী : ১৫২
দাউদ খান দেশমুখ : ১৫৮
গোলাম মুহাম্মদ : ১৬৩
এন্টনি আবুল খায়ের : ১৬৫
কবি মাধবী কুট্টি কমলা দাস : ১৬৭
এস. এম. আবুল হাদি : ১৬৮
মুহাম্মদ উসামা বিন আব্দুল্লাহ্ : ১৭০
জর্জ আশকভান : ১৭৩
মুহাম্মদ আলী ক্লে : ১৮১
মুহাম্মদ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব : ১৮৮
মরিয়ম জামিলা মারকিউস : ১৯০
নূহ হামিদ কিলার : ১৯৩
তুকলুক তিমুর : ১৯৬
সভেলি কোভালেংকো ফাতেমা : ২০০
সুলাইমান তাকিউচি : ২০১
ড. হামিদ মার্কাস : ২০৩
ইবরাহিম খলিল আহমদ ফিলিপস : ২০৪
নেসরিন : ২০৭
ফাতিমা পাসবান : ২০৮
মুহাম্মদ আমান হবম : ২১৩
ডা. রেবেকা ওয়েড : ২১৫
আমিনা : ২১৭
হেরিতকোর ফাতিমা : ২২১
ডা. আলী সেলমাঁ বেঁয়োস্ত : ২২৩
প্রফেসর আসমা আন সুফিয়ান : ২২৪
ডা. আব্দুর রহমান হিউজ : ২২৭
মাহমুদ গার্নার এরিকসন : ২২৯
মুহাম্মদ আসাদ : ২৩১
ড. আব্দুল করিম জার্মানুস : ২৩৩
আহমদ দিদাত : ২৩৭
সাঈদ ফাকাদু : ২৪১
ক্যাথলিক পাদরি ঈসা : ২৪৩
আবদুর রহিম মরটিনি : ২৪৫
কার্নস মুন এম : ১৪৭

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান

ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের সাক্ষাতভগবান হিসেবে পূজিত ড. শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন এখন সপরিবার ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত। তাঁর বর্তমান ইসলামী নাম ড. ইসলাম-উল-হক। বিদূষী পত্নী শ্রদ্ধাদেবী এখন বেগম খাদিজা হক আর কন্যা অপরাজিতা আয়েশা হক নামে পরিচিত।

ইসলাম-উল-হক

শিবশক্তি ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ মথুরা জেলার বৃন্দাবনে ১৯৩৬ ঈশায়ী সালের ২ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক মোহন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহন্ত প্রিতমদাস উদাসেন। মাতা ভানুমতী কর। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে শিবশক্তি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁরা সকলেই বংশানুক্রমিকভাবে ধর্মগুরু বা মোহন্ত।

উল্লেখ্য, মথুরার এ বৃন্দাবনেই বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। হিন্দুসমাজে বৃন্দাবন পবিত্র তীর্থভূমি হিসেবে গণ্য। রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি হিসেবেও এ স্থানটি সমধিক পরিচিত। পরবর্তীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বৃন্দাবনে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে যমুনা-বিধৌত বৃন্দাবন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দু ঐতিহ্যমতে রাধাকৃষ্ণের পুণ্যপ্রেমের লীলাভূমি এ বৃন্দাবনেই আধুনিক হিন্দুসমাজের আরেক প্রভাবশালী ভগবানপুরুষ শিবশক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মোহন্তগিরি পেশা ছিল তাঁর অঢেল অর্থ উপার্জনের উৎস। অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগীর ভিড় জমে থাকতো তাঁর তিন তিনটি আশ্রমে।

প্রচুর ভোগ্য-নৈবেদ্য পড়তো তাঁর শ্রীচরণে। ভারতের বহু প্রভাবশালী মন্ত্রী আর রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত ভক্ত।

অঢেল বিত্তবৈভব, সম্মান, ভক্তকূলের সেবাযত্ন কোনও কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তওহিদী কালেমার শাশ্বত আহ্বান বারবার তাঁকে সম্মোহিত করেছে। পরিশেষে বিগত ১৯৮৬ ঈশায়ী সালের রমযান মাসে ইসলামগ্রহণ করেন সপরিবার।

খাদিজা হক *আয়েশা হক*

শীর্ষস্থানীয় মোহন্ত ধর্মগুরুর এরকম ধর্মপরিবর্তনের ঘটনায় হতবাক হয়ে যায় ভারতীয় হিন্দুসমাজ। দুঃখ আর ক্ষোভে তাঁরা একরকম সম্বিত হারিয়ে ফেলেন। এদের অনেকেই কেবল ইসলামগ্রহণের অপরাধে তাঁদের সাবেক ভগবান শিবশক্তিকে নানাবিধ অশোভন ভাষায় গালমন্দও শুরু করেন। অথচ ইসলামগ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শিবশক্তি ছিলেন কোটি কোটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীর সাক্ষাৎভগবান। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানান, অটলবিহারী বাজপেয়ী, ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট রামস্বামী ভেংকটরামন, এমনকি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য-সাগরেদ। তাঁর পাদপদ্মে চন্দনচর্চিত পূজা-উপচার আর হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে আশীর্বাদ পেলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করতেন।

ড. ইসলাম প্রায়ই বলতেন, "যারা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেতেন না, আঙুল তুলে কথা বলতে পারতেন না, তারাই আমার ইসলামগ্রহণের পর আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করবার জন্য আমার সম্পর্কে মিথ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপনের পাঁয়তারা করেছেন। অথচ আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলি না।

"তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমি তাদের হাঁড়ির খবর জানি। তারা কে কত গভীর পানির মাছ তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। কিন্তু আমি কাউকে হেয় করতে চাই না। কারণ, কাউকে অপ্রয়োজনে হেয়প্রতিপন্ন করা কিংবা কারুর বিরুদ্ধে বানোয়াট কিছু বলে বেড়ানো মহান ইসলাম আমাকে শেখায়নি। ইসলাম আমাকে মানুষের সম্মান করতে শিখিয়েছে। আমি যে দীনগ্রহণ করেছি সে দীন সত্যকে সত্য ও মিথ্যেকে মিথ্যে বলতে শিখিয়েছে মাত্র।"

ঐতিহ্যবাহী পৈত্রিক আশ্রমের সুবর্ণ সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করে এ ভগাবানপুরুষ যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের সকল সচেতন মুসলিমসমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশ্বের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁকে খোশ আমদেদ জানিয়ে চিঠিপত্র লিখেন। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ঈর্ষা ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনকি ব্রাহ্মণ্যবাদের পতাকাবাহী একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক লোক মথুরা এবং ভুপালে ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে তাঁর ফাঁসির দাবিতে বিভিন্ন উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। 'নবভারত সমাচার', নবভারত টাইমস, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে কিছু উস্কানিমূলক নিবন্ধও মুদ্রিত হতে থাকে। ড. ইসলাম অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এসব বিদ্বেষপূর্ণ নিবন্ধের লাগসই জবাব দিয়েছেন তাঁর লিখিত হিন্দিভাষায় 'খুলাপত্র' ও উর্দুভাষায় 'লিজিয়ে আপভি সোচিয়ে' প্রভৃতি পুস্তিকার মাধ্যমে। এ দুটো পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে।

পিতা প্রিতম দাস উদাসেন মোহন্তের আশ্রমেই শিবশক্তির প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওরিয়েন্টালিজমে মাস্টার্স, গুরুকূল কাংড়ি থেকে 'আচারিয়া' পদবী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বের দশটি প্রধান ধর্মের ওপর 'ডক্টর অব ডিভাইনিটি এবং ওরিয়েন্টালিজমে আরেকটা পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ভবগান শিবশক্তি

ভ্যাটিকেনের ৬ষ্ঠ পোপ জনপলের আমন্ত্রণে তিনি ইতালি গমন করেন এবং সেখানকার নাগরিকত্বও তাঁকে দেয়া হয়। পোপ জনপলের তরফ থেকে তাঁকে খৃস্টধর্মগ্রহণের অনুরোধ জানানো হলে তিনি তা উপেক্ষা করে জন্মভূমি ভারতে চলে আসেন। অতঃপর বিধিসম্মত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ভগবানের সিংহাসনে সমাসীন হন।

ড. ইসলাম বারটি ভাষায় পণ্ডিত। ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রিক, হিন্দি, উর্দু, পালি, গোরমুখি, মারাঠি, গুজরাটি, আরবি প্রভৃতি।

সমকালীন ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। জগতগুরু শংকরাচার্য, রামগোপাল শালওয়াল, পুরির সংকরাচার্য, স্বামী স্বরসতী মহামন্ডলেশ্বর অখন্ডানন্দজী, গুরু গোলওয়ালকার, বাবাসাহেব দেশমুখ, স্বামী স্বরূপান্দজী মহারাজ, শংকরাচার্য দেওয়ারিকা, স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরি, হরিদ্বারের শংকরাচার্য, বালঠাকুরে, নানাসাহেব দেশমুখ, বিনোবাভাবে প্রমুখের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল একদা।

১৯৮৯ সালের ৮ জানুয়ারি ড. ইসলাম-উল-হক বাংলাদেশে আসেন। এর আগের বছর তিনি একবার আসবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের অনুরোধে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলাদেশে আসতে দেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

ড. হক যখন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভুপালে অবস্থান করছিলেন, আমি তখন ১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার দুটো পত্রিকার পক্ষ থেকে সরেজমিন সাক্ষাতকারগ্রহণের জন্য ভুপালের বাসা ১৫ নীলম কলোনিতে তাঁর মুখোমুখি হই।

ড. হকের সাক্ষাতকার নেবার সময় আমার পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন ছিল তাঁর প্রথমটি হচ্ছে, "ভারতীয় হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মোহন্ত ও ভগবানের আসনে সমাসীন হবার সৌভাগ্য লাভ সত্ত্বেও আপনি কেন ইসলামগ্রহণ করলেন?" তিনি অত্যন্ত ধীরেসুস্থে আমার প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমি ভারতের আর দশজন হিন্দুর মতো নই। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করেছি। ভালোমন্দ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান দশটি ধর্মের ওপর পড়াশোনা করে আমি অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করেছি। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়েই আমি মহান ইসলামের খোঁজ পেয়েছি। সত্যি বলতে কি মানবীয় জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। অন্য কোনও ধর্মের এ দুঃসাহস নেই। ইসলামের সৌন্দর্য ও মানবিকতা আমাকে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ছাড়া একদা গভীর রাতে স্বপ্নযোগে বিশ্বনবী

হযরত মুহাম্মদ (স) আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে একই সঙ্গে ইসলামগ্রহণের নির্দেশ দেন। আমরা উভয়ে মূলত রাসুলুল্লাহ (স)-এর মোবারক নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। যেহেতু হাদিস শরিফ মোতাবেক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে স্বপ্নে দেখা কখনও মিথ্যে হয় না। স্বপ্নযোগে হযরত মুহাম্মদ (স) -এর দর্শন লাভ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? হুজুর (স) হুকুম করেছেন, আমরা তা পালন করেছি। কাজেই যারা আমাদের ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন তাঁরা ঠিক করছেন না বলেই আমি মনে করি। এছাড়া আমার সম্পর্কে কোনও ধারণা ব্যতীতই যারা বিরূপ মন্তব্য করেন তাঁরা এক ধরনের অবিবেচক।"

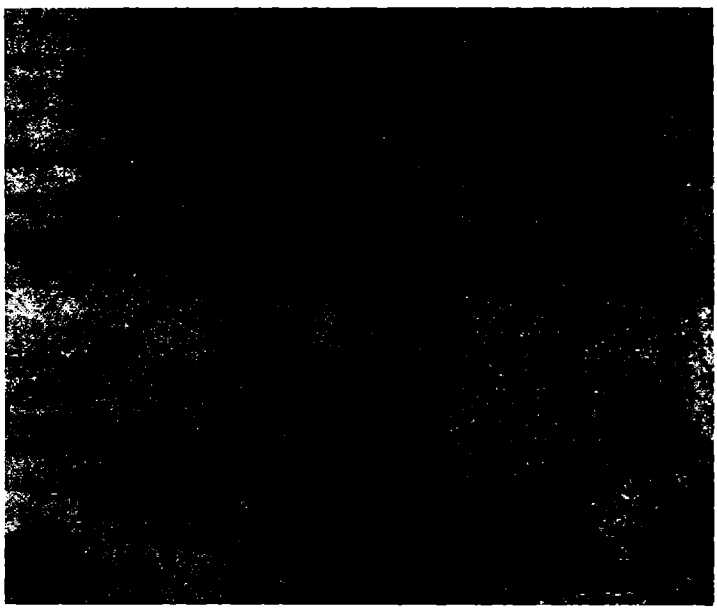

ভূপাল : ড. হকের সঙ্গে ইসমাঈল হোসেন দিনাজী (১৯৮৭)

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, "ইসলামগ্রহণের পর প্রশাসনের তরফ থেকে আপনার প্রতি কোনও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কি না? এজন্য কি আপনাকে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে? আপনার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে প্রশাসন কি মনে করছেন?" ড. হক এর জবাবে বলেন, "শুধু চাপ সৃষ্টি নয়, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক সরকার স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বোধ করে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি অথবা হরিজনদের ন্যায় দলে দলে মানুষ ইসলামগ্রহণ করলে সরকার ঘাবড়ে

যায়। এজন্য সরকারের তরফ থেকে তদন্ত চলে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। আমার সপরিবার ইসলামগ্রহণের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঈর্ষান্বিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। কিন্তু তারা কোনও ভালো ফল পাচ্ছে না। আমি জেনেবুঝে ইসলামগ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে বেশকিছু লোক আমার হাতে কালেমা পড়েছেন। কেউ কেউ পত্রালাপের মাধ্যমে ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আমার মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মগুরুর ইসলামগ্রহণের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিমূলে চরম আঘাত লেগেছে। এমনকি ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক-বাহকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে। কাজেই আমার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারটি প্রশাসনের ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। তবে এজন্য আমি আদৌ ভীত নই। কারণ আমি আল্লাহতায়ালা ছাড়া কাউকে পরওয়া করি না। আমার হেফাজতকারী আল্লাহ সুবহানাতায়ালা। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। একমাত্র তাঁরই ইচ্ছার ওপর আমি নির্ভরশীল।"

"পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব কোথায়?" এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে বস্তুবাদের দাসে পরিণত করেছে। ইসলাম মানুষকে বস্তুবাদের দাসত্বনিগড় থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসে পরিণত করেছে। ইসলাম বস্তুর বিরুদ্ধে নয়, বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। ইসলাম মানুষের এ পঙ্গুত্ব ঘোচাতে চায়।"

"নানাবিধ সমস্যাজর্জরিত ভারতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটি? এর সমাধানইবা কি?" উত্তরে ড. হক বলেন, "বিচ্ছিন্নতা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক একতাবদ্ধ হওয়াই এর একমাত্র সমাধান। মুসলমানরা যদি নিজেদের মধ্যকার সামান্য মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারেন, তাহলে দুর্ভোগ আরও বেড়ে যাবে। কপটতার পথ পরিহার করে খালেস নিয়তে আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলামের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। অন্যথায় মুসলমানদের দ্বারা কোনও ভালো কাজ ভারতে অসম্ভব।"

"ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে বলে আপনি মনে করেন?"

তিনি বলেন, "বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ, আর্যসমাজ প্রভৃতি কট্টর সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলিমের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা নানা অপকৌশলে মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িত

করতে চায়। আর এজন্যই কুরআন শরিফের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক মকদ্দমা দায়ের করেছে তারা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় তারা প্রকাশ্যেই শ্লোগান দিচ্ছে, 'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান, মোল্লা ভাগো পাকিস্তান'। 'হিন্দুস্তান ছোড়ো ইয়া কুরআন ছোড়ো'। এসব তৎপরতা সন্দেহাতীতভাবে উস্কানিমূলক। ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে এরকম হীনতৎপরতা অবিলম্বে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। অন্যথায় ভারতের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর হতে হবে।"

"ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে আনুগত্যের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় হীনমন্যবোধে আক্রান্ত। তাঁরা নাকি বিদেশীদের অনুচরবৃত্তি করেন? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ড. হক বলেন, "এ সম্পর্কে আমিও একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেটি হচ্ছে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠরাইবা কতটুকু অনুগত? আমার জানা মতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্য থেকে অনেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি দেশের বাইরে বিক্রি করেছে। এমনকি সুযোগ পেলে গোটা ভারতকেও বিক্রি করে দিতে তারা দ্বিধাবোধ করবে না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত নিকটজনেরাও বিদেশের ব্যাংকে অবৈধভাবে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে। ভারতীয় মুসলমানদের সৌভাগ্য যে, দেশ বিক্রি করে দিতে পারে এমন লোকদের তালিকায় তাদের নাম নেই। আমার জানা মতে, প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই দেশপ্রেমিক। কারণ দেশপ্রেম মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ।"

অতঃপর আমার তরফ থেকে আরেকটি প্রশ্ন ছিল, "ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীকৃত। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকের উগ্র-সাম্প্রদায়িক তৎপরতার জন্য এ নীতি লংঘিত হয়ে আসছে। ফলে ভারতের অহরহ সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাঁধছে। এ সাম্প্রদায়িক দাংগা কিভাবে রোধ করা যায়?"

এর জবাবে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "আমরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আজাদী লাভ করেছি। অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অনেক কষ্টের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেই আজাদীর সুফল ভোগ করবার জন্য নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারিনি। সাম্প্রদায়িক দাংগার হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন নাগরিকত্ববোধের স্ফুরণ। দায়িত্বশীল নাগরিকত্ববোধের অভাবে আমরা নানা দুর্গতির শিকার হচ্ছি। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সুষ্ঠু নাগরিকত্ববোধ সম্পন্ন না হলে গণতান্ত্রিক উন্নতি অসম্ভব। সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ সৃষ্টি করতে না পারলে স্বাধীনতার সুফল সুদূর পরাহতই

থেকে যাবে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ, আর্যসমাজ, শিবসেনা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলো নাগরিকত্ববোধের অভাবে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। বিঘ্নিত করছে বিশাল ভারতভূমির শান্তি-শৃঙ্খলা। এজন্য যে কেবল সংখ্যালঘু মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। অথচ সংকীর্ণ স্বার্থের মোহে তারা অন্ধ হয়ে থাকছে। এর পরিণাম আদৌ শুভ হতে পারে না।"

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর মুসলমানও ড. ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ড. হক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আহলে হাসীদ'-এর সম্পাদক অধ্যাপক শেখ আইনুল বারী, মিসরিগঞ্জ মসজিদের তখনকার পেশ ইমাম এডভোকেট হাবিবুর রহমান এবং ভুপালে বসবাসরত 'অল ইন্ডিয়া জমঈতে আহলে হাদীস'-এর নির্বাহী সদস্য জনাব ওফা সিদ্দিকীর মতো অনেকে যেমন আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তেমনি কেউ কেউ ভুল তথ্য দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

ভগবান শিবশক্তিকে মাল্যভূষিত করছেন ইন্দোরের রাজগুরু শর্মা

এমনকি কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক নিজে এবং উত্তর প্রদেশের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রনেতা ড. হক সম্পর্কে আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. হকের কাছে আমার একটি প্রশ্ন ছিল এরূপ "ভারতের দু'একটি মুসলিমসংগঠনের কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছেন। এদের কেউ কেউ বলছেন, আপনি ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে

প্রতারণা করছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।" তিনি এর জবাবে বলেন, "এদেশের মুসলিম সংগঠনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। কারা আমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলছেন এবং ঘৃণা ছড়াচ্ছেন তাও ভালোভাবে অবগত নই। তবে দু'একজন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের স্বার্থ পূরণ হয়নি বলে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে কিছু তৎপরতা চালাচ্ছেন বলে খবর পেয়েছি। তবে আমার সম্পর্কে লোকমুখে যেসব কথা ইতোমধ্যে শুনেছেন সেগুলো ডাহা মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত। এসব ঘৃণ্য তৎপরতা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করবার ষড়যন্ত্র বলে আমি মনে করতে বাধ্য হচ্ছি।"

পরে আমি ভুপালের বেশ কয়েকজন মুসলমানের কাছ থেকে ড. হক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবার চেষ্টা করেছি। তাঁরা সবাই তাঁর সম্পর্কে আমাকে ভালো ধারণাই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ড. হক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য কলকাতার অধ্যাপক শেখ আইনুল বারী সাহেবের কাছ থেকে পূর্বোক্ত জমঈয়ত সদস্য ভুপালের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব ওফা সিদ্দিকীকে লেখা একটি চিঠি নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হই এবং বৃন্দাবনের প্রাক্তন ভগবান নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল-হক সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহু কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি ড. হকের ব্যাপারে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি। তিনি আরও জানান, ড. শিবশক্তির ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিযোগ জানা নেই।

পূজোর আসনে ভগবান শিবশক্তিকে মাল্যভূষিত করছেন একজন ভক্ত

এরপর ড. ইসলাম-উল-হকের প্রাইভেট সেক্রেটারি ভুপালের অধিবাসী মোবারক মুহাম্মদের কাছ থেকেও গোপনে কিছু জানবার চেষ্টা করি। তিনিও ড. হক সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা আমাকে দিতে পারেন নি।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক আছে কি না, জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক না থাকলেও তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা আছে। তাঁদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই।" পরে জেনেছি, ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান নদভীসহ অনেকেই ভুপালে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করেছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিয়েছেন তাঁরা।

ড. হকের জ্যেষ্ঠকন্যা অর্চনা গ্রাজুয়েট। ছেলেমেয়ে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মুম্বেতে থাকেন। তিনিও ইসলামগ্রহণ করবেন বলে সেদিন ড. হক আমাকে জানিয়েছিলেন।

সেদিন ভুপালের ১৫ নং নীলম কলোনির বাসভাবনে বসে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমাকে তিনি একটি আশার কথা শুনিয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে, "ভারতীয় হিন্দুরা ইসলামের বিরোধিতা করলেও এ ইসলামই তাদের মুক্তির দিশা দেবে। ইসলাম সম্পর্কে যেদিন তাদের ভ্রান্ত ধারণা ঘুচবে সেদিন তারা ইসলামকেই একমাত্র আশ্রয় হিসেবে দেখবে। সেদিনটি হবে আমদের সকলের জন্য আনন্দের দিন। আর এ দিনটি খুব বেশি দূরে বলে আমার মনে হয় না।"

পরে তিনি উত্তর প্রদেশের জৌনপুর চলে আসেন। পাকিস্তান থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

১৯৮৯ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আমন্ত্রণে সপরিবার ড. হক বাংলাদেশে আসেন। তাঁর আগমনে সারা দেশে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁকে এক নজর দেখবার জন্য ভিড় জমায়। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ নওমুসলিম বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে অসংখ্য সভা-সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমে আসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁর সুচিন্তিত আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন। বেশকিছু অমুসলিম তাঁর কাছে কালেমা পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। দেশের বহু চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী তাঁর কাথাবার্তা ও বক্তব্যে ইসলাম সম্পর্কে শাশ্বত ধারণা পেয়ে বিমুগ্ধ হন। সর্বস্তরের জনগণের তরফ থেকে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য আগ্রহ অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। ফলে তাঁর ভিসার মেয়াদ একাধিকার বৃদ্ধি করতে হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, একটি বিশেষ মহল এবং নাস্তিক্যবাদের এদেশীয় এজেন্টরা তাঁর এ বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে ঘাবড়ে যান। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে ধর্মবিরোধীরা চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেন।

তাঁর অব্যাহত জনপ্রিয়তা দেখে ইসলামবিদ্বেষী মহলটি ভারতের সাবেক ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এ সম্মানিত অতিথির বক্তৃতা-বিবৃতিকে রাজনৈতিক রঙ দেবার চেষ্টা করেন তাঁরা। এমনকি দু'একটি পত্রিকার সম্পাদক আর সাংবাদিকরা সাধারণ মানুষের অলক্ষ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু করে দেন। শুধু তাই নয়, ভারত ও রুশপন্থীরা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ছড়ানোর অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করবার অপচেষ্টা চালান।

নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল-হক বাংলাদেশের একজন সম্মানিত অতিথি। তিনি এদেশে এসে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, পেয়েছেন মানুষের কাছ থেকে অফুরন্ত ভালোবাসা। তাঁর ইসলামগ্রহণের খবর শুনে আমি সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে ভুপাল গিয়ে সরেজমিনে একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। এ সুবাদেই নওমুসলিম পরিবারটির সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। বাংলাদেশে সফরে আসার পরও ড. হক ও তাঁর পরিবার তথা স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে আমার বহুবার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ড. হকের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহুদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার আলাপ হয়েছে। এমনকি ঢাকায় আমার বাসাতেও তিনি পরিবারসহ এসেছেন। তাঁর সারল্য ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবার এবং কথা বলবার আকুলতা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু বিস্ময়করই নয় মনোমুগ্ধকরও বটে। আমার মতো একজন নগণ্যকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন তা আমি কোনও দিন ভাবিনি। তিনি প্রায়ই বলেন, "আমি একদিন ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম। মানুষ আমাকে ভগবান হিসেবে পূজো করতো। কিন্তু আজ আমি সাধারণ মানুষের কাতারে এসে শামিল হয়েছি। ভগবানের সিংহাসন থেকে নেমে এসে মানুষ হতে পেরে আমি সত্যিকার অর্থেই গর্বিত।"

অনেকটা অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, এ দেশের বিশেষ মহলটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে ড. ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে পুরনো কোরাস গাইতে শুরু করে। তারা চায় তিনি যে-সত্য ও শাশ্বত জীবনাদর্শের স্বর্ণোজ্জ্বল পথে পা বাড়িয়েছেন তা যেন গোপন রাখা হয়। তারা এ দেশের দু'একটি নতুন করে গজিয়ে ওঠা পত্রপত্রিকায় এ মর্মে নিবন্ধও ছাপিয়েছে। 'ভারতের সাবেক ভগবান, তিনি ৭০ কোটি লোকের ভগবান' প্রভৃতি শব্দ দেখেও নাকি এদেশের সংখ্যালঘুরা শরমে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন বলে ভারতঘেঁষা পত্রিকাগুলো অভিযোগ তোলে। নাস্তিক্যবাদী রুশ-ভারতপন্থীদের এ মায়াকান্না আমাদের বিস্মিত করেছে বৈকি। তবে তাঁরা কি বলতে চান যে, ড.

শিবশক্তি স্বরূপজী ভারতীর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পূজনীর ভগবানপুরুষ ছিলেন না? রাধাকৃষ্ণের পুণ্যপ্রেমের (!) লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনের লক্ষ লক্ষ মানুষ কি জীবন্ত ভগবান শিবশক্তির বেদীমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রণিপাত করতেন না? হিন্দুধর্মের বহু সমাজপতি আর ভারতের অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা কি তাঁর চরণতলে লুটোপুটি করতেন না? এ জীবন্ত ভগবানের আশীর্বাদ নেবার জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবণিতা কি তাঁর আশ্রমে দিনের পর দিন ধরনা দিতেন না? তাহলে 'সাবেক ভগবান' '৭০ কোটি মানুষের ভগবান' ইত্যাদি সত্যকথা শুনে গাত্রদাহের কারণ কি? তবে কি তাঁরা শিবশক্তিকে ভারতের অচ্ছুৎ হরিজন অথবা নমশূদ্র দ্রাবিড় প্রভৃতি বলে চিহ্নিত করতে চান। কারুর সাহস আছে এমনটি?

আমরা জানি, ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটলে বহু নির্যাতিত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হয়ে নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখে। অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বহু কুলীন হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়। এ সত্য ঢেকে দেবার জন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখেরা নবদীক্ষিতদের কাউকেই কুলীন ব্রাহ্মণ বলতে চাননি। এ ধর্মান্তরিতরা সবাই নাকি নমশূদ্র, চাঁড়াল, হরিজন আর মুচি-মেথরের জাত ছিল। কোনও কুলীন হিন্দু বা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নাকি মুসলমান হতে পারে না। যারা নিজেদের বাপদাদার মিথ্যে ধর্মত্যাগ করে ইসলামগ্রহণ করে তাদের নাকি মা-বাপের ঠিক নেই। এ মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে সেযুগে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদী অসংখ্য মানুষের ইসলামগ্রহণ ঠেকাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

এমনকি চতুর ঠাকুর পুরোহিতরা "শ্রেয়ান স্বধর্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাং স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ॥ (অর্থাৎ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কিঞ্চিত অংগহীন স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থেকে নিধন হওয়াও ভালো। এতে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। এতে নরক প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবদগীতাঃ ৩য় অধ্যায় : ৩৫ শ্লোক) এ উদ্দেশ্যমূলক গীতার বাণী আওড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজ এ ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখছি ড. শিবশক্তিসহ পাক-ভারত উপমহাদেশের অসংখ্য অমুসলিমের ইসলামগ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শুধু শিবশক্তি নন, মাদ্রাজের প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আদিয়াড়, আগ্রার দুর্গদাস দেশমুখ। বাংলাদেশের আমিনুল ইসলাম রায়, আবুল হোসেন ভট্টচার্য প্রমুখের ইসলামগ্রহণের ব্যাপারেও এমনতরো মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে একশ্রেণীর

ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শুধু কি তাই? এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদী এসব নবদীক্ষিতদের অঢেল অর্থ লোভ ও অন্যবিধ ভোগবিলাসিতার প্রলোভন দেখিয়েও তাদের ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে পূর্বধর্ম তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছেন। এতে দু'একজন দুর্বল ঈমানের নওমুসলিম বিভ্রান্ত হয়ে পূর্বেকার অন্ধকার পথে ফিরে গেলেও যারা সত্যিকারভাবে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

এদেশের নাস্তিক্যবাদী ও ব্রাহ্মণবাদের পৃষ্ঠপোষকরা ড. ইসলাম-উল-হকের প্রসঙ্গে 'সাবেক ভগবান' এ নির্জলা সত্যভাষণে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের গন্ধ খুঁজে পেলেও ভারতে কুরআনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের, হাজার হাজার মসজিদ জবরদখল, 'কুরআন ছোড়ো ইয়া হিন্দুস্তান ছোড়ো, হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান; মোল্লা ভাগো পাকিস্তান' প্রভৃতি উস্কানিমূলক শ্লোগান কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রকাশনা সম্পর্কে কোনও কথা বলেন না।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দেবার অপরাধে এ পর্যন্ত ৩৩ হাজারেরও বেশি মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। এসব দাঙ্গায় মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত রক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বরং এসব দাঙ্গার জন্য মুসলমানদের উল্টো দায়ী করবার ষড়যন্ত্র চলেছে বিভিন্ন সময়।

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী ভারতীয় মুসলিম সংখ্যালঘুদের সীমাহীন ভোগান্তি, মীরাট এবং অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মর্মান্তিক ও হিংসাত্মক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

রাবিতার সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি মুসলমানদের বিষয়সম্পত্তি ধ্বংস সাধন ও লুটপাট করা হয়েছে।

ড. নাসিফ বলেন, রাবিতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, জেনেভাভিত্তিক এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের কাছে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশীয় বিশেষ মহলটি ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তক্ষয়ী 'ত্রিশূল অভিযান' সম্পর্কে কোনও

দিনই কিছু বলতে সাহস পায়নি। কিন্তু কেন? কার স্বার্থে এ নীরবতা? ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশীয় পৃষ্ঠপোষক মহলটি অসংখ্য পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ড. ইসলামকে ভারতের 'বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। কেন? তাঁর ইসলামগ্রহণের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিমূলে কাঁপন লেগেছে বলেই কি যুগযুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক পূজিত ও বন্দিত ভারতের সাবেক ভগবান-পুরুষটি এ ক'দিনেই 'বিতর্কিত' হয়ে পড়লেন? নাকি এদেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক মহলটি কোনও মোটা অংকের দক্ষিণার বিনিময়ে ড. হকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে পানি ঘোলা করবার প্রয়াস চালাচ্ছে?

ড. হক সে বছর ভুপালেই আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে এক শ্রেণীর মুখোশধারী মুসলমান প্রসঙ্গে কিছু অপ্রিয় অথচ সত্য কথা বলেছিলেন। এ মুখোশধারীরা তাঁর সাময়িকভাবে বন্ধু সেজে জমজমাট ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের সে সুযোগ দেননি। ফলে তাদের একটি অংশ ভারতেও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু নাহক কথাবার্তা ছড়ান। একইভাবে তিনি মেহমান হিসেবে এদেশে সফরে আসবার পর পরই মুষ্টিমেয় লোকজন ড. হকের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে বাণিজ্য করবার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামেন। এদের কয়েকজনের অতি উৎসাহ এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বুঝতে পেরে তিনি তাদের এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। এতে দু'একজনের সঙ্গে তাঁর নীরব বিরোধ ঘটে। এ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা তাঁর বন্ধু সেজে কাছে ভিড়েছিলেন তাঁরা সুবিধে করতে না পেরে ইতোমধ্যে কেটে পড়েছেন। এদের দলে একটি অনিয়মিত পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। পরে এ সম্পাদক সাহেব তাঁর নিজের পত্রিকায় ড. ইসলাম-উল-হকের সম্পর্কে অমূলক সন্দেহ ছড়ানোর চেষ্টা করেন। অথচ এ ভদ্রলোকটি ড. হক সম্পর্কে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন প্রথমদিকে।

বলতে দ্বিধা নেই, এদেশের দু'একটি সংস্থা ড. হককে নিয়ে বিভিন্ন সেমিনারের নামে মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা তোলে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাস্তিক্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যদের এদেশীয় পৃষ্ঠপোষকেরা ড. হকের এদেশে সফর এবং তাঁর মুখে ইসলামী জীবনাদর্শের বুলন্দ আওয়াজ শুনে আতংকিত হয়ে পড়েন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মতো তাঁরাও চোখে সর্ষেফুল দেখেন। তাই তাঁরা মরিয়া হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু করেন। এমনকি তাঁর সম্পর্কে কিছু কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ ছড়াবার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেন।

তবে এদেশের সচেতন মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি কারুর মায়াকান্না শুনে বিভ্রান্ত হবার নয়। তাদের এ উথলে ওঠা দরদের উদ্দেশ্য কি আমরা ভালো করেই জানি। এ জ্ঞান-পাপীদের জানা উচিত, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো দেখে কেউ যদি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওপরের দিকে থুথু নিক্ষেপের চেষ্টা করেন তাহলে সে থুথু চাঁদের গায়ে লাগে না। বরং সে থুথু নিক্ষেপকের দেহই নোংরা করে।

যারা নিজের চোখে ঢেঁকি লুকিয়ে রেখে অন্যের চোখে তিল খুঁজে বেড়াতে উৎসাহী তাঁরা যে সমাজের ভালো মানুষ নন এ কথা তাঁদের কে বোঝাবে? নিজেদের স্বভাবচরিত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে অন্যের বিরুদ্ধে অহেতুক প্রচারণা চালানো যে এক ধরনের হীনমানসিকতা এবং ইতরামি এ সত্য কথাটা কি তাঁরা বোঝেন না?

ড. ইসলাম-উল-হক বাংলাদেশী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। তিনি এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল স্তরের লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করবার সুযোগ পেয়েছেন। এ দেশের সাধারণ মানুষ এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

এ দেশের তওহিদী জনতার পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ড. হককে সংর্ধনা দেয়া হয়েছে। এতে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এ দেশের মুসলমানরা কোনও কোনও দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও মেহমানদারি বা আতিথেয়তার দিক থেকে পেছনে নেই। তাঁদের মন ও হৃদয় অনেক বড় বলেই তাঁকে তাঁরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তবে দু'একটা ব্যতিক্রম যে ঘটেনি তা নয়। আশা করি, আমাদের প্রাজ্ঞ অতিথি এসব ব্যতিক্রম সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন।

মহান আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অনুগত ড. হক এ দেশের প্রায় সবকটি সমাবেশে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, "ইসলামই হচ্ছে বিশ্বমানবতার মুক্তির একমাত্র উপায়। ইসলামের প্রকৃত অনুসরণ ব্যতীত মুসলমান থাকা যায় না।"

তাঁর ইসলামগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি ইসলামগ্রহণ করিনি, ইসলামই আমাকে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর একান্ত মেহেরবানিতেই আমি এ আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান পেয়েছি। ইসলামগ্রহণ আমার কোনও কৃতিত্ব নয়। এটাকে আমার প্রতি আল্লাহতায়ালার খাস মেহেরবানি ছাড়া আমি কিছু মনে করি না।"

ড. হক পৃথিবীর ১২৭টি দেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়েছেন ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর বক্তৃতা করবার জন্য। জাতিসংঘের তরফ থেকেও মানবতা সম্পর্কে

বক্তৃতা করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুসলিমবিশ্বের বহু দেশ তাঁকে অতিথি হিসেবে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। কয়েকটি দেশ তাঁকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদানের আগ্রহ দেখিয়েছিল বলে তিনি আমাকে জানান।

ড. হকের কাছে সরাসরি ভারতের ৮০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধর্মীয় পন্ডিত ইসলামগ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ঝাবুয়ার প্রাক্তন রাজা ঝাবুয়ানরেশ, অযুধ্যাস্থ রামজনম ভূমির প্রধান পুরোহিত পন্ডিত বিনোদকুমার, দিল্লির সুরেন্দ্র কুমার সিংহ, লক্ষ্ণৌস্থ পন্ডিত কমলাপতি ত্রিপাঠীর ভ্রাতুষ্পুত্র পন্ডিত বিনোদ কুমার ত্রিপাঠী, মথুরার রামসিং চতুর্বেদী প্রমুখ। এ ছাড়া তাঁর ইসলামগ্রহণের খোশখবর শুনে বহু শিষ্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও তাঁর প্রভাবেই ইসলামগ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান।

ড. হক প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "ভগবান বিষ্ণুর ২৪ অবতারের মধ্যে কেউ যদি মৎস্য, কূর্ম (কচ্ছপ), বরাহ (শূকর), নৃসিংহ প্রভৃতি আকারে ধরাধারে আবির্ভূত হতে পারে তাহলে ২৫তম অবতাররূপী শিবশক্তি স্বরূপজীর ইসলামগ্রহণ তথা মুসলমান বা প্রকৃত মানুষে রুপান্তরিত হওয়াতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভগবান বিষ্ণুর যদি মৎস্য, কচ্ছপ, শূকর বা নৃসিংহ হওয়াতে কোনও অপরাধ না হয় তাহলে আমার পবিত্র কালেমা পড়ে মুসলমান বা মানুষ হওয়াতে অপরাধ কোথায়? কাজেই আমার ইসলামগ্রহণের খবর শুনে কোনও হিন্দুধর্মাবলম্বী পন্ডিত ব্যক্তি বা পুরোহিতের মনোকষ্টের কারণ নেই। আমার ইসলামগ্রহণের খবরে যদি কোনও হিন্দুধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে অযথা বিষোদগার করেন তাহলে সেটা হবে আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। আমার কালেমা পড়বার ঘটনায় কোনও ভাই বা বন্ধু মনে কোনওরূপ কষ্ট পাক, বেদনা অনুভব করুক তা আমি কাস্মিনকালেও চাইনি।" কিন্তু বাস্তবতা বড় নিষ্ঠুর! ড. ইসলাম-উল-হকের এতো সব হৃদয় নিংড়ানো সমবেদনার বাণী, সহমর্মিতা, পূর্বধর্মের শিষ্য-সুহৃদদের প্রতি স্নেহানুভূতি কোনও কিছুই তাঁকে পূর্ব ধর্মাবলম্বীদের রোষানল থেকে রেহাই দিতে পারেনি। অল্পসংখ্যক সচেতন শিষ্য-সুহৃদ ছাড়া প্রায় সকলেই তাঁকে স্বধর্মত্যাগী পাষন্ডপামর, কালাপাহাড় বিশেষণে ভূষিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু কেন এ ক্রোধের লেলিহান শিখা নির্বাপিত হতে চায় না? মানবতার এ নতুন সুহৃদকে কেন তাঁরা বন্ধুর পরিবর্তে শত্রু ভেবে আসছে? এ প্রশ্নের সদুত্তর সচেতন বিবেকের কাছে কঠিন নয়।

স্বার্থের লালসায় যারা সত্যকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্য বলে চালাতে চায়, দিনকে রাত আর রাতকে দিন হিসেবে গণ্য করে তারা রক্তমাংসের তৈরি মানুষ

হলেও হৃদয় তাদের সংকীর্ণ, মনোবৃত্তি তাদের কুটিলতায় আকীর্ণ, বিবেক তাদের মৃত। আলো আর কালোর তফাৎ তারা বুঝতে অক্ষম। জ্ঞান আর অজ্ঞান বলতে তারা অন্ধ। সত্যের আলো প্রাপ্তিতে কী সুখ তারা বুঝবে কিসে? মিথ্যে আঁকড়ে থাকা কত পাপ এ অনুভূতি তারা পাবে কোথায়? মিথ্যে মানুষের কত বড় শত্রু তারা জানে না। স্বার্থপরতা মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে তারা বোঝে না। স্বার্থলোভে অন্যের বিরুদ্বাচরণ কত ভয়ংকর, এর পরিণাম কত কুৎসিত এ চেতনা যাদের নেই তারা আসলে মানুষ না পশু, এ মীমাংসায় পৌঁছানো দুষ্কর বৈকি!

তাই বলছিলাম, শুধু ভারতের সাবেক ভগবান ড. শিবশক্তির ইসলামগ্রহণের পরই তারা এভাবে মিথ্যে প্রচারণার আশ্রয় নেয়নি। অতীতে আরও অসংখ্য মানুষের ইসলামগ্রহণকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। সত্যপথের পথিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।

বাংলাদেশে অবস্থানের জন্য ড. হকের ভিসার মেয়াদ আগস্ট (১৯৮৯)-এর প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়ে যায়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবিলম্বে দেশত্যাগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এদেশের তওহিদী জনতার মনে তিনি যে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ভোলার নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ চায় এ নওমুসলিমের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর তুলনামূলক আলোচনা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষ প্রায় ব্যাকুল। তাই তাঁরা দাবি তোলেন তাঁর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোক। জনগণের দাবির মুখে কর্তৃপক্ষ তাঁর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কতদিন এভাবে তাঁকে ধরে রাখা যায়? দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অবিলম্বে তাঁকে চলে যেতে হয়।

৬ আগস্ট ১৯৮৮ সালে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমি বাংলাদেশে এসেছি ইসলামের খেদমত করবার জন্য। আমি আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ তাঁর গোলামকে যেখানে যে-অবস্থায় রাখেন আমি তাই মেনে নেবো। এদেশে কতদিন থাকবো আমি জানি না। আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। তাঁর ইচ্ছা হলে থাকবো, নইলে তিনি যেখানে নেন চলে যাবো।"

কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমি ইতোমধ্যেই একটি দলে আছি। সেটা হচ্ছে ইসলাম। কাজেই আর অন্য কোনও দলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

ড. হক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জানান, "ভগবানের সুবর্ণ সিংহাসন থেকে নেমে এসে মানুষের কাতারে শামিল হওয়া যে কত বড় মানসিক প্রশান্তি তা

ভাষায় ব্যক্ত করবার মতো নয়। আমি আগে কারুর পূজা করিনি। ভগবান বা স্রষ্টা কি জানতাম না। কারণ আমি নিজেই ভগবান হিসেবে পূজিত হতাম। আমি আমার নিজেরই পূজা করতাম। আমার চেয়ে আরও কেউ বড় থাকতে পারে এ বিশ্বাস ইসলামগ্রহণের আগে আমার ছিল না। স্রষ্টা বলে কাউকে মানতাম না, চিনতাম না। পৃথিবীর সব মানুষ আমারই দাসে পরিণত হোক এ চেতনাই সেদিন ছিল আমার মানসজগতে সদাজাগ্রত। পৃথিবীর সুষমারাজিকে একমাত্র আমারই ভোগনৈবেদ্য হিসেবে গণ্য করে আমি আত্মতৃপ্তি পেতাম। পৃথিবীর সবাই আমার পাদপদ্মে প্রণিপাত করুক এ সর্বগ্রাসী মানসিকতা ছিল আমার তীব্র। কিন্তু আজ আমার সেই ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমি মহান আল্লাহকে সব চাইতে বড় ভাবতে শিখেছি। ইসলামী জীবনাদর্শকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে আমি মেনে নিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (স) কে আখেরি নবী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। সর্বোপরি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে আমি মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখেছি। তাই এর চাইতে বড় আনন্দের বিষয় আমার কাছে আর কিছু নেই।"

তিনি আরও বলেন, "ইসলামের সন্ধান পেয়ে আমি সবাইকে ছেড়ে এসেছি। স্ত্রী আর কন্যা ছাড়া আজ আমার আপনজন বলে কাছে কেউ না থাকলেও মুসলিমবিশ্বের প্রায় একশ' কোটিরও বেশি মুসলমান আমার দীনী ভাই। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিমবিশ্বের যেখানেই যাই না কেন সবাই আমাকে কাছে টেনে নেবেন। ইসলাম ও প্রকৃত ঈমানের দাবি অনুযায়ি কোনও মুসলমান আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন না।"

ড. হক বুঝতে পেরেছেন, ইসলাম কত বড় মহান এবং মানবিকতাসম্পন্ন। ইসলামের আদর্শিক চেতনা কত মজবুত আর সুদূরপ্রসারী। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কত আন্তরিক আর হৃদয়গ্রাহী। ড. হকের এ বিশ্বাসের গভীরতা মুসলমানদের আত্মচেতনা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হোক এ প্রার্থনা আমাদের সকলের। আসুন, আমরা নিজকে চিনতে চেষ্টা করি। নিজের বিশ্বাসকে শনাক্ত করি। হৃদয়কন্দরে জমানো অন্ধকার ঠেলে সোনালি আলোকে অবগাহন করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

বিংশ শতরের শেষপ্রান্তে দিকে দিকে আজ সেই শাশ্বত সত্যের জাগরণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নাস্তিক্যবাদের সূতিকাগৃহ হিসেবে পরিচিত রাশিয়া আর চিনের ঘরে ঘরে আজ দাবানল। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে লৌহযবনিকার পুরনো দেয়াল। মিথ্যের বেসাতি ভুলে মানুষ আজ শাশ্বত সত্যের সুবর্ণ পথে ছুটছে দ্রুত।

অতএব সত্য-ন্যায়ের সিংহশার্দুলের দলকে এখনও চিরঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখা যাবে এমনটি যারা ভাবছেন, তারা এক ধরনের বোকার স্বর্গে বাস করছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে আবু লাহাব আর আবু জেহেলের দল লেগে থাকবে ঠিক, নমরূদ-ফেরাউনেরা ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে চাইবে বটে, আবরাহার অনুসারীরা ঈর্ষান্বিত মনোবৃত্তি নিয়ে ইসলামের ঔজ্জ্বল্য ঢেকে রাখবার পাঁয়তারা চালাবে জানি; কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের কাছে তারা একদিন পদানত হবেই। ইতিহাস এর নির্মম সাক্ষী। ভারতের সাবেক মোহন্ত স্বামী ড. শিবশক্তি আজকের ইসলাম-উল-হক বাংলাদেশী মুসলমানদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এখানকার মুসলমানরা প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হতে পারলে পৃথিবীর এমন কোনও শক্তি নেই যা এদের দমিয়ে রাখতে পারে। এদেশের মুসলমানসমাজে যে অবক্ষয় চলছে তা থেকে বাঁচতে হলে কুরআন–সুন্নাহর বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। এদেশের আবহাওয়া, কাদামাটি ইসলামের জন্য খুবই উর্বর। প্রয়োজন শুধু মনোবল আর আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে চলবার। তবে কতিপয় বহিঃশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ দু'একটি মহল চাচ্ছে এদেশের মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তারা চায় মুসলমানদের ঈমান-আকিদা কৌশলে লুট করে দেশটিকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে। এ ব্যাপারে দেশবাসিকে সজাগ থাকতে হবে বৈকি।"

ড. হক ভারত থেকে ঢাকা এসে একটি নামকরা হোটেলে উঠেছিলেন। হোটেলের লোকেরা তাঁকে সালাম-এর পরিবর্তে 'গুডমর্নিং' আর 'গুড নাইট' উচ্চারণ করে স্বাগত জানিয়েছিলেন বলে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এমনকি হোটেলের যে কক্ষটিতে তিনি উঠেছিলেন সেখানেও নাকি শরাব জাতীয় পদার্থ রাখা হয়েছিল। এসব দেখে তিনি খুবই দুঃখ পান এবং ঢাকায় তাঁকে দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় এর তীব্র সমালোচনা করেন।

ড. হক বলেন, "দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলেও মানুষের বাস্তবজীবনে এর কোনও প্রতিফলন দেখা যায় না। তবে জুমার দিন মসজিদে বিপুল মুসলিম সমাগম ঘটে। ঈদের দিনেও জামায়াতে প্রচুর লোক হয়। ঈদের দিনগুলোতে আনন্দের ঢল বয়ে যায়। এসব দিনে এখানকার মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এদের অনেকেই ইসলামী জীবনাদর্শের ঘোরবিরোধী। তিক্ত হলেও সত্যি যে, এদের অনেকের নামটি মুসলিম হলেও কাজকর্ম কিন্তু ইসলামের পরিপন্থী। এরাই ইসলামের সবচেয়ে ক্ষতিকারক বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া কিছু ধর্মব্যবসায়ী রয়েছে। তারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে। এদের দ্বারাও ইসলাম ও মুসলিম-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।"

ড. হক আমার সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, "এদেশটি অনেক আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখের। এখানে অনেক পীর আওলিয়া ও সুফি দরবেশ ঘুমিয়ে আছেন। মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ও নিয়ত সৎ হলে আল্লাহর খাস রহমত নাযিল হতে কতক্ষণ? এদেশের আলেম-ওলামা ও পীর দরবেশদের মধ্যে প্রচুর অমিল বিদ্যমান। এক পীর আরেক পীরকে দেখতে পারেন না। এক আলেম আরেক আলেমের কূট সমালোচনায় মুখর। এখানে তরিকাপন্থীদের লড়াই তীব্র। এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের সৃষ্টি করে। পীরে পীরে লড়াই, আলেমে আলেমে দ্বন্দ্ব এবং মুসলমানে মুসলমানে সৃষ্ট বিভেদ-বৈষম্য পুঁজি করে ইসলামের দুশমনরা ফায়দা লোটে। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে তারা মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের মূল কেটে দেবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।"

ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষুদ্র মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ইসলামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। পুরোপুরিভাবে কুরআন-সুন্নাহর আইন মেনে চলবার মানসিকতাসহকারে আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এছাড়া মুসলিমসমাজের স্বার্থরক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা দুষ্কর। আর এরই প্রতিধ্বনি শুনছি আমরা ভারতের সাবেক ভগবানপুরুষ ড. ইসলাম-উল-হকের বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, মুসলমানদের ঘুমিয়ে থাকবার সময় নেই। কোনও খাঁটি মুসলমান সমাজের এ দুর্দিনে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারে না। প্রকৃত মুসলমান কেবল নিজের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়েই মেতে থাকতে পারে না। সমাজ, দেশ তথা সমগ্র বিশ্বমানবতার বৃহত্তর কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুসলমানসম্প্রদায়কেই।

ভারতের দলিত হরিজনদের ন্যায় পৃথিবীর বহু জাতি-উপজাতি মুসলমানদের দিকে চেয়ে আছে। ইসলামের মূল স্প্রিট তাদের কাছে স্পষ্ট হলে তারা আর অন্ধকারে পড়ে থাকবে না। সামান্যতম সুখের জন্য নাস্তিক্যবাদের ন্যায় সর্বনাশা মিথ্যে মরিচিকার পেছনে তারা ছুটতে চাইবে না। তারা চায় সুখ। তারা চায় সমৃদ্ধি। ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ তাদের কাম্য। তারা চেয়ে আছে ইসলামের দিকে। চেয়ে আছে মুসলিমসমাজের পানে। তারা চায় অমানিশার অবসান। নতুন দিনের সোনালি সূর্যের আলোকরেখার জন্য তারা উন্মুখ। এরপরও কি আমাদের ঘুম ভাঙবে না? আমাদের সম্বিত ফিরবে না।*

---

* এ ধারাবাহিক লেখাটি সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৯ আগস্ট ১৯৮৯ থেকে ৬ অক্টোবর ১৯৮৯ তারিখে মোট ৬ কিস্তিতে প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'ইসলামের ছায়াতলে ভারতের ভগবান'। – লেখক

ইসলাম-উল-হকের বাংলাদেশ সফর

ভারতের সাবেক ধর্মগুরু প্রখ্যাত পন্ডিত নওমুসলিম ডক্টর ইসলা-উল-হক কিছুদিন সপরিবার বাংলাদেশে অবস্থান করেন। তিনি এদেশের কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আমন্ত্রণক্রমে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আসেন।

ইসলাম-উল-হক

ভারতের এ প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান ১০টি ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়েই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ইসলামের সুমহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তিনি তওহিদী কালেমার পতাকাতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কোটি কোটি ভারতীয়ের ভগবানের আসনে সমাসীন হবার সৌভাগ্য লাভ করেও তিনি সুবর্ণ সিংহাসন ছেড়ে ইসলামগ্রহণের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়ান। এ ঝুঁকিপূর্ণ পথে সহযাত্রী হয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং কণিষ্ঠা কন্যাও।

আমরা জানি, ডক্টর শিবশক্তির মতো পণ্ডিত ব্যক্তির সপরিবার ইসলামগ্রহণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ভগবান-পুরুষের ধর্মপরিবর্তনের ঘটনায় তাঁর অগণিত শিষ্যশাগরিদ এবং বন্ধু-বান্ধব স্বাভাবিক কারণেই মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। একান্ত আপন জনেরাও অনেকেই এ নওমুসলিম পরিবারটির প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। শুধু ডক্টর ইসলাম কেন, প্রত্যেক নওমুসলিম তথা নতুন করে ইসলামগ্রহণকারীর বেলাতেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কেবল ইসলামগ্রহণের কারণেই অনেকের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রাণের দুশমনে পরিণত হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, কারুর ইসলামগ্রহণই পূর্বধর্মের আত্মীয়-স্বজনেরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। পূর্বধর্মের প্রায় সবাই চেষ্টা করে নওমুসলিমদের

বিপদে ফেলতে। ইসলামে নবদীক্ষিতরা মুসলমানসমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক কিংবা নির্বিঘ্নে থাকুক এটা তারা কেউই চায় না। এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি কমবেশি প্রায় সব নওমুসলিমের বেলাতেই ঘটেছে। প্রায় প্রত্যেক নওমুসলিমকেই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ডক্টর ইসলাম-উল-হকও এ আনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছেন বলে আমরা বুঝতে পারছি। আমরা এও জানি, কোনও কোনও নওমুসলিমের ইসলামগ্রহণের খবরটি পর্যন্ত চেপে রাখবার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এমনকি প্রবল চাপ প্রয়োগ করে ইসলামগ্রহণের কথা পর্যন্ত অস্বীকার করাতে বাধ্য করা হয়েছে। ইসলামগ্রহণের অপরাধে (?) অনেক নওমুসলিমকে চাকরিচ্যুত হতে হয়েছে পৃথিবীর বহুদেশে। প্রতিবেশী ভারতে এর প্রমাণ ভুরি ভুরি। ধর্মপরিবর্তনের মতো দৃঢ়তা না থাকবার জন্য দু'এক জন এ ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে পূর্বধর্মে যে ফিরে যায়নি তা নয়। তবে যারা, সত্যিকার অর্থে ইসলামগ্রহণ করেন তারা পৃথিবী উল্টে গেলেও তা থেকে সরে পড়েন না। কিন্তু এ দৃঢ় মনোবলের বা ঈমানের জোর সকলের হয়তো সমান থাকে না। তাই ব্যতিক্রম হিসেবে হয়তো শ'এর মধ্যে দু'একজনকে পূর্বধর্মে ফিরে যেতে দেখা যায়। সেখানে আবার একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে, পূর্বধর্মের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে আর আগের মতো গ্রহণ করে না। ইসলামগ্রহণের পর আর পুর্বধর্মে ফিরে যেতে পারে না। অন্তত আগের মতো আর হিন্দু হওয়া যায় না। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে হিন্দুধর্মের মতো কড়াকড়ি নেই।

সত্যিকার নওমুসলিমদের বেলায় যেটি সবচেয়ে সুখের বিষয়, সেটি হচ্ছে দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল মুসলমানই তাদের বরণ করে নেয়। এমনকি কেউ কেউ কোনও কোনও নওমুসলিমকে নিজেদের ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবেও গ্রহণ করে নিয়েছে বলে আমাদের জানা আছে। আর হবেই না বা কেন? একজন ইসলামের জন্য আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ি সকলকিছু ছেড়ে আসবে আর কোনও মুসলমান তাকে আপন ভেবে বরণ করে নিতে পারবে না? তাহলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব কোথায়? আর এজন্যই আমরা দেখছি, কেউ অন্য ধর্ম থেকে ইসলামগ্রহণ করে মুসলমান হলে মুসলমানসমাজে তার তেমন কোনও সমস্যা থাকে না। সবাই তাকে দীনী ভাই হিসেবেই গ্রহণ করে নেয়। অন্তত সম্ভাব্য সকল সহযোগিতাই সে মুসলিমসমাজ থেকে পেয়ে থাকে। এজন্য নওমুসলিমরা তাদের পূর্বধর্মের সকলকিছু ছেড়ে আসলেও মুসলমানসমাজে একাত্ম হয়ে যেতে বেশি দিন লাগে না।

নওমুসলিমরা ইসলামগ্রহণের পর মুসলমানসমাজে যেন প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সেজন্য তাদের পূর্ব ধর্মাবলম্বীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নানাভাবে নওমুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে মুসলিমসমাজে তাদের হেয় করতে চায়। তবে এ ষড়যন্ত্র বেশি দিন চালানো যায় না।

হ্যাঁ, আমরা ভারতের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাবেক ভগবান ডক্টর ইসলাম-উল-হকের কথা বলছিলাম। তিনি বাংলাদেশের আতিথ্যগ্রহণ করে আমাদের মাঝে নতুন সাড়া জাগিয়েছেন। ইসলাম একটি শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা, মুসলমানরা একটি উৎকৃষ্ট জাতি এ অনুভূতি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইসলামী জীবনাদর্শ ব্যতীত আর কোনও উৎকৃষ্ট আদর্শ নেই যা সচেতন মানুষ গ্রহণ করতে পারে। এ অশান্ত পৃথিবীর অস্থিরতা নিরসন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলামের আশ্রয় ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

বাংলাদেশে এসে তিনি দু'চারটি স্থানে বক্তব্য রেখেছেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁর মুখে ইসলামের সৌন্দর্যের কথা শোনার জন্য সমাবেত হয়েছেন। সবাই তাঁর মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। সবাই চাইতেন এ নওমুসলিমের মুখে ইসলামের সৌন্দর্যের কথা শুনতে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু লোক আসতেন তাঁকে নেবার জন্য। ডক্টর ইসলাম-উল-হকের মূল্যবান আলোচনা শোনার জন্য এদেশের প্রায় প্রতিটি মুসলমান আগ্রহী ছিলেন।

ডক্টর হকের মূল্যবান আলোচনা শুনে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যদি ইসলামী জীবনবোধের প্রতি সামান্যতম আগ্রহ বাড়ে কিংবা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তারা উৎসাহী হয়ে ওঠে তাহলে ক্ষতি তো ছিল না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ দেশে অবস্থানের জন্য তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি চিঠিতে জানানো হয় আগস্টের ৩১ তারিখের মধ্যে তাঁকে এদেশ থেকে চলে যেতে হবে। সরকারি নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ডক্টর হকের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও ইসলামের সৌন্দর্যের ওপর সুচিন্তিত আলোচনা শোনার যে আগ্রহ তা বিবেচনা করে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবার কি কোনও উপায় ছিল না? বিশেষত বাংলাদেশের মুসলমানদের সঙ্গে আরও কিছুদিন মেলামেশার আগ্রহও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া ইসলামগ্রহণের পর সেবারই তিনি প্রথম ভারতের বাইরে আসেন। বাংলাদেশে আসবার কিছুদিন পরই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ কারণেও তিনি কিছু নির্ধারিত সভা-সমাবেশে উপস্থিত হতে পারেননি।

আমরা জানি, একটি বিশেষ মহল ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে ডক্টর হকের কোনও বক্তব্য শুনে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও সাড়া জাগুক তা চায়নি। বরং এ বিশেষ মহলটি চেষ্টা করছে যেন তাঁকে এদেশ থেকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ডক্টর হকের মুখে ইসলামের কিছু কথা শুনে এদেশের ইসলামপ্রিয় মানুষ সামান্যতম উপকৃত হোক এ মহলটি তা সহ্য করতে পারছিল না। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ডক্টর হককে যেন বাংলাদেশে আসতে না দেয়া হয় এজন্য তারা চেষ্টাও করেছিল। এদেশের দু'একটি পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর সম্পর্কে কিছু অশালীন ও অসত্য কথা ছড়ানোর চেষ্টা চলেছিল বলে আমরা জানি। এমনকি তাঁর সম্পর্কে কিছু না জেনেই তাঁকে 'বিতর্কিত' ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করবার অপচেষ্টাও এ মহলটি করেছে।

হ্যাঁ, দু'একটি মহল চাচ্ছিল তাঁকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করতে। কিন্তু তিনি এসব বুঝতে পেরে সতর্কতাও অবলম্বন করেছিলের। তিনি কোনও মহলের দ্বারা বিভ্রান্ত হবার পাত্র ছিলেন না বলে আমাদের বিশ্বাস।

যা হোক, তিনি ছিলেন আমাদের অতিথি। আমাদের কোনও আচরণে তিনি কোনওরূপ মনোকষ্ট পান তা আমরা স্বাভাবিকভাবেই চাইছিলাম না। বিশেষত একজন নওমুসলিম একটি মুসলিমপ্রধান দেশে সফরে এসে মনোকষ্ট পাবেন এমনটি আশা করা দুর্ভাগ্যজনক বৈ কি।

আমরা শুধু কর্তৃপক্ষের কাছে যে অনুরোধটুকু রাখতে চাইছিলাম তা ছিল, এ সম্মানিত মেহমান ইসলাম সম্পর্কে কথাবার্তা বলবার জ-্য এবং এদেশের অসংখ্য আলেম-ওলামার কাছ থেকে কিছু জানবার জন্য যতদিন তিনি এদেশে থাকতে চান থাকুন। তাঁর এ আগ্রহের প্রতি যেন আমরা যথার্থ সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কোনও ত্রুটি না করি। কারণ ইসলাম সম্পর্কে তিনি সবকিছু জেনে ফেলেছেন এমনটি আশা করা যায় না। ইসলামের এমন কিছু দিক আছে যেগুলো তিনি হয়তো তখনও জানতে পারেননি। আর ক'বছরইবা হয়েছিল তাঁর ইসলাম-গ্রহণের? ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্য মুসলমানদের সাহচর্য তাঁর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। এ দিকগুলো ডক্টর হকের ব্যাপারে আমাদের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি। প্রয়োজনে আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও তাঁর বিষয়টি সহৃদয় ভেবে দেখতে হতো বলে আমরা তখন মনে করেছি।*

---

* আমরা এ নিবন্ধটি ৩১-৮-১৯৮৯ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে উপসম্পাদকীয় কলামে ছাপা হয়। —লেখক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ড. ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

ভারতের প্রখ্যাত নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল-হক কোথায় কিভাবে ছিলেন তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। তিনি কি তখন পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে বাইরে অবস্থান করেছেন? গত ১৯৮৯ ঈসায়ী সালের অক্টোবরের শেষদিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ একরকম জোর করেই ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর পাঠিয়ে দেয়। এরপর থেকে তিনি কোথায় কিভাবে দিনযাপন করেছেন তা অনেকেরই জানা ছিলনা। তিনি আবার তাঁর পূর্বেকার জীবন তথা বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবানের আসন অলংকৃত করেননি তো? এ প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে অনেক বার হতে হয়েছে। এমনকি অনেক ভারতীয়ও জানতেন না ড. হকের অবস্থানের কথা। সেদিন কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তো বলেই ফেললেন যে, ড. ইসলাম-উল-হক আবার তাঁর পূর্বের জীবনে ফিরে গেছেন। শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু পর্যন্ত মুণ্ডন করে টিকি রেখে এবং পৈতে পরে হিন্দুদের ভগবান সেজেছেন। আমি আশ্চর্য হয়নি। আমি তাঁর তখনকার অবস্থানে গিয়ে সরেজমিনে হিন্দুত্ববরণের কাহিনী শোনার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে কলকাতার অনেকেই আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। আসলে যারা আমার কাছে ড. হকের বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর অবস্থান কোথায় তাও জানতেন না। অথচ তাদের মুখে "ড. হক আবার হিন্দু হয়ে গেছেন, ভদ্রলোক মস্তবড় প্রতারক, ওমন লোককে বিশ্বাস করা মুশকিল" ইত্যাদি কথাগুলো খইয়ের মতো ফুটছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, যারা ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে নানা আজগুবি কথা ছড়িয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁকে একটিবারও চোখে দেখেননি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা তো দূরে থাকুক।

যাহোক, ড. ইসলাম তখন স্ত্রী খাদিজা হক ও কনিষ্ঠা কন্যা আয়েশা হককে নিয়ে উত্তর প্রদেশে ঐতিহাসিক শহর জৌনপুরে অবস্থান করেছেন।

জীবিকানির্বাহের অবলম্বন হিসেবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় চালু করেছিলেন। পুরনো ও জটিল রোগীরা চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে আসতেন।

ড. হকের ইসলামগ্রহণের পর থেকেই ভারতের কোনও কোনও মহল থেকে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। তিনি প্রতারক, দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, মুসলিমসমাজে তাঁকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক নয় ইত্যাদি। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্তের জন্য আমি ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় যাই। এ উদ্দেশে গত ১৯৯১ সালের ৬ মার্চ একরকম আকস্মিকভাবেই জৌনপুর হাজির হই। কথা ছিল কলকাতা থেকে তাঁকে টেলিগ্রাম করবো। কিন্তু না, টেলিগ্রাম করিনি। আগেভাগে খবর দিলে হয়তো আমাকে দেখানোর জন্য অন্যভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে পারেন।

দুপুর ঠিক একটা বাজতে যাচ্ছে। রিক্সা থেকে নেমে কলিংবেলের সুইজ টিপতেই আয়েশা দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখে দু' মা-মেয়ে ভীষণ খুশি। তাঁরা আদৌ ভাবেনি আমি আবার তাদের জৌনপুরের বাসাতেও হানা দেবো। ঠিক যেমনটি ১৯৮৭ সালের ৩০ জুলাইয়ের কাকডাকা ভোরে ভুপালের বাসাতে হানা দিয়েছিলাম। আমার পৌছার মিনিট তিনচার পরেই ড. হক বাজার থেকে ফিরলেন। সঙ্গে নিত্যকার বাজার, দু'হাতে বাজারের সওদাভর্তি ব্যাগ, লম্বা পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি এবং মুখের শ্বেতশুভ্র দাড়ি দেখে কলকাতার জনৈক ব্যক্তির কথা মনে হলো। তিনি বলেছিলেন, ড. হক পাঞ্জাবি-পাজামা ছেড়ে এবং দাড়ি কেটে আবার ভগবানের আসনে বসেছেন। আমি মনে মনে হাসলাম শুধু। বাজারের ব্যাগ তাড়াহুরো করে রেখেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাকে বরণ করে নিলেন। কোলাকুলি করলেন আবেগমথিত হয়ে।

পরে নানা কথা হলো। দিল্লি ও মুম্বে থেকে সউদি আরবে ড. আহমদ তুতুঞ্জির কাছে পাঠানো ড. হকের বিরুদ্ধে দু'টো অভিযোগপত্রের কপি তাঁকে দিলাম। এতে তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেও উদ্বিগ্ন হলেন না। বললেন, "এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। যারা আমার বিরুদ্ধে গোটা মুসলিমবিশ্বে মিথ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন তাঁরা আমাকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং চক্ষুশূল মনে করছেন। অথচ আমি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা দুশমন নই। আমি তাঁদের আমার বন্ধু মনে করি। তবে যারা মুসলিম সেজে ইসলামের ক্ষতি করতে চায় তাঁরা আমারও দুশমন।"

ড. হকের বর্তমান, অতীত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জৌনপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব আকবর হোসাইন, মুহাম্মদ উসমান, আলিম খান প্রমুখের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো। তাঁরা সকলেই ড. হকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশিষ্ট

ইসলামী চিন্তাবিদ আকবর হোসাইনসাহেব বলেন "ড. ইসলাম-উল-হকের বর্তমান কার্যকলাপ একজন আদর্শবাদী মুসলমানের মতো। তাঁর কোনও আচরণ বা তৎপরতায় ইসলামের খেলাফ কিছু নেই। তাঁর বর্তমান জীবনযাপন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতো।"

জৌনপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মদ উসমান বলেন, "ড. হককে আমরা প্রায় দু'বছর যাবৎ দেখছি। তাঁর মধ্যে এমন কিছু আমরা এখনও দেখিনি যা ইসলাম ও মুসলিমসমাজের জন্য ক্ষতিকর। বরং তাঁর নিত্যদিনের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, মানবীয় তৎপরতা সবই একজন খাঁটি মুসলমানের মতো। তাঁর ইসলামগ্রহণ বা ধর্মপরিবর্তনের পেছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে এমনটি ভাবলে আমাদের গুনাহ হবে বলে মনে করি। তাঁকে আমরা আমাদের একজন ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছি।"

উসমান ও আকবরসাহেব দুজনেই সাক্ষ্য দিলেন, যারা ড. হকের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছড়িয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। তারা এক হীন উদ্দেশ্যেই ড. হকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। ড. হক উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যান এবং ধর্মীয় জলসায় বা সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। জৌনপুরের একজন সরকারি কর্মচারী এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য জনাব আলিম খান বলেন, "আমি তাঁর প্রতিটি সভা-সমাবেশে যাই। তাঁর আলোচনা শোনার জন্য প্রায় প্রতিটি সভাতেই হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। তিনি এসব জলসাতে মুসলমানসমাজকে খাঁটি ইসলামের অনুসারী হবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁর কথাবার্তায় কোনও অহমিকা নেই।"

স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (S.I.O) এর জৌনপুর জোনের সভাপতি জনাব আবুল কালামের সঙ্গে ড. হক সম্পর্কে কথা হলো। তিনি সাক্ষ্য দিলেন "তাঁর বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমার জানা নেই। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন সবকিছুই একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতো।"

জৌনপুরের ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগের পরিচালক শহিদ হামিদ খানের সঙ্গেও ড. হক সম্পর্কে আলাপ হলো। তিনিও জানালেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও খারাপ কথা তাঁরা শোনেননি। জৌনপুরে তিনি যদ্দিন থেকে আছেন তদ্দিনের মধ্যে এমনকিছু তাঁরা ড. হকের কাছে পাননি যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর।

৯ মার্চ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌর উদ্দেশে খুব ভোরে রওয়ানা হলাম। ড. হক নিজেই রিকশা করে আমাকে নিয়ে স্টেশনে এলেন। সঙ্গে

ছিলেন শাহেদ জামাল নামে একজন তরুণ। ভীষণ চটপটে এবং আন্তরিক। ড. হক অশ্রুসজল চোখে আমাকে বিদায় দিলেন। স্টেশনে আলিম খানের সঙ্গে দেখো হলো। আগের দিন কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবেন। ওখানে যেন আমার কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি সঙ্গে থাকবেন। ভাবতেও পারিনি তিনি সত্যি সত্যি যাবেন আমাকে নিয়ে। তাঁর এ ওয়াদা রক্ষার আন্তরিকতা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। যাত্রার ট্রেনভাড়া আমি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা নেননি। বরং লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি যখন আমাকে বিদায় দিচ্ছিলেন দিল্লির উদ্দেশে তখন যেন কথাই বলতে পারছিলেন না আমার সঙ্গে। দু'তিন দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাকে জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে দিলেন। আমি যা ভাবতেও পারিনি। এ আলিম খানসাহেব ড. হকের সঙ্গে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যান। তিনি আমার কাছে বলেন, "উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন মাহফিলে ড. হক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সভার সমস্ত লোক অভিনিবেশ সহকারে তা শোনেন।"

লক্ষ্ণৌর হাওদার বিল্ডিং-এ ৯ মার্চ অল ইন্ডিয়া মসজিদ কাউন্সিলের সভাপতি হযরত মওলানা আব্দুল গফফার নদভীসাহেবের সঙ্গে ড. হক সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, "নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল-হক সম্পর্কে আমি অনেক অভিযোগ শুনেছি। কিন্তু আমি সেগুলোর প্রমাণ হাতেনাতে পাইনি। আমি মনে করি এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। এসবে আমাদের কান না দেয়াই উচিত। তাঁর অন্তরের খবর আমরা জানি না। তবে তাঁর বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে ইসলাম এবং মুসলিমসমাজের জন্য ক্ষতিকর কিছু দেখা যায়নি বলেই আমি জানি।"

লক্ষ্ণৌর তরুণ সাংবাদিক এবং স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (এসআইও)-এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব তারিক ফারকালিতের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বললেন, "ড. হক বিরাট এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে ইসলামগ্রহণ করেছেন। আমরা তাঁকে সঠিক মর্যাদা দিতে পারিনি। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছেন। তবে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী তিনি এখনও হতে পারেননি। এজন্য তাঁকে চেষ্টা করতে হবে। কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আমরা তাঁর বর্তমান কার্যকলাপে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি। তবে ভবিষ্যতের কথা আমরা বলতে পারি না। আর ড. হকের দিলের খবরও আমরা জানি না।

এসআইও'র সভাপতি জনাব ইনামুল্লাহ ফালাহির সঙ্গে কথা হলো। তিনিও ড. হকের প্রশংসাই করলেন। ভারতে ড. হকের বিরুদ্ধে যারা নানা কথা ছড়াচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পেলাম লক্ষ্ণৌর মওলানা রফিক কাশেমীকে। তিনি তাঁর নামই সহ্য করতে পারছেন না। তিনি আমার সঙ্গে আলাপকালে এক পর্যায়ে রাগের মাথায় বলেই বসলেন, "বাংলাদেশীরা ইসলাম-উল-হকের মতো একজন প্রতারককে নিয়ে এতো নাচাকুদা করেন কেন? আপনারা কি আর কাউকে পান না।" আমি কাশেমীসাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের সঙ্গে ড. হক কী প্রতারণা করেছেন? তিনি এর সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন। তিনি আমার কাছে আরও প্রকাশ করেন যে, "জৌনপুরের কোনও মুসলমানকে যদি ড. হকের সঙ্গে ওঠাবসা করতে দেখা যায় তাহলে তাকে দেখে নেয়া হবে।" সঙ্গে সঙ্গে আমি এর প্রতিবাদ করে কাশেমীসাহেবকে বলেছিলাম, আপনার এ উক্তিইতো ইসলামের খেলাফ। এর পর তিনি আর কোনও কথা বলেননি।

১০ মার্চ সকালে নয়াদিল্লি পৌঁছলাম। ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমির হযরত মওলানা আবুল লাইস ইসলাহী নদভীসাহেবের সঙ্গে ড. ইসলাম উল-হক সম্পর্কে কথাবার্তা হলো। লাইস সাহেব বেশ ভেবেচিন্তে আমার সঙ্গে ড. হক সম্পর্কে কথা বললেন বলেই মনে হলো। তিনি বললেন, "আমি তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা পড়েছি এবং লোকমুখে যা শুনেছি এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, তিনি একজন মুসলমান। তাঁর ইসলামগ্রহণের উদ্দেশ্যও মহৎ। আমরা তাঁর ইসলামগ্রহণকে যেমন খাটো করে দেখতে চাই না, তেমনি তাঁকে নিয়ে খুব একটা হৈচৈও করতে চাইনা। শুধু ড. হক কেন, ভারতে আরও বহু লোক ইসলামগ্রহণ করেছেন তাঁদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই। কাজেই আমরা কারুর ইসলামগ্রহণকেই কোনও বিস্ময়কর ঘটনা মনে করি না। ইসলামকে যারা বুঝতে সক্ষম হবেন তাঁদের কেউ কেউ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হবেন। যারা ইসলামগ্রহণ করেন তাঁদের কৃতিত্বকে নয়, আমরা আল্লাহর ইচ্ছাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স) তথা ইসলামের ওপর ঈমান আনেন তাদের আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাই, তিনি যে ধর্ম এবং যে পদমর্যাদারই লোক হন না কেন। ড. হকের বেলাতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা অবশ্যই তাঁকে মুবারকবাদ জানাই।" এরপর আমি ইসলাহীসাহেবের কাছে জানতে চাই যে, ড. হকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উঠেছে। এসব ব্যাপারে কি কিছু আমাকে

মেহেরবানি করে বলবেন? তিনি বলেন, "নয়াদিল্লিসহ ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ড. হকের ওপর বিভিন্ন লেখা মাঝে মাঝে পড়েছি। তাঁর ইসলামগ্রহণের কারণও আমি জেনেছি পত্র-পত্রিকার মারফত। কারণ তাঁকে নিয়ে এখানকার পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এসবের মধ্যে দু'একজন তাঁর বিরুদ্ধেও লিখেছে। পত্রিকার সবকথাই বিশ্বাসযোগ্য এটা আমি মনে করি না। এ ছাড়া দু'একজন তাঁর সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর কথা বলেছেন ঠিক, কিন্তু সেগুলোর কোনও প্রমাণ তাঁরা দেননি। কাজেই সেগুলোকে আমি উদ্দেশ্যমূলক বলেই ধরে নিয়েছি।"

এরপর শফি মুনিসসাহেবের সঙ্গে কথা হলো। তিনি ড. হক সম্পর্কে তেমন কোনও উৎসাহ দেখালেন না বলা চলে। এমনকি ড. হক সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কাজেই আমিও ভদ্রলোককে পীড়াপীড়ি করতে চাইনি।

একই দিন দুপুরে নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত 'দাওয়াত' পত্রিকার সম্পাদক পারওয়াজ রাহমানীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ড. হক সম্পর্কে আলাপ হলো। রাহমানীসাহেব ইসলাম-উল-হককে স্বচক্ষে না দেখলেও আলোচনার মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন। তাঁর পত্রিকাতেও হকসাহেবের ওপর প্রতিবেদন বেরিয়েছিল বলে তিনি আমাকে জানালেন। এর পরও ভালো-মন্দ বেশকিছু কথা হকসাহেব সম্পর্কে তাঁর কানে এসেছে বলে জানালেন। পরে আমি ড. হককে লেখা লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামার মওলানা অবুল হাসান আলী নদভী, ভুপালের শেখ এনামুর রহমান খান এবং উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগরস্থ জনসট মাদরাসা তালিমুল কুরআনের প্রধান নাজির আহমদ কাশেমীর চিঠি দেখালাম। চিঠিগুলো তিনি দেখলেন মনোযোগ দিয়ে। পরে বললেন, 'অন্যের কথায় ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। আজ থেকে আমি সেটা শুধরে নিলাম।" দিল্লির দু'একটি পত্রিকা যেমন 'নয়ী দুনিয়া' 'আফকারে মিল্লি' প্রভৃতি ইসলাম-উল-হক প্রসঙ্গে দু'মুখো ভূমিকা পালন করেছে। এ ব্যাপারে পারওয়াজ রাহমানীর মতামত জানতে চাইলে তিনি সংক্ষেপে বলেন, "এমনটিও তো হতে পারে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ চাপ প্রয়োগ করে কিছু কিছু পত্রিকার লোকদের ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে লিখিয়েছে। কাজেই কোনও পত্রিকার দুমুখো তৎপরতা দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ভারতে এমনটি অনেক সময় ঘটেই থাকে। বিশেষ করে এখানকার মুসলমানরা অনেক সময় হক কথা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বলতে পারে না। আবার অনেক সময় কোনও হককথা বলে ফেললেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য নানাভাবে

চাপ প্রয়োগ করা হয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন কেমন অবস্থার মধ্যে থেকে এখানকার মুসলমানদের চলতে হয়। হকসাহেবের ব্যাপারেও কোনও কোনও পত্রিকাতে এমনতরো অবস্থার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আরেকটা কথা আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, একটা লোক সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হবেন এটাইবা কিভাবে ভাবা যায় বলুন? ড. হকের ইসলামগ্রহণ শুধু ভারতীয় হিন্দু নয়, পৃথিবীর সকল হিন্দুর আত্মসম্মানের ব্যাপার, এটা তাদের প্রেস্টিজ ইস্যু। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য নানাভাবে প্রভাব খাটানো হয়। এর প্রভাববলয় থেকে আমরা কি মুক্ত?"

পারওয়াজ রাহমানীর কথায় স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, একটি বিশেষমহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ড. ইসলাম-উল-হকের বিরুদ্ধে না-হক কথা ছড়াচ্ছে। এ মহলটি গাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁর বিরুদ্ধে লেখায়নি একথা কি বিশ্বাস করবার মতো? কারণ ড. হক যখন ভুপালে গিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন তখন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। একশ্রেণীর মুসলমানও যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে হকসাহেবের বিরুদ্ধে খেলছে না এ কথাইবা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়।

পরে নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'রেডিয়েন্স'-এর সম্পাদক সাইয়েদ ইউসুফ এবং পরিচালক ইনতিজার নঈমসাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নঈমসাহেবের মুখে ড. হক সম্পর্কে লক্ষ্ণৌর মওলানা রফিক কাশেমীর উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও রেডিয়েন্সের অনারারি সম্পাদক সাইয়েদ ইউসুফ কিন্তু অত্যন্ত মেপে মেপে ড. হক সম্পর্কে দু'এক কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "হকসাহেবের ইসলামগ্রহণের খবর শুনে আমাদের উৎফুল্ল হবার যেমন কিছু নেই, তেমনি তাঁকে আমরা হেয়ও করতে চাইনা। তিনি যে পর্যায়েরই লোক হন না কেন, ইসলামগ্রহণের পর তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতো দিনযাপন করবেন এটা আমরা স্বাভাবিকভাবেই চাবো। ইসলামগ্রহণের জন্য আমরা যেমন তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচতে চাই না, ঠিক তেমনি দূরে সরিয়েও দিতে চাই না। কারণ তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য।"

দিল্লিতে মুম্বের ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহসাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি সাক্ষ্য দিলেন, "ড. হকের ইসলামগ্রহণের খবর আমি পেয়েছি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আমার জানা নেই।"

প্রিয় পাঠক, চলুন আমরা আবার উত্তর প্রদেশের ঐতিহাসিক শহর এবং মুসলিমশাসনের স্মৃতিবিজড়িত ফিরোজ শাহ তুঘলগ প্রতিষ্ঠিত জৌনপুরে যাই। হ্যাঁ, এখানেই ভারতের সাবেক ভগবান বলে পরিচিত শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন মোহন্ত ধর্মাচার্য আদ্যশক্তিপীঠ, আজকের নওমুসলিম ইসলাম-উল-হক সপরিবার বসবাস করছেন সম্প্রতি। গোমতি নদীবিধৌত, জৌনপুরের আজমিরি মহল্লাতে তিনি আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি চালু করেছেন। ফার্মেসির নাম 'রুহানি ক্লিনিক'। দুআ এবং দাওয়া এ উভয়বিধ পদ্ধতিতে তিনি মানুষের পুরনো রোগ নিরাময় করেন। দুরদুরান্ত থেকে নানা শ্রেণীর রোগী তাঁর শরণাপন্ন হয়। দুষ্পাপ্য ওষুধি, খনিজদ্রব্য প্রভৃতির সাহায্যে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করেন। মানসিক রোগেরও চিকিৎসা চলে তাঁর রুহানি ক্লিনিকে। যোগশাস্ত্র অনুযায়ীও তিনি রোগীদের নানা পরামর্শ প্রদান করেন।

ড. হক নিজেও ওষুধ তৈরি করেন। আবার অন্যান্য ওষুধালয়েরও ওষুধ তাঁর ফার্মেসিতে পাওয়া যায়। ওষুধ তৈরির কাজে তার স্ত্রী মিসেস খাদিজা এবং কন্যা আয়েশাও সহযোগিতা করেন। জৌনপুর বড়মসজিদের খুব কাজেই আজমিরি মহল্লা। এ মহল্লার একটি ছোট রাস্তার পাশে তার ভাড়াটে বাড়ি। বাড়িটির চারটি কক্ষ। একটি রোগীদের ওয়েটিং রুম। আরেকটিতে ফার্মেসি। বাকি দুটো বেডরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাড়িটি খুব বড় নয়। কিন্তু ভেতরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাজানো গোছানো। কোথাও ধুলোবালি জমে নেই। বাড়িটির মাসিক ভাড়া এক হাজার ভারতীয় রুপী। ভুপাল থেকে জৌনপুর এসে তিনি এ বাড়িটিই ভাড়া নিয়েছিলেন।

ভারতের সরকারঘেঁষা মুসলিম পরিচালিত কয়েকটি পত্রিকায় ড. হকের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন থেকে দেশে না থাকবার দরুন তাঁর চিকিৎসাকর্ম ব্যাহত হয়েছে। ফলে রোগীদেরও আনাগোনা অনেকটা কমে গেছে বলে তিনি জানালেন। এ ছাড়া জৌনপুরে বসবাসকারী মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। এ জন্য অনেক জটিল রোগীর চিকিৎসা বিনামূল্যে করতে হয়। এমনকি বিনামূল্যে অনেককে মুল্যবান ওষুধও দিতে হয়। এতেও তাঁকে অনেক সময় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বলে জানান। অপরদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর পূর্বেকার ব্যাংক একাউন্ট সিজ করেছে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন মাঝে মধ্যে এসে নানা খোঁজখবর নিয়ে যায়। এ ছাড়াও বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আর এসএস-এর লোকেরা তাঁর পেছনে

লেগে আছে। বাইরের কোনও লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই ওরা ছুটে আসে। "কে এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন?" এমনিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে ওরা। ৬ মার্চ দুপুরে ড. হকের বাসায় আমার পৌছাবার মিনিট পনের পরেই রাজেশ জসওয়াল নামে একজন এলেন আমার খোঁজখবর নেবার জন্য। নানাভাবে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। পরে ড. হক বললেন, রাজেশ জসওয়ালকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আরএসএস যৌথভাবে নিয়োগ করেছে তাঁর পেছনে। আমি তিনদিন ড. হকের বাসায় ছিলাম। রাজেশ বাবু প্রত্যেক দিন তিনবেলা সকাল-দুপুর সন্ধা এসে বসে থাকতেন। এক পর্যায়ে জৌনপুরের বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আরএসএস এর অফিসে আমাকে নেমন্তন্ন(?) পর্যন্ত করেন রাজেশ বাবু। তবে আমি সে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারিনি।

ড. হক নিজেও আমাকে একান্তে ডেকে রাজেশ জসওয়াল সম্পর্কে খুব সজাগ থাকবার জন্য বলেছিলেন। এমনি এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ড. হককে পরিবার পরিজন নিয়ে জৌনপুরে বসবাস করতে হচ্ছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলমান তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারছেন না। তবে অনেক বিপত্তি সত্ত্বেও জৌনপুরের বিশিষ্ট ইসলামীচিন্তাবিদ ও বিপ্লবী মুজাহিদ জনাব আকবর হোসাইন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মদ উসমান, আলিম খান প্রমুখ সহৃদয় বক্তিবর্গ ড, হকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত ও সাহচর্য প্রদান করেন। বিশেষ করে আলিম খান ড. হকের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সভা-সমাবেশেও গিয়ে থাকেন বলে জানা গেছে। তবে তার প্রতিটি কথাবার্তা এবং চলাফেরার প্রতি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কড়া নযর রাখছে। এমনকি সাধারণ মুসলমানরা যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করে, সেজন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আরএসএস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের লোকজন জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এ অপতৎপরতার সঙ্গে একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী মুসলমানও জড়িত আছেন বলে ড. হক দুঃখ প্রকাশ করেন।

যা হোক, একরকম বৈরি পরিবেশের মধ্যে ড. হককে পরিবার পরিজন নিয়ে জৌনপুরে বসবাস করতে হয়। সময় নষ্ট করে নিজেই বাজার করেন। মিসেস হক এবং আয়েশাকে ফার্মেসির কাজে সহযোগিতা ছাড়াও রান্না-বান্না করতে হয়।

ড. হকের নেশার অভ্যাস নেই। তাম্বুল সেবনকে পর্যন্ত বাজে কর্ম মনে করেন তিনি। খুবই সাধারণ ও সাধাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ড. হক সপরিবার 'একাহারী'। অর্থাৎ তাঁরা একবার আহারগ্রহণ করেন। সকালে সামান্য নাস্তা করেন। তারপর দুপুর গড়িয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন। রাতে কোনও খাবার তাঁরা খান না।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আরএসএস প্রভৃতির লোকজন চায় না ড. হক কোথাও স্বস্তিতে বসবাস করুন। ভুপালেও তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করেছিল তারা। ফলে তিনি জৌনপুরে চলে এসেছিলেন। এখানেও নিস্তার নেই। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা চায় ড. হক যেন কোথাও শান্তিতে না থাকতে পারেন।

জৌনপুরে ড. হককে আমি প্রশ্ন করেছিলাম "আপনি নিজের ব্যাপারে কারুর সহযোগিতা চান কি না?" তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "আমি মানুষের কোনও সাহায্য সহযোগিতা চাই না। আমি আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। আমি সাহায্য তাঁর কাছেই চাই।"

তিনি অত্যন্ত দুঃখ করে একটি বিষয় আমাকে অবহিত করালেন। সেটি হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে একশ্রেণীর মুসলমান নানা কথাবার্তা ছড়াচ্ছেন। এমনটি কেন হচ্ছে? তিনি বলেন, "একশ্রেণীর বেদাতি আলেম তাদের দলে ভেড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। আমি তাদের আহ্বানে সাড়া দেইনি। এটা একটা আমার মহাপাপ (?) হয়েছে। বেদাতিদের দলে না ভেড়ার কারণে তাঁরা মরিয়া হয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এছাড়া আমার মতো একজন নগণ্য নওমুসলিম বিশ্বের কোথাও সমাদৃত হোক এটাও অনেকের কাছে পছন্দনীয় নয়। কাজেই কেউ কেউ আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে নানা কথাবার্তা ছড়াচ্ছেন। এটাকে আমি আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলতে পারি বলুন?'

ড. হকের নানা কথাবার্তায় বোঝা যায় তিনি জৌনপুরে বেশি দিন থাকতে চান না। কোথাও সুবিধাজনক পরিবেশ পেলে খুব শিগগিরই জৌনপুর থেকেও হিজরত করতে চান তিনি।

১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের সাবেক পীর হযরত মওলানা ইয়াকুব ঘোলায়ীসাহেবের সঙ্গে ড. ইসলাম-উল-হক সম্পর্কে কথা হলো। ঘোলায়ীসাহেব সেদিন অসুস্থ ছিলেন। খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তবু ড. হক সম্পর্কে আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন।

তিনি বললেন, "ভারতের সাবেক ভগবান শিবশক্তির ইসলামগ্রহণের খবর শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করেছি। তাঁর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত ধর্মাচার্যকে ইসলামী সমাজে পাওয়া অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু অত্যন্ত

দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের সমাজেরই কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ড. হকের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থ এবং পরশ্রীকাতরতার জন্য এমন কিছু দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যাতে জাতি হিসেবে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে। আমরা এমন কিছু যোগ্যতা (?) অর্জন করেছি যেজন্য যারা আমাদের সত্যিকার অর্থেই আপনজন তাঁদের দূরে ঠেলে দিচ্ছি। আর যারা আমদের দুশমন তাদের বন্ধু ভেবে কাছে টেনে নিচ্ছি। আমরা ঘরকে পর বানাচ্ছি, পরকে ঘর বানাচ্ছি। এ হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থা।"

আমি ঘোলায়ীসাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, "ড. হক যদি কলকাতা কিংবা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও জৌনপুর থেকে হিজরত করেন তাহলে কি স্থানীয় কর্তপক্ষের তরফ থেকে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে?" জনাব ঘোলায়ী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এমনই নাজুক যে, আমরা সাধারণ নওমুসলিমদেরই এখানে রাখতে পারি না, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশের বিভিন্নস্থানে তাদের পাঠিয়ে দিতে হয়, কাজেই ড. হকের মতো নাম-করা নওমুসলিম এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন তা আদৌ ভাবা যায় না। এখানে আজকাল মারাত্মক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাঁধলেও চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিরাজ করছে। এখানকার মুসলমানারা চরম সংযমের পরিচয় দিয়ে আসছে বলেই সামনাসামনি কোনও সংঘর্ষ বাধে না। কারণ এখানকার কমিউনিস্ট প্রশাসন হিন্দু ও খৃস্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত মারমুখো। মুসলমানদের কোনওরূপ উত্থান ঘটুক কিংবা ইসলামের পক্ষে কেউ কথা বলুক তারা তা মোটেও চায় না। কাজেই কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থান ড. ইসলাম-উল-হকের জন্য নিরাপদ এটা ভাবাই যায় না।"

এরপর ইসলামিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট (এসআইএস)-এর পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা জোনের জেনারেল সেক্রেটারি ভাই তাইয়েদুল ইসলামের সঙ্গে ড. হক সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, "ড. হকের ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। একশ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা কেন? তিনি ভারতের নাগরিক। ইচ্ছা করলে দেশের যে কোনও স্থানে গিয়ে তিনি বসবাস করতে পারেন। এটা তাঁর নাগরিক অধিকার। তবে দেশের সাংবিধানিক আইন-

কানুনকে বুড়ো অঙ্গুল দেখিয়ে যারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত হয় তাদের কথা ভিন্ন।"

মোটকথা, সারা ভারতে ড. হককে নিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিরাজ করছে। এর শতকরা ৭৫ ভাগ ইতিবাচক এবং শতকরা ২৫ ভাগ নেতিবাচক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ড. হককে আরও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাঁর ভাগ্যাকাশে কালোমেঘের ঘনঘটা। মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে। বজ্রপাত ঘটবে না এমনটি বলা মুশকিল। তবে আমরা আশা করি, সবমেঘ কেটে যাবে। ঝড়ঝাপটাও হয়তো থেমে যাবে। ড. হক তাঁর ঈমানের পরীক্ষায় সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হবেন, সব প্রতিকূলতাকে ধৈর্যের সঙ্গে কেটে উঠবেন এটা আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই কামনা করি। ড. হকের সামনে দীর্ঘপথ। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। সুগম নয়, বন্ধুর। এ বন্ধুর পথেই আমরা তাঁর স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক গতিময়তার জন্য চেয়ে রইলাম।*

* এ ধারাবাহিক লেখাটি বিগত ২৩ চৈত্র, ৩০ চৈত্র ও ৬ বৈশাখ ১৩৯৭ বাংলা সনে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। — লেখক

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলাম-উল-হকের একটি পুস্তক প্রসঙ্গে

ডক্টর ইসলাম-উল-হক তাঁর 'লিজিয়ে আপভি সোঁচিয়ে' পুস্তকটি বস্তুত স্বামী বেদমুনি পরিব্রাজকের ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কিত আপত্তিকর প্রবন্ধের জবাব। ডক্টর হক নানা ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন। এ পুস্তিকার সর্বত্র বিশেষত এর 'ঐশী গ্রন্থ কুরআন : একটি খোলা চিঠি' প্রবন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার ছাপ সুস্পষ্ট। ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে পড়াশোনা করলেই যে ইসলামের আলো লাভ করা সম্ভব, এমন নয়। ইসলামের আলো একান্তভাবেই আল্লাহর দান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে মেনে নিয়ে যাঁরা তাঁর আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, কেবল তাঁরাই দুনিয়ার আগুন আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন। ইসলামের পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডক্টর ইসলাম-উল-হক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ইসলামের কলেমা পাঠ করে যাঁরা এর আদর্শে জীবনযাপন করেন, তাঁরা ভাবিজীবনে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পান ও বেহেশতের বাসিন্দা হতে পারেন। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাঁরা ইসলামগ্রহণ করেন তাঁরা লাভ করেন এক অসাধারণ সৌভাগ্য। ডক্টর ইসলাম-উল-হক তাঁদেরই একজন। সম্প্রতি ভারতে বেশ কিছুসংখ্যক হরিজন ও অশিক্ষিত আদিবাসী ইসলামগ্রহণ করেছেন। অতীতেও এদেশের অনেক রাজা মহারাজা বিত্তবান জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্ব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। আর এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে এযাবৎ ভারতের কোনও ধর্মনেতা, মোহন্ত, আশ্রমপরিচালক ও রাজা-মহারাজাদের ধর্মগুরু কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামকবুল করেননি। ডক্টর হকের ইসলামগ্রহণের ঘটনা এ কারণেই বিশেষ তাৎপর্যবহ। তিনি ইসলামগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, ইসলামপ্রচারেও আত্মনিয়োগ করেছেন। কোনও তাবলিগের প্রেরণা ছাড়াই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সরাসরি ডক্টর সাহেবকে এ গৌরব দান করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) স্বয়ং স্বপ্নে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে

হিদায়াত করবার জন্য। 'ক্যু আন ফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা'—অর্থাৎ দোযখের আগুন থেকে তোমরা নিজে এবং স্বজন-পরিজনকে বাঁচাও।

ভারতের বিখ্যাত হিন্দুধর্মগুরু স্বামী বেদমুনি পরিব্রাজক আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাধ্যমে যে বিষোদগার করেছেন, তা নতুন কোনও ঘটনা নয়। চৌদ্দশত বছর আগে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে আল্লাহর বাণীর আলো যখন প্রথম এসে পৌছায় তখনও জিঘাংসাপরায়ণ পৌত্তলিকরা ইসলাম, কুরআন আর ইসলামের নবী (স) এর বিরুদ্ধে একইভাবে উঠেপড়ে লেগেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা নিয়োগ করেছিল সর্বশক্তি। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি, নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। হক্কানি আলেমসমাজ যুগে যুগে ইসলাম, কুরআন ও প্রিয়নবী (স)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিদ্বেষপূর্ণ অপপ্রচারের জবাব দিয়ে গেছেন। আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করছি এ কারণে যে, স্বামী বেদমুনি পরিব্রাজকের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি একদিন ছিলেন তাদেরই গুরু, মোহন্ত এবং প্রথম শ্রেণীর ধর্মনেতা।

ডক্টর ইসলাম-উল-হকের জীবনাদর্শ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করে সাধারণ দুঃখ-কষ্টের জীবনই বেছে নিয়েছেন। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হতে পেরে তিনি গৌরব বোধ করেছেন।

ডক্টর ইসলাম-উল-হক হচ্ছেন আমাদের মুখপাত্র আর আমরা হচ্ছি তাঁর চলার পথের সঙ্গী। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর জোশ ও জজবা, উৎসাহ, উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন!

এ পুস্তক হিন্দু-মুসলিম সর্বস্তরের মানুষের জন্যই কল্যাণকর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মুহাম্মদ আহমদ রিজভী
বায়তুস-সাঈদ, জাহাঙ্গীরাবাদ,
ভুপাল, ভারত

অতীত ও বর্তমানের আয়নায় ইসলাম-উল-হক

অন্ধকার যখন গভীর ও নিচ্ছিদ্র হয়ে ওঠে তখনই প্রোজ্জ্বল আলোক-রশ্মির আবির্ভাব ঘটে। সেই প্রোজ্জ্বল আলোকরশ্মি নিজেকে বিজয়ীর বেশে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার করে বিদূরিত। চারদিক ভেসে যায় আলোর বন্যায়। যেদিকে তাকানো যায় দেখা যায় শুধু আলো আর আলো। আজ এখানে যে মহান বিজয়ীর কথা বলা হচ্ছে, একদা তিনি ছিলেন পথভ্রষ্টতার গভীরতর অন্ধকারের এক মুকুটহীন সম্রাট। তখন তাঁর নাম ছিল মোহন্ত ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন ধর্মাচার্য। সে সময় তিনি অগণিত ভক্ত, অনুরক্ত এবং অনুসারী ও গুণগ্রাহীর কাছে 'ভগবান'রূপে পূজিত হতেন। ধর্মীয় ও পার্থিব বিদ্যায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধা হয়েছিলেন যে, তাঁর চেয়ে যোগ্য, তাঁর চেয়ে জ্ঞানী-গুণী তাঁর চেয়ে ধ্যানী আর বোধশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ভারতে আর নেই। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, পুঁজিপতি, ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা আশীর্বাদের জন্য তাঁর কাছে ধর্ণা দিতেন। তিনি সবাইকে আশীর্বাদ করতেন। সবার মনের ভাব হাল্কা করতেন। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে ছিল খাঁ খাঁ শূন্যতা। সবসময় কী যেন ভাবতেন। মনে কিছুতেই শান্তি পেতেন না। অন্যের গুরু হয়েও নিজে একজন প্রকৃত গুরুর সন্ধান করছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি দেশে দেশে ঘুরেছেন। রাতের পর রাত কাটিয়েছেন নির্ঘুম।

১৯৮৪ সনের এক রাতে অনেক চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ডুবে গেলেন গভীর ঘুমে। স্বপ্নে তাঁর সামনে এসে হাজির হলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের দূত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিশ্বনবী (স) তাঁকে কলেমা পড়ালেন আর বললেন "এদেশবাসীকে কলেমা পড়াও"। একই সময় তাঁর স্ত্রীও স্বপ্নে অভিন্ন আদেশ পেলেন। রাত ৩টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমগ্র হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আলোর বন্যায়। সেই সময়ই নিজেকে তাঁর মনে হলো ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমান। কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। অশ্রুসজল চোখে মুনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে পথ দেখাও, আমি তোমাকে চিনতে চাই, তোমাকে পেতে চাই।' তিনি আরও দুআ করলেন, "যে মহামানব তোমার

পরিচয় সম্পর্কে আমাকে অবগত করিয়েছেন, তাঁর জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই। আমাদের আলোর ধরণীতে নিয়ে চল। অন্ধকারে জন্ম নিয়েছি, কিন্তু আলোর জগতে যেন শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। হে আল্লাহ, হে দয়াময় রাহমানুর রাহিম, আমাদের মুনাজাত তুমি কবুল কর!"

দু'বছর কেটে গেল মানসিক প্রস্তুতিগ্রহণে বহুবিধ সামাজিক কারণে। ১৯৮৬ সনের ১০ মে পশ্চিম আকাশে হেসে উঠলো মাহে রমযানের একফালি বাঁকা চাঁদ। সেদিন তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং যুবতী কন্যা ইসলামের ছায়াতলে পরিপূর্ণ আশ্রয়গ্রহণ করলেন। উচ্চৈস্বরে পাঠ করলেন কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন মাবুদ নেই হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

পথভ্রষ্টতার অর্থাৎ গোমরাহির সুউচ্চ দেয়াল ধসে পড়লো। ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কথা ও কাজে দীনের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ইসলামের সেবাই হলো জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর সাধনায় ও কর্মে ইসলামের প্রাথমিক যুগ যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো।

ইসলাম সত্য—একারণে নামগ্রহণ করলেন ইসলাম-উল-হক। স্ত্রীর নাম রাখলেন খাদিজা বেগম। কন্যার নাম রাখা হলো আয়েশা হক। বিশ্বের সকল ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেই তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সব অপবাদ, সব অভিযোগ মিথ্যা ও অসার প্রমাণ করে তিনি চিরন্তন সত্য প্রচার করে যাচ্ছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও দাবি করেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই সত্যধর্ম, মুক্তির ধর্ম এবং মানবতার ধর্ম। এ ধর্মে আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, কলেমা এক আর মুসলমানেরা সবাই এক ও অবিচ্ছেদ্য।

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরুনানকের বংশধর ডক্টর ইসলাম-উল-হক এক অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন গ্রন্থকার, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক, বহু ভাষাবিদ এবং মনো-দৈহিক রোগের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বৃন্দাবনে নিজের আশ্রমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং পরে লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ডিভাইনিটি এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ভ্যাটিকানের পোপ ষষ্ঠ পল তাঁকে সম্মান সূচক ও এফ এম ক্যাপ খেতাব দিয়েছেন। ইসলামগ্রহণের আগে তিনি গোটা ভারতের হিন্দু ও আর্যসমাজে আচার্যগুরুর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সৈয়দ মাহবুব আলী
মাহবুব মঞ্জিল, জাহাঙ্গীরাবাদ,
ভুপাল, ভারত

ড. ইসলাম-উল-হকের লেখা থেকে

কুরআন আসমানি কিতাব কেন এবং কীভাবে?

মানুষের হিদায়াত ও পথ-নির্দেশের জন্য গ্রন্থাগারগুলোতে দুই ধরনের ধর্মগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এক : ইলহামি বা বোধসঞ্জাত গ্রন্থ, দুই : জাহিরি বা প্রকাশ্য ধর্মগ্রন্থ।

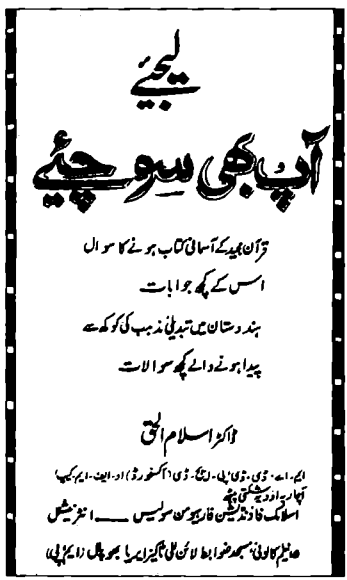

'লিজিয়ে আপভি সোচিয়ে'
পুস্তকের কভার পেজ

দীর্ঘদিনের অবিচল নিষ্ঠা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠিন সাধনার পর বোধ থেকে উৎসারিত, ইলহাম থেকে পাওয়া গ্রন্থই হচ্ছে ইলহামি গ্রন্থ। এগুলোও ঐশীগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এসব গ্রন্থ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আর্যদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাহিরি কিতাব বা প্রকাশ্য ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থ। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ ধরনের গ্রন্থ পেয়েও নিজেদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখবার ক্ষেত্রে ইহুদিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছে।

ইলহামি ও জাহিরি কিতাবগুলোর মধ্যে ৬১০ ঈসায়ী সনে এক মৌলিক বিপ্লব সূচিত হয়। ওই সময় হযরত মুহম্মদ (স)-এর মাধ্যমে সমগ্রহ মানবজাতিকে দান করা হয় কুরআনের প্রত্যাদেশ। গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকা আরববিশ্বের এ জাহিরি গ্রন্থ বা কিতাবুম মুবিন—উম্মুল কিতাব ও পরিপূর্ণ আলোকরশ্মিরূপে নাযিল হয়েছে। আণবিক শক্তির আবির্ভাব যেভাবে বস্তুজগতে বিপ্লব সাধন করেছে, ঠিক সেভাবেই আল-কুরআনও তুলেছে সমগ্রবিশ্বে প্রচণ্ড আলোড়ন। ধীরে ধীরে আরবের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায় কুরআনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের চিন্তাজগতে এনেছে বিপ্লব। এর পর থেকেই সকল জ্ঞানী-গুণী-চিন্তাবিদ মানুষকেই সবকিছু আনুপুর্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়েছে; আর কুরআন সম্পর্কে কিছু না কিছু অভিমত প্রকাশ না করে তাঁরা পারেননি। চিন্তাজগতে আলোড়নের এ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে ভারতও বাদ থাকেনি।

এ যাবৎ আল-কুরআন সম্পর্কে বিভিন্নজনের যেসব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তা প্রধানত তিন প্রকারের :

প্রথমত: একশ্রেণীর লোক কুরআনকে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অবোধ্য, চিন্তার অগম্য ও কাঠখোট্টা এক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

দ্বিতীয়ত: যাঁরা ধর্মাবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তথাকথিত সাম্যতন্ত্রের প্রবক্তা তাঁরা বলেছেন, হ্যাঁ কুরআনও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতই একটি তথাকথিত ধর্মগ্রন্থমাত্র, এর বেশি কিছু নয়।

তৃতীয়ত: একশ্রেণীর লোক বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভিড়ে কুরআনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধর্মগ্রন্থরূপে চিহ্নিত করেছেন আর লা-শারিক আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া অতুলনীয় হিদায়াত বা পথ-নির্দেশরূপে একে গ্রহণ করেছেন। এঁরা এ গ্রন্থের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের সর্বস্ব কুরবানি করবার নিয়ত করেছেন।

ওপরে যে প্রথম শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অন্যতম। তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর লেখা 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে তিনি কুরআনকে মানব-রচিত গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এর সমালোচনা করেছেন। এপণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু আরবি ভাষা আদৌ জানেন না। কিন্তু তবুও তাঁর দেখাদেখি তাঁর অনুসারীরাও

কুরআনের বিরূপ সমালোচনায় মেতে উঠেছেন আর এভাবে এ শ্রেণীর লোক নিজেদের মনের ঝাল মিটিয়ে চলেছেন। আল-কুরআন সম্পর্কে সরস্বতী মহাশয়ের এ পুস্তক প্রকাশের কয়েক দশক পর চোপড়া নামক এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে এক মামলা ঠুকে দেন। তিনি এ মর্মে আদালতে অভিযোগ পেশ করেন যে, কুরআন একখানা প্রতিক্রিয়াশীল গ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। এ গ্রন্থ মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ায় আর মানুষকে মানবতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে পথভ্রষ্ট করে।

কাজেই এ গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হোক ইত্যাদি। এদিকে উত্তর প্রদেশের নাজিমাবাদের স্বামী বেদমুনি পরিব্রাজক লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত 'আর্যমিত্র' সাময়িকীতে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি কুরআনের অনুসারীদের এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করেন যে, যদি তাদের হিম্মত থাকে তবে তাঁরা যেন কুরআনকে 'ঐশী-গ্রন্থ' প্রমাণ করতে এগিয়ে আসেন।

এ চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি, আর 'খোলা চিঠি' নামে হিন্দি ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখেছি। স্বামীজীকে জানানো এবং কুরআনের অনুসারীদের কুরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়াই আমার প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পর্কে আলোকপাত করবার আগে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, কুরআন আসলে কোনও সাধারণ গ্রন্থ নয়। এ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য আসমানি দাওয়াত আর এতে দাওয়াতের পূর্ণতা বিধান করবার হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন মানবজাতির এক ঐতিহাসিক দলিল। আর শুধু অতীতের নয়, এতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যথাযথ রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মানবতা মানুষের জ্ঞানের সীমারেখায় প্রতিফলিত হতে চায়। কুরআন একটি সুস্পষ্ট পয়গাম। এ গ্রন্থ অনাগত প্রতিটি মুহূর্তের জন্যও এক বাস্তব বিষয়।

কুরআন পৃথিবীতে কোনও ধর্মগ্রন্থ, কোনও নবী-রাসূল, মুনি-ঋষি কিংবা জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি। কাজেই বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থ আর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও কুরআনকে সম্মান করা কর্তব্য। কেননা কুরআন যে এক অতুলনীয় পথনির্দেশ দিচ্ছে এটা তাঁরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

সত্যকে পাওয়া মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। সত্যের মুখোমুখি হলে মানুষের সমগ্রজীবনের ভিত নড়ে ওঠে আর আল্লাহর বান্দা হবার অনুভূতি জাগ্রত হলেই মানুষ সত্যের আলোয় হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। তবে হাঁ, কোনও সত্য

কিংবা কোনও বাস্তবতা স্বীকার করবার জন্য মন-মানসিকতা কলুষমুক্ত হওয়া দরকার। সংকীর্ণ মনও আচ্ছন্ন চিন্তার কোনও লোকের পক্ষেই সত্য এবং বাস্তবতা স্বীকার করা সম্ভব নয়।

মন যদি কলুষমুক্ত না হয় তাহলে মানুষ দূরে থেকে সত্যের দিকে উঁকি দিতে পারে, কাছে যেতে সাহস করে না; আর সবসময় সন্দেহবাতিকে ভোগে। সময় আপন নিয়মে এগিয়ে চলে; সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় সেই মানুষটিও। কিন্তু সত্য পড়ে থাকে পেছনে। সন্দেহের বাতিক সেই মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করে রাখে। এভাবেই একদিন সেই মানুষটি ধ্বংস হয়ে যায়। স্বামী বেদমুনিকে আমি আমার সহস্র আদাব জানাচ্ছি। কুরআন ঐশী-গ্রন্থ কেন এবং কিভাবে নয়, এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আপনি লাক্ষ্ণৌ এর 'আর্যমিত্র' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। আপনার প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য মুসলমান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'আর্যমিত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত সেসব চিঠিতে মুসলমানদের সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে অনেকেই অশালীন ভাষায় আপনাকে আক্রমণ পর্যন্ত করেছেন।

আপনি সেসব চিঠিপত্রের জবাবও দিয়েছেন। জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুসলমানেরা যেসব চিঠি দিয়েছেন তার অনেকগুলোতেই অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এসব অশালীন ভাষা নিশ্চয়ই কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের জীবনবিধানেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।"

আপনার এ বক্তব্যের জবাবে আমি বলতে চাই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর তাঁর সাহাবা-ই-কিরামই কেবলমাত্র কথা ও কাজে ইসলামের স্বরূপ তথা শিক্ষা ও আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী।

আপনি লিখেছেন, "আমার বিরুদ্ধে লেখা চিঠিপত্রে অনেক কিছু বলা হলেও 'শূকর' এবং 'শূকরের বাচ্চা' বলা হয়নি। কারণ মুসলমানেরা জানে, এ সম্বোধন কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশেষ নিদর্শন। উল্লিখিত সম্বোধন তাই মুসলমানদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।"

মাফ করবেন স্বামীজী, পবিত্র কুরআন বা ইসলামী সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের কোনও নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়নি যা কোনও মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

আপনার প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ামূলক বিষয়ের জবাব দিতে গিয়ে আপনি নিজেকে 'নালায়েক' বলে তথাকথিত বিনয় প্রকাশ করলেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রীতিমত বিষোদগার করেছেন।

আপনি লিখেছেন 'মুহাম্মদ কেবল আরবের অলস ও মুর্খদের প্রভাবিত করেছেন। তার কাছে ডাকাত ও লুটেরাদের সমাবেশ ঘটেছিল। পত্রলেখকদের 'মুর্খ' ও 'নির্বোধ' আখ্যা দিয়ে আপনি আরও লিখেছেন, "এসব মুর্খ ও নির্বোধ পত্রলেখক সংকীর্ণ চিন্তার লোকদের লেখা বই-পুস্তকই শুধু পড়েছে। ওরা ইতিহাস-বিশারদদের কাছে বসা তো দূরের কথা, তাদের জুতো পরিষ্কার করবারও যোগ্যতা রাখেনা। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গাজী হবার স্বপ্ন দেখছেন" ইত্যাদি। এভাবে আপনি পত্রলেখকদের অশিক্ষিত, নির্বোধ অহংকারী, দেশের শত্রু ইত্যাদি অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

কুরআনকে আসমানি কিতাব প্রমাণ না করা সংক্রান্ত আপনার প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় আপনি ক্ষেপে গিয়ে যেসব জবাব 'আর্যমিত্র' পত্রিকায় ১৯৮৬ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন, যদি আমরা সেগুলোকে বেদের শিক্ষা বলে অভিহিত করি তবে কি ভুল হবে?

আঁচড় ভরা আপন আঁচল
আগে দেখে নিও :
পরের নামে অপবাদ
ভেবেচিন্তে দিও।

কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ প্রমাণ করবার চ্যালেঞ্জ যুগে যুগে ইসলামের অনুসারীরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মুসলমানরা এধরনের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে প্রস্তুত। মুসলমানদের জন্য এ ধরনের চ্যালেঞ্জ কোনও নতুন নয়।

বিগত শতাব্দসমূহের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহাগ্রন্থ কুরআন সম্পর্কে অতীতে যখনই বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, তার জবাবও যথাযথভাবে দেয়া হয়েছে। ভবিষাতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

সহিষ্ণুতার শিক্ষা মোরা
দিয়েই এসেছি,
অশেষ দুঃখ কষ্ট পেয়েও
আমরা হেসেছি।
সত্যফুলের বাগান করার
শপথ নিয়েছি।
আপন হাতে ভুলের বাগান
পুড়িয়ে দিয়েছি।

ফুলবাগানের ভুল প্রহরী
সবাই চুপিসারে
বিছিয়ে দিল বাধার কাঁটা
রাতের অন্ধকারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ধরনের প্রশ্ন কুরআন সম্পর্কে অতীতেও উঠেছে আর আল্লাহতায়ালা ওহির মাধ্যমেই সেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। ইচ্ছে হলে আপনি কষ্ট করে সেসব দেখে নিতে পারেন।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, একথা নিরেট সত্য। সন্দেহের তুফান এ বিশ্বাসকে এতটুকুও টলাতে পারে না। মিথ্যার ঝড়ো হাওয়া যত তীব্রই হোক, সত্যের চেরাগ তা নেভাতে পারেনা। মিথ্যার যত ঝড়-ঝঞ্ঝাই আসুক না কেন, ওতে সত্যের কিছু আসে যায় না।

ফানুস সেতো বাতাস পেয়ে
ওড়ে কিছুক্ষণ;
আল্লাহ্‌র চেরাগ সত্য শিখা
জ্বলে চিরন্তন।

পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর বাণী সেটা প্রমাণ করবার জন্য কিছু যুক্তি আপনার সামনে তুলে ধরছি।

আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি এক অপরিবর্তনীয় দলিল হিসেবে হযরত জিবরাঈলের (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর নাযিল করেছেন। কুরআনের কোনও আয়াত নাযিল হবার পর প্রিয়নবী (স) সবাইকে তা তেলাওয়াত করে শোনাতেন, সাহাবারা সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতেন এবং ওহিলেখকরা সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে ফেলতেন। পৃথিবীতে ধর্মবিষয়ক যত গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র কুরআনই প্রথমবারের মতো ঘোষণা করছে যে, "এ গ্রন্থ যা আল্লাহর বাণী, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং এটি পরহেজগারদের সুপথ প্রদর্শক।" —সূরা বাকারা

সূরা বাকারার তেইশ ও চব্বিশতম আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন, "এবং তোমরা যদি সন্দিহান হও আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করো এবং একাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের দলের লোকদের আহবান জানাও, যদি তোমরা যা বলছো তা সত্য হয়। যদি না করতে পারো আর কখনই তা পারবে না; তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর; সেই আগুন কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।"

এক. এই একটিমাত্র দাবিই শুধু নয় বরং কুরআনের প্রতিটি দাবিই বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে নিজের স্থানে অটল আর বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত।

দুই. কুরআন এমন সময় এ পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে যখন মানুষের জন্য ইতিহাসের বিবর্তনধারার সকল দ্বার খুলে গেছে। এ যাবৎ অবতীর্ণ ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন হচ্ছে সকল ধর্মগ্রন্থের শিরোমণি। সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের একমাত্র মাধ্যম।

তিন. মানুষের জন্য কুরআন ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষা এবং চিন্তা-চেতনার উৎসধারা। এতে সকল মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মৌলিক সমস্যার অনুসরণযোগ্য সমাধান বিদ্যমান।

চার. কুরআন মানবজাতির জন্য দর্শন, বিজ্ঞান আর তর্কশাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ তাফসির। এর মাধ্যমে মানবজাতির সকল সুপ্তযোগ্যতা ও সম্ভাবনা জাগ্রত করা হয়েছে আর মানুষকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছে।

পাঁচ. কুরআন আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে তাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সকল অপূর্ণতা দূর করেছে আর আখিরাতের অবিনশ্বর জীবনধারার সঙ্গে পার্থিব জীবনধারার সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে।

ছয়. কুরআন ঈমান ও আমলের সুস্পষ্ট ও সুমহান আধ্যাত্মিক দলিল। এ গ্রন্থ সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। এ গ্রন্থ যেকোনও লোকের মন-মগজকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে।

সাত. মানুষের বিবেক-বুদ্ধির জন্য কুরআন শুধু এক জ্ঞানের আধারই নয় বরং এর মধ্যে রয়েছে অভাবনীয় স্বাদ; যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শ্রুতিমধুর। এ গ্রন্থ মানুষকে শুধু মানসিক খোরাকই দেয়না বরং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার চেতনাকেও করে জাগ্রত।

আট. কুরআন কেবল একখানি ধর্মগ্রন্থ নয় বরং তা ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ এক বিস্ময়কর নিয়ামত।

নয়. সভ্যজগতের কোনও দেশে এমন কোনও আইন নেই যা কুরআনের আদর্শে প্রভাবিত হয়নি। এ জন্য কুরআনের কাছে মানবজাতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

দশ. কুরআনের ৩০ পারায়, ১১৪টি সুরায় ৬ হাজার ২৩১টি (মতান্তরে ৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি) আয়াতের ১ লাখ ৭৭ হাজার ১৩৪টি শব্দের ৩ লাখ ২৩ হাজার ৬২১টি বর্ণের জের জবর পেশ-এর প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ রেখে কণ্ঠস্থ করেন আর মনেপ্রাণে ভালোবাসেন এমন মানুষ আজও অগণিত। এটা কুরআনের এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। এ বাণীর হিফাজতের সকল দায়িত্ব আল্লাহ

রাব্বুল আলামিন নিজের ওপর রেখেছেন। এর মাধ্যমে মুসলমানদের জীবন-বিধান চিরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

এগারো. কুরআনই বিশ্বে একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত; সর্বাধিক শ্রুত ও সর্বাধিক মুখস্থ হয়ে আসছে আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মানবমনের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিশ্বের অসংখ্য ভাষার কুরআন প্রকাশিত হয়েছে।

বার. কুরআন আল্লাহর বাণী আর তার সত্তা চতুর্দিকে আবর্তিত। এর প্রধান প্রধান শিক্ষা নিম্নরূপ :

(ক) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের প্রেরণায় ইবাদত করা।

(খ) আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুল কিতাব ফিরিশতা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(গ) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কর্মজীবনের রীতি-নীতির সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ আর তাঁর জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে জীবনযাপন।

(ঘ) পিতামাতা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বাজন ও অন্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা।

(ঙ) অশালীনতা ও বেহারাপনা প্রকাশ পায় এমন সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

(চ) এতিম ও অসহায় লোকদের সেবা ও সাহায্য করা।

(ছ) ঈমানদারি ও ইনসাফের সঙ্গে ওজন করা। সকল অবস্থায় সত্য ও সুবিচারের ওপর অটল থাকা আর সকল অবস্থায় অঙ্গীকার পালন করা।

তের. কুরআন মজিদই একমাত্র গ্রন্থ যা জায়েজ-নাজায়েজের মধ্যে, ইনসাফ-বেইনসাফির মধ্যে, হালাল-হারামের মধ্যে, ঈমান ও কুফরির মধ্যে, হক ও না-হকের মধ্যে, আলো-আঁধারের মধ্যে এবং নেকি ও বদি তথা পাপ-পুণ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছে।

চৌদ্দ. এ বিশ্বজাহান নিসর্গ প্রকৃতি মানুষের জন্য এক নীরব নির্বাক পথ-প্রদর্শন আর কুরআন হচ্ছে এক সবাক পথপ্রদর্শণ।

পনের. বেহেশত-দোজখের চিরস্থায়ী জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা যেখানে যেখানে রয়েছে, সেসব জায়গা হচ্ছে কুরআনের সবচাইতে আকর্ষণীয় অংশ। আল্লাহর পক্ষ থেকে এগ্রন্থ মানুষের প্রতি সর্বশেষ হুঁশিয়ারি।

ষোল. মানুষের দৈহিক, আত্মিক, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহে পূর্ণতা-বিধানের জন্য কুরআন হচ্ছে মানুষের ইতিহাসে প্রথম আলোর পরশ।

সতের. কুরআনুল কারিম মানুষকে ঈমানের সেই বাস্তবতার দাওয়াত দেয়, যা মানুষের মনের মাধ্যমে মরমে পৌঁছে এবং তার কর্মতৎপরতা ও প্রাণস্পন্দনে পরিণত হয়।

আঠার. কুরআন হচ্ছে কুদরতের এক বিস্ময়কর মুজিষা। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ-নির্দেশ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিপূর্ণ রূপায়ণ। তাঁকে নবুয়াত দেয়া হয়েছে। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর এমন হিকমত যার মাধ্যমে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার দুরত্ব ঘুচিয়ে দেয়া হয়েছে।

উনিশ. কুরআন মানুষকে অবাস্তব ও কাল্পনিক কোনও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে না বরং এমন একটি সহজলভ্য কর্মজীবনের পথনির্দেশ দেয় যা ছোটবড় ধনী-গরিব-শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলে সহজে বুঝতে পারে। এ কারণেই অসংখ্য লোক কুরআনের এ জীবন্ত পয়গাম প্রবল আগ্রহে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন। এ গ্রন্থের দুর্বার শক্তি, অজেয় প্রভাব, অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা, অতুলনীয় শব্দসম্ভার এখনও মুসলমান আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনে দেদীপ্যমান।

কুড়ি. কুরআন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় আলো ও হিদায়াত দিয়ে মানবজাতিকে বিশৃঙ্খল হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। মানবসমাজকে এ মহান গ্রন্থ দান করেছে, সাম্যের মহিমা ও তাদের কর্মজীবনকে দিয়েছে এক অতুলনীয় দিক-নির্দেশনা। মানবসমাজকে জাতিবর্ণ, গোত্র, ভাষা, জাতীয়তা ইত্যাদির উর্ধ্বে তুলে ধরে মানুষকে ঐক্য ও সংহতির আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। মানুষের ব্যবহৃত কোনও ভাষা দিয়ে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায় পৃথিবীর প্রতি ছয়জন মানুষের মধ্যে একজন কুরআনের অনুসারী। তিনি আর্য হতে পারেন, রুশ হতে পারেন, পারেন এ্যাংলো-সেকসন হতে। বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম অন্য কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না।

একুশ. সিয়েরা লিওন থেকে ক্যাস্টন আর তুবালেস্ক থেকে কেপাটাউন পর্যন্ত দিনরাত ২৪ ঘন্টায় অগণিত মসজিদ থেকে 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসায় কোটি কোটি মানুষ নামাযে দাঁড়ায়। কুরআন যে ঐশী গ্রন্থ এটা তারই অন্যতম প্রমাণ।

বাইশ. এ বিশ্বে অসংখ্য সভ্যতা বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু কুরআন মানুষের জীবনের গভীরে যে সভ্যতার বীজ বপন করেছে, তার বুনিয়াদ নির্লোভ ঈমান ও আমলের মজবুত মাটিতে প্রোথিত। মুসলমানদের বিজয়ের শক্তি তাদের সামাজিক ঐক্য। অস্ত্রের শক্তিতে নয় বরং আত্মিক শক্তিতে বলিয়ান

হয়েই মুসলমানরা অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। এর উৎস ও প্রেরণা হচ্ছে কুরআন মজিদ ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র জীবন।

তেইশ. গদ্য হয়েও কুরআন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যের চাইতে উন্নত ও সুন্দর। এ গ্রন্থের ভাষা-মাধুর্য, ভাব-সম্পদ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা মানবমনকে মুহূর্তে মোহিত করে; বর্ণনাভঙ্গি, ভাব-চেতনা করে অভিভূত। এ ধরনের অতুলনীয় বাণী মানুষতো দূরের কথা ফিরিশতাদের সম্মিলিত চেষ্টায়ও সম্ভব নয়। এ বাণী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের; এবং আজ পর্যন্ত কোনও ধর্মগ্রন্থ এর সমতুল্য হতে পারেনি।

চব্বিশ. জ্ঞানচক্ষু যাঁদের খোলা তাঁরা এ গ্রন্থের আস্বাদ পেয়ে কখনও নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। পক্ষান্তরে সন্দেহের কুয়াশায় নিমজ্জিত অন্ধব্যক্তি এ পবিত্র গ্রন্থের আলো পেয়েও সামনে এগুতে অক্ষম।

পঁচিশ. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব ও কুরআন নাযিলের আগে ইবাদতের কিছু রীতি প্রচলিত থাকলেও মানুষ আল্লাহর রহমতের ধারা থেকে বঞ্চিত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাহমাতুললিল আলামিনের মাধ্যমে সে অভাব পূর্ণ করে দিয়েছেন।

ছাব্বিশ. মানবমনে প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিজয় হিসেবে চিহ্নিত। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সেই বিজয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও পবিত্র কুরআনের বিজয়। সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ, সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন শ্রেষ্ঠ, সকল নবী রাসূলের মধ্যে, সকল মুণিঋষির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) শ্রেষ্ঠ। সকল উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠ। সকল কালের মধ্যে মুহাম্মদ (স)-এর জীবনকাল শ্রেষ্ঠ।

আমরা কবিতা লিখি বলে দাও
মীর আর গালিবদের
সেই শতাব্দ ছিল তোমাদের
এই শতাব্দ আমাদের।

পবিত্র কুরআনকে আসমানি কিতাব প্রমাণের জন্য আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। কুরআনের মত অসাধারণ গ্রন্থের অতুলনীয় গভীরতা অনুধাবন করবার জন্য হাদিসে নববী বোঝা দরকার। কুরআন যা বলেছে, তার বাস্তব রূপায়ণ আছে হাদিসেই।

স্বামীজী আপনি কি কষ্ট করে এ চিঠির জওয়াব দিতে পারবেন?

ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের পটভূমি

ভুপালের 'নবভারত সমাচার সেবা' পত্রিকায় ১৯৮৬ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ থেকে পাওয়া একটি খবর ছাপা হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল 'ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটছে। দিন দিন লোক মুসলমান হচ্ছে'।

খবরে বলা হয়, হিন্দু সংগঠনগুলোর দুর্বলতা ও প্রশাসনের শৈথিল্যের কারণে তামিলনাড়ুর কোনও কোনও স্থানে ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের ধারা আবার চালূ হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে যাওয়ার এ প্রবণতা রাজ্য সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্যের কয়েকটি জেলার আধিকারিকরা রাজ্য সরকারকে এ অভিযোগ জানিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে : গ্রামের হরিজনরা দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ বলে জানা গেছে। রামনাথপুরম জেলা ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সবচাইতে এগিয়ে গেছে। এজেলাবাসীদের দুর্ভাগ্য যে, এখানে যেসব ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলো বছরে মাত্র একবারই হয় আর এ গ্রামবাসীরা বহু বছর যাবৎ খাওয়ার পানির সংকটে ভুগছে।

জানা গেছে, সেখানে থিউর উপজাতির লোকদের সঙ্গে হরিজনদের সংঘাত চলে আসছে আর হরিজনেরা ঐ উপজাতির লোকদের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে উৎপীড়িত হচ্ছে। থিউর উপজাতির লোকেরাও কম ভাগ্যবিড়ম্বিত নয়।

সরকার এ মর্মে খবর পেয়েছে যে, এ জেলায় গ্রামের কৃষকদের অবস্থা এমন সীমায় পৌঁছেছে যে, এখানে হরিজনদের জীবনযাত্রা প্রায় মুসলমানদের অনুরূপ। এসব এলাকার লোকদের কাছে উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে দান আসছে।

সরকার এ ব্যাপারে চিন্তিত। সরকারি মহল এসম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান চালাচ্ছে। গুপ্তচর সংস্থাসমূহ এমর্মেও খবর সংগ্রহ করেছে যে, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ এ-এলাকার জনগণের জন্য টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন আরবদেশে অনেককে চাকুরি দেয়া হচ্ছে। ধর্মপরিবর্তনের সূচনা হয়েছে

এসব থেকেই। এখানে যারা হরিজনদের ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হবার জন্য প্রভাবিত করছে, তাদের অনেকে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে চাকরি পেয়েছে।

স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ উদ্বেগের সঙ্গে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে, সরকার যেন উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে আসা অর্থ সাহায্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এতে ধর্মান্তরিত হবার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে তারা উল্লেখ করেছে।

এমনও শোনা গেছে, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সংগঠনগুলো রামনাথপুরমে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। শিগগিরই দক্ষিণ ভারতে এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও অশংকা প্রকাশ করা হয়। সংবাদে আরও বলা হয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দিল্লি গিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে তাদের উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

ধর্মবিশ্বাসের পবিরর্তন ও কয়েকটি প্রশ্ন

ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের খবরে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসিরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। খবরটা জ্বলে ওঠার মতই। কেননা অমুসলিম এলাকায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত ছোটবড় মানুষ পাইকারি হারে মুসলমান হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবার মত খবর। মানুষ যা খুশি হোক কিন্তু মুসলমান যেন না হয়। সংখ্যগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে এখবর বরদাশত করবার মত নয়। একারণে হিন্দুসংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলনের প্রস্তুতিগ্রহণ করছে। করাটাই স্বাভাবিক। ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন মুলত একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তবু এ বিষয়ে কিছু পর্যালোচনা আশা করি অসমীচীন হবে না।

আন্দোলন হবে কেন?

ভারত আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতের আদর্শ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেরণার সঙ্গে ভারতীয় জনগণকে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে আর সুস্থভাবে বাঁচতে হবে। স্বাধীনতার পর ভারতবাসিদের জীবনযাত্রায় উন্নয়ন যতটা আশা করা হয়েছিল, ততটা হয়নি। সরকারগুলোর ভেল্কিবাজির কারণে জনগণের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে অন্তহীন সমস্যা। বহু শতব্দের পরাধীনতার পর আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তার ৪০ বছরেও আমরা সর্বস্তরের জনগণের জীবনে উন্নত শিক্ষা ও উন্নত

নাগরিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারিনি। ফলে এমন বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে-সবের সমাধান সম্ভব নয়।

এখানেই প্রশ্ন, উন্নত শিক্ষা ও উন্নত নাগরিক চেতনার অভাব সত্ত্বেও ভারতের কোনও সংগঠন বা পার্টি কি গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম যদি আসমানি ধর্ম হয়ে থাকে, তবে সেধর্ম কি করে পরিবর্তিত হতে পারে? প্রকৃতির পরিবর্তন কি সম্ভব? ধর্ম যদি পরিবর্তিত হয়, তবে সেটা কি করে আসমানি ধর্ম হলো? আর যদি আসমানি না হয় তবে সেটা কিসের ধর্ম? আর যদি সেটা ধর্মই না হয়ে থাকে তার জন্য এত জিহাদি তোড়জোর কেন?

ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সেকুলারিজামের প্রবক্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস এই যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের ফলে তাঁরা এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন?

কেন এই প্রতিহিংসার মনোভাব?

দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য কোনও ব্যক্তি বা জনসমষ্টি যদি ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চায় তবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নৈতিক কিংবা আইনের দিক থেকে কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। যদি কোনও ব্যক্তি বা জনসমষ্টি বিশেষ কারণে মুসলমান হয়ে যায় তবে কি গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও ক্ষতির আশংকা থাকে? পক্ষান্তরে হিন্দু নয় এমন কেউ যদি হিন্দু হতে চায় তাহলেই কি গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সম্ভাবনাগুলো উজ্জ্বল আর মজবুত হবে?

ভারত আধুনিক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দেশ। অথচ এদেশে এমন আইন প্রচলিত রয়েছে যে, কোনও অমুসলমানকে ইসলামগ্রহণ করবার জন্য সরকারের কাছে ডিক্লারেশন পেশ করতে হবে। কিন্তু কেন? ১৯৮৬ সনে প্রণীত আইনের ৩৭ ধারার ৫ নং উপধারায় এ বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা কি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী নয়? আর্যসমাজের মত কট্টর সাম্প্রদায়িক সংগঠনও যেকোনও অহিন্দুকে শুদ্ধি-সংস্কারের মাধ্যমে সহজেই হিন্দু বানিয়ে সার্টিফিকেট দিতে পারে।

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার মসজিদগুলোকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন? একদিকে ভারতীয় আইনের আদর্শ দেখে মনে হয়, স্বাধীন ভারতের

প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনও নাগরিক ধর্মবিশ্বাস, আনুগত্য, উপাসনা এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু অন্যদিকে মুসলমানদের বেলায় বাস্তবে তার ব্যতিক্রম ঘটানো হচ্ছে, এর জবাব কোথায়?

ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সঙ্গতভাবেই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে আশা করে যে, তারা ভারতীয় আইনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। সুতরাং সেই আইনের প্রতি পুরোপুরি অনুগত থেকেই বিশেষত ভারতীয় আইনের আদর্শ অনুযায়ী ধর্ম-বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি কেউ প্রয়োগ করে তবে তার বিরুদ্ধে এতটা মারমুখো হবার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো আশা করে যে, শুধু তারাই নয়, সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও তাদের মতই দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে ভারতীয় আইনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলবে। বর্তমান ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তখনই সন্দেহ দেখা দেয়, যখন দেখা যায় যে, ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের মতো ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য সরকার গোয়েন্দাবাহিনী নিয়োগ করে। এ ধরনের তৎপরতার আসল উদ্দেশ্য কি, সে প্রশ্ন করবার অনুমতি কি পাওয়া যাবে?

মানুষের জীবন সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক বিস্ময়কর পুরস্কার। এ জীবনে হৃদস্পন্দনের ওপর সরকার কেন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায়? সরকারের দেখা উচিত ধ্বংসাত্মক কোনও কাজ, অসামাজিক কোনও তৎপরতা এবং বিদ্রোহাত্মক কোনও চক্রান্ত চলছে কিনা। সে ধরনের কোনও কাজ যেন হতে না পারে সে চেষ্টাই তাদের করা উচিত। দেশের আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজেদের আত্মিক ও চারিত্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করা দেশের সকল নাগরিকের কর্তব্য।

বিশ্বাস পরিবর্তন করা বা এক পথ ছেড়ে নিজের রুচিসম্মত কোনও ভালো পথের পথিক হওয়া অপরাধ, বিদ্রোহ বা অসামাজিক কোনও কাজ তো নয়ই, কেবলমাত্র মনোজগতের সঙ্গেই এর সম্পর্ক সংগ্রথিত। এটা এমন এক ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের পার্থিব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরকালও সুন্দর করতে পারে। সরকার কেন যে এক্ষেত্রে হৈ চৈ শুরু করছে সেটা বুঝতে পারিনা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সরকার কি মানুষের মনোজগতেও পাহারা বসাতে চায়?

গণতন্ত্রের বুনিয়াদ ধসে পড়বে

যদি এদেশের সব অমুসলমানই মুসলমান হয়ে যায় তবুও তাতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের ক্ষতিটা কোথায়? পক্ষান্তরে যদি সকল অহিন্দু হিন্দু হয়ে যায় তাতেইবা তাদের কি লাভ? ধর্ম নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষতাটাই তো এখানে মূল আদর্শ। তাহলে? মনে রাখতে হবে ভারতে গণতন্ত্রের টিকে থাকবার ব্যাপারটা সরকার গঠন, সরকার পরিবর্তন কিংবা জনগণের হিন্দু, মুসলিম, শিখ খৃস্টান বা হরিজন হবার ওপর নির্ভর করে না।

যদি কেউ তা মনে করেন, তবে সে মানসিকতা গণতন্ত্রের টিকে থাকবার জন্য সুস্থতার লক্ষণ নয়। যদি তা কখনও হয় অর্থাৎ বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই গণতন্ত্রের মূল কথা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতের গণতন্ত্র পৃথক পৃথক পকেটরূপে বিভক্ত হবে আর একদিন তা ধসে পড়বে।

উপকারের নাম কি দুস্কর্ম?

বহু শতাব্দ যাবৎ যারা ছিল গরিব, নিস্পেষিত ও অবহেলিত, স্বাধীনতার পরও তাদের সেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এসব গরিব লোক যদি কোনওভাবে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন সাধনের জন্য অর্থাৎ ভাগ্যোন্নয়নে তৎপর হয়, তাহলে সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর লোকজন শুরু করে হৈ চৈ। কিন্তু ওই সব হতভাগ্য যখন ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যার তখন তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। হরিজন আর আদিবাসিরা আজ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, সরকার ও সমাজ তাদের সোজাভাবে নাক স্পর্শ করতে দেবেনা, তাই তারা হাত ঘুরিয়ে নাক স্পর্শ করতে চাচ্ছে। দুরবস্থা-কবলিত এসব অসহায় মানুষের সাহায্যে যারা এগিয়ে এসেছে, বিভিন্ন সংবাদপত্র তাদের দুস্কৃতিকারী বলে অভিহিত করছে। অদ্ভুত নিয়ম।

কোনও অসহায়কে সাহায্য করবার নাম কি দুষ্কর্ম। নাকি পরের উপকারের নাম গুণ্ডামি? যারা সাহায্য করেছে তাদের বরং প্রশংসা করাই উচিৎ ছিল। এতে আর কিছু না হোক, দেশের দায়িত্বশীল লোকেরা শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হতো।

এদেশের মাটির প্রকৃতিই এমন যে, উপকারের নামকরণ করা হয় দুষ্কর্ম। মনে হয়, এদেশের মানুষের বুদ্ধি-বিবেকে পক্ষপাতিত্বের ছাপ প্রকট। শক্তি প্রয়োগ আর স্বার্থ-চিন্তার দাপট এত বেশি যে, এখানে ভালো কাজের কোনও স্থান নেই। এ কারণে পাপ ও অপরাধ এদেশের আনাচে-কানাচে নগ্ন হয়ে নৃত্য করে।

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সাহায্যকে দুষ্কর্ম বলা হয় তবে নির্যাতন ও নিষ্পেষণে যারা এসব মানুষকে লাশ বানিয়ে সবসময় লুকিয়ে রাখতে চায়, তাদের কাজকে কি বলে আখ্যায়িত করা যাবে?

বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবার মত। মানবমনের সুপ্ত কোমল অনুভূতি দলিত-মথিত করা সম্ভব নয়।

খারাপ কাজে সুনাম কেউ
চাইলে মনে প্রাণে,
মগজ ধোলাই করতে হবে
সেতো সবাই জানে।

দেশবাসির অবগতির জন্য আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে, মুসলমানরা নিজের সার্মথ্য অনুযায়ী কারও সাহায্য-সহায়তা করতে পারে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় কোনও অমুসলমানকে মুসলমান বানিয়ে দেবে, এটা মনে করা তাদের জন্য শিরক বা কুফর।

এ পৃথিবীতে বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের বিভক্তির উর্ধ্বে উঠে মানুষের সেবা ও কল্যাণচেষ্টাই হচ্ছে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক তাকিদ। এটা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য।

কিন্তু হিদায়াতের সেই আলো, যা পেয়ে কোনও অমুসলমান মুসলমান হয়ে যায় সেটা একমাত্র আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষের অন্তকরণে প্রবেশ করে।

এমতাবস্থায় নাজুক ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আন্দোলনের কর্মসূচিগ্রহণ করে অহেতুক আগুন জ্বালিয়ে সে আগুন নিজেদের স্বার্থপরতার রুটি না সেঁকবার পরামর্শ দেয়া কি অসমীচীন হবে?

হিন্দুমতবাদের অনুসারীরা অন্য মানুষদের ম্লেচ্ছ মনে না করলেই ভালো করবেন। বরং অন্য মানুষদেরও নিজেদের মত পবিত্র মনে করে অন্ন ও কন্যাদান করে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করাই তাদের উচিত হবে। কিন্তু সেই সৎসাহস কি তাঁরা দেখতে পারবেন?

হ্যাঁ, এটা কেবল তখনই তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব হবে যখন 'হিন্দুমতবাদ' তাঁদের এ ধরনের কাজে অনুমতি দেবে। তার আগে নয়।

চতুর্থ অধ্যায়
ভগবান যখন মুসলমান

[ভারতের শীর্ষস্থানীয় হিন্দুধর্মগুরু ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ ধর্মাচার্য আদ্যশক্তি পীঠ-এর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে দিল্লি থেকে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক 'নয়ী দুনিয়া' ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ইং সংখ্যার রিপোর্ট]

অতিসম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত অনেকগুলো আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনাটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরুকে খোদ রসুলে আকরাম সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসল্লাম কর্তৃক স্বপ্নযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রদান আর সে দাওয়াতের দ্বারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধর্মগুরুর সপরিবার ইসলামগ্রহণ।

ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ ধর্মাচার্য আদ্যশক্তিপীঠ। মথুরার এক কুলীন আচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বৃন্দাবনের এক বিরাট আশ্রমের অধিপতি। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার যত্নে আশ্রমের পরিবেশে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে এম. এ. ডিগ্রি অর্জনের পর দীর্ঘ আটবছর লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্মমত সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা করে প্রথমে ডক্টর অব ডিভাইনিটি ও পরে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে পিএইচ.ডি. লাভ করেন।

ডক্টর শিবশক্তির অসাধারণ মেধা ও বিশ্লেষণী শক্তি লক্ষ্য করে খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ তাঁকে আকর্ষণীয় একটি বৃত্তি দিয়ে খৃস্টানধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল ইতালির ভ্যাটিকান সিটিতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে ভ্যাটিকানের নাগরিকত্বও প্রদান করা হয়। খৃস্টানধর্মে আকৃষ্ট করবার জন্য অনেক প্রলোভনও দেখানো হয়। কিন্তু ডক্টর শিবশক্তির ভাষায় "এক নিরাকার স্রষ্টার শরণ থেকে বিচ্যুত খৃস্টদর্শনের প্রতি পৌত্তলিক হিন্দুদের পক্ষে আকৃষ্ট হবার মত কিছু রয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, খৃস্টানদের ত্রিত্ব-বাদ হিন্দুদের বহু দেব-বাদের তুলনার আদৌ কোনও উৎকৃষ্ট মতাদর্শ নয়। তাই ধর্মের সপক্ষে কয়েকটি

বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে পোপ সেখানকার সর্বোচ্চ সম্মান 'ও এফ এম ক্যাপ' প্রদান করেও আমাকে ধরে রাখতে পারেনি।"

ভারতে ফিরে আসবার পর সর্বোচ্চ হিন্দুধর্মীয় বিদ্যাপীঠ কাওরা থেকে তাঁকে ধর্মাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হয় ও তিনি মথুরার অন্তর্গত বৃন্দাবন আশ্রমের প্রধান পরিচালকরূপে নিয়োগ লাভ করেন। এ ছাড়াও মুম্বাই ও দেবালেইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের আরও দুটো আশ্রমে প্রধান আচার্যরূপে তিনি দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। অন্তত বারটি ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর শিবশক্তি যেমন ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতৃপুরুষ, তেমন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল সমকালীন উচ্চমর্যাদার হিন্দুধর্মগুরু জগৎগুরু শঙ্কারাচার্য, রামগোপাল শালওয়াল, পুরির মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী, গুরু গোলয়ালকার, বাবাসাহেব দেশমুখ, বাল ঠাকুরে, অটল বিহারী বাজপেয়ী ও আচার্য বিনোবাভাবের সঙ্গে। সমকালীন হিন্দুধর্মীয় পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বান ও মেধাবী বলে স্বীকৃত ডক্টর শিবশক্তি ছিলেন সকলের স্নেহধন্য ও প্রীতিভাজন। তাঁর অপূর্ব মেধা ও কর্মশক্তি দেশের উচ্চ শিক্ষিতসমাজে ও পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের প্রচারে বিশেষ অবদান রাখবে বলে সবাই একান্ত আশা পোষণ করতেন।

ইসলামের প্রতি তিনি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন এ প্রশ্নের জবাবে ডক্টর শিবশক্তি বলেন, সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আত্মার জগত সম্পর্কে এ যুগের বস্তুবাদী মন-মানসের অধিকারীদের কোনও ধারণা নেই। তাদের পক্ষে এ ঘটনা হয়তো বিশ্বাস করাও সম্ভব নয়। অথচ এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা যে বাস্তবে ঘটেছে তার জীবন্ত সাক্ষী তো আমি নিজে। আমি ছিলাম এদেশের অর্ধশত কোটি হিন্দুর পরম ভক্তিভাজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরু। ওরা আমাকে 'ধর্মাচার্য ভগবান' বলে ডাকতো। অন্যদিকে এদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের অবস্থান কোথায় তা তো কারুর অজানা নেই। অবস্থানগত আকাশ ও পাতালের পার্থক্যটা বুঝবার মত মেধা কি আমার ছিলনা? কিন্তু তারপরও যে আমি কেন এবং কেমন করে 'ভাগবানের সোনার সিংহাসন' স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে কন্টকাকীর্ণ মাটির পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছি, সে রহস্যের পর্দা উন্মোচন করতে গিয়ে আমি আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়ি। বুঝি না কেমন করে ঘটলো এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করবার সময়েই আমি পবিত্র কুরআন পাঠের সুযোগ পাই। মূল উৎস থেকে ইসলাম

জানবার লক্ষ্যে আমি এর আগে আরবি ভাষা বেশ ভালোভাবে শিক্ষা করি। যেমন শিক্ষা করেছিলাম হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থাদি পাঠ করবার লক্ষ্যে সংস্কৃত। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার লক্ষ্যে পালি আর খৃস্টধর্মের গ্রন্থটি পাঠ করবার লক্ষ্যে প্রাচীন গ্রিকভাষা।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুরআন পাঠ করবার সময় থেকেই আমার মনোরাজ্যে প্রায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে যায়। যে বিদ্বেষবহ্নি অন্তরে নিয়ে পাঠ শুরু করেছিলাম তা যেন ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় বরং তদস্থলে আমার অলক্ষ্যে ভক্তিশ্রদ্ধার একটা ফল্গুধারা মনের গোপন কোণে বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু নিজের ধর্মমত সম্পর্কে আমার ভক্তি ও বিশ্বাসে তখন পর্যন্ত কোনও ফাটল সৃষ্টি হয়নি। বরং পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি নিয়েই আমি আমার কাজ করে যাচ্ছিলাম। সর্বক্ষণ প্রচুর বিত্ত আর ভক্তদল পরিবৃত হয়ে থাকতাম। বিশাল ভারতভূমিকে অখণ্ড রামরাজত্বে রূপান্তরিত করবার স্বপ্নে বিভোর হিন্দুনেতৃত্বের সঙ্গে আমার ভূমিকাও পেছনে পড়ে ছিলনা।

১৯৮৪ সনের জানুয়ারি মাস। একরাতে আমি আর আমার বিদূষী স্ত্রী পাশাপাশি কামরায় শায়িত। গভীর রাতে স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট একদল লোক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ভয়ে-ত্রাসে তখন আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আশেপাশে এমন কাউকেই দেখতে পেলাম না যে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারে। এমন সময় অদৃশ্য দুটি হাত যেন আমাকে তুলে দাঁড় করালো। চেয়ে দেখলাম এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষ আমার সামনে দাঁড়ানো। আমি অবাক বিস্ময়ে সেই আলো ঝলমল চেহারার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। মন থেকে সমস্ত ভয়-ত্রাস যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিহবল দৃষ্টি লক্ষ্য করে পাশেই দাঁড়ানো অন্য এক ব্যক্তি বললেন, তুমি এ ব্যক্তিকে চিনতে পারছো না? এ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আমার হৃদয় মনে ততক্ষণে এক অপূর্ব আবেগানুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। এমন সময় তিনি পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার ডান হাতখানি ধরলেন ও বললেন, 'কালেমা পড়'। একথা বলে তিনি কালেমা পাঠ করতে লাগলেন। আমিও তাঁর পবিত্র কণ্ঠ অনুসরণ করে কালেমা পাঠ করতে লাগলাম। কালেমা পড়া সমাপ্ত হবার পর তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন ও স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, "যাও, এবার গিয়ে

দেশবাসিকে কালেমা পড়াও।" আমার এ পবিত্র স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল বলতে পারবো না। তবে যখন চোখ খুললাম তখন রাত তিনটা। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, ঠিক একই সময় একই স্বপ্ন আমার স্ত্রীও দেখেছেন। দুজনে মিলে আমরা যখন একে অপরের কাছে আপন আপন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলাম, তখন আমাদের দুজনেরই মনের বীণায় অপূর্ব এক ঝঙ্কার বেজে উঠলো। আমরা নিজেদের প্রথম-যুগের মুসলমানরূপে কল্পনা করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো, এদেশে সাহাবীদের সেই সোনালি যুগ ফিরিয়ে আনবার সাধনাতেই আমাদের ব্রতী হতে হবে। তাছাড়া মনের মধ্যে এমন এক প্রত্যয় জন্মালো যে, খুব শিগগিরই সারা দুনিয়ায় একটা নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। আর সে বিপ্লবের একজন নগণ্য কর্মীরূপে কাজ করবার জন্য বোধ হয় মহান আল্লাহ আমাকেও কবুল করেছেন।

পরদিন থেকেই আমি ধর্মগুরু ভগবানের সুউচ্চ আসনচূড়া থেকে নেমে এসে মাটির মানুষের সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষরূপে গণ্য হবার জন্য সচেষ্ট হলাম। আমি, আমার স্ত্রী ও ছোটমেয়ে তখন পরিপূর্ণ মুসলমান। তবুও আমার ওপর তিন তিনটি আশ্রম ও সংগঠনের যেসব দায়-দায়িত্ব অর্পিত ছিল গুছিয়ে অন্যের হাতে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত প্রকাশ্যে মুসলমানরূপে পরিচিত হলাম না।

পরিশেষে সেই প্রতীক্ষার দিনটি এলো। ১৯৮৫ সনের রমযান মাসের চাঁদ উদিত হবার প্রাক্কালে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে অধিকতর পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আমি আলিম ও বুযুর্গদের শহর ভুপালে চলে এলাম। এখানে ১০ মে তারিখে অর্থাৎ যেদিন রমযানের চাঁদ দেখা দিল সে দিনই প্রকাশ্যে ইসলামের কালেমা পড়ে নিলাম।

বহু পুরাতন বন্ধু আমার কাছে পত্র লেখেন। কেন আমি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুরুর মর্যাদা ছেড়ে মুসলমান হলাম, তাঁদের ভাষায় নিজেকে বিপদের মধ্যে এনে ফেললাম, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি তাঁদের সেসব সহানুভূতিপূর্ণ পত্রের জবাব দেই। বলি : আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতাম না, জানতাম না। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে তাঁর পিয়ারা হাবিব (স)-এর মারফত আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। তাঁর পরিচয় লাভ করবার সুযোগ দিয়েছেন। এ অপূর্ব অনুগ্রহের শুকুর করে আমি বাকি সারাজীবনেও শেষ করতে পারবো না। কোনও কোনও সময় মনে হয়, আমিই এদেশের সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। শুধু ঈমানের দৌলত লাভ করে আমি যে আত্মিক তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করেছি, সাত আসমানের বাদশাহী পেয়েও বোধ হয় এত সুখ, এত তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হতো না।

ড. ইসলাম-উল-হক ভারতীয় মুসলমানদের ঘোর সংকটময় এক দুর্দিনে স্বদেশের আগ্রাসী হিন্দুসমাজের মর্যাদাপূর্ণ ধর্মগুরুর পদ ছেড়ে মজলুম মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, ছিলাম ভগবান, এখন মানুষ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তিনি এখন কেবলমাত্র একজন সাধারণ সরলসোজা মুসলমানই নন, তাঁর নিজের ভাষায় : সেই প্রাথমিক যুগের সোনালি দিনগুলো ফিরিয়ে আনবার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ প্রচারকর্মীর ভূমিকায়ও তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের ইসলাম কবুল সম্পর্কে ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দীন আল্লামা আবুল হাসান নদভীর মন্তব্য হচ্ছে, "ডক্টর ইসলাম-উল-হক এ যুগের ভারতীয় মুসলমানদের জন্য-রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে একটি তোহফা বিশেষ।" দারুল উলুম দেওবন্দের মন্তব্য হচ্ছে, "দেবালয় থেকে বের হয়ে এসেছে পবিত্র কাবার প্রহরী।"

ড. ইসলামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মুসলিম উন্মাহর জন্য আপনার কোনও পয়গাম থাকলে বলুন।"

তিনি বলেন, "এ প্রশ্নের উত্তরে আমি ইঞ্জিল থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই। তা হচ্ছে, একদিন সকাল-বেলায় হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছায় গ্যালিলি হ্রদের পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ বিস্ময়কর দৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁর অনুচররা আবদার জানালেন, 'হুজুর! আমরাও কি এমনি করে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবো?' তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, হাঁ, পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে– কেবলমাত্র আমার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। দৃষ্টি একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই তোমরা ডুবে যাবে।"

অনুচররা তাই করলেন অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পানির ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু দূর এভাবে যাবার পর তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তারা ভাবতে লাগলো, আমরা কি সত্যিই পানির ওপর হেঁটে যাচ্ছি–না মাটির ওপর দিয়ে। এরূপ সন্দেহ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারা যেই মাত্র তাদের দৃষ্টি তাদের পায়ের কাছে নিয়েছে অমনি চোখের পলকে তারা হ্রদের অথৈ পানিতে ডুবে গেল।

মুসলিম জাহানের প্রতি আমাদের আবেদন : এ সংসার-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য আল্লাহর আখেরি রসূল (স)-ও আমাদের জন্য এ নির্দেশটি রেখে গেছেন

যে, একমাত্র তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন লক্ষ্য করেই আমাদের সবাইকে অগ্রসর হতে হবে। দৃষ্টি যদি সেখান থেকে একটু এদিক-সেদিক হয়ে যায় তবে আমাদেরও দুনিয়ার অথৈ সাগরে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তাই বলি, এখনও সময় আছে। যদি আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেখানো পথে দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ করতে পারি, একমনে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই অগ্রসর হবার সংকল্পে অটল থাকি, তবে সাফল্য সুনিশ্চিত। মুসলমানের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রসূল (স) ইরশাদ করেছেন : "মুসলমান খাঁটি সোনার সেই টুকরাটির মত যেটিকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হয়েছে। তারপর এর ভেতর যেমন ময়লার অস্তিত্ব থাকতে পারে না বা কোথায়ও ফেলে রাখলে ময়লা আবর্জনা তার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট করতে পারেনা, তেমনি খাঁটি ঈমানদার লোক যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তার ঔজ্জ্বল্য অন্য কোনও কিছুর সংস্পর্শেই ম্লান হতে পারে না।"

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : "মুসলমান মৌমাছির মত। সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত পবিত্র ফুলের ওপর বসে মধু আহরণ করে। কোনও নোংরা অপবিত্র বস্তুর ওপর সে সাধারণত বসেনা। সংগৃহীত মধু সে নিজেও যেমন খায় তেমনি তদ্বারা অন্যকেও তৃপ্ত করে।"

"মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের সেই সোনালি দিনগুলো ফিরিয়ে আনবার যে বাসনা আপনি পোষণ করেন তা পূরণের জন্য আপনার পরিকল্পনায় কি কোনও কার্যকর কর্মসূচি আছে?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর ইসলাম-উল-হক বলেন : মুসলমানদের সেই আদর্শ প্রথম শতক পুনরায় দেখবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সকল যুগের মুসলিম সাধকরাই অন্তরের মণি কোঠায় লালন করে এসেছেন। এ যুগের মুসলমানরাও অতীতের উত্তরাধিকার পরম যত্নে বহন করছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক মুমিনের অন্তরেই সে পবিত্র আকাঙ্ক্ষাটির বীজ গুপ্ত রয়েছে। কেবলমাত্র কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী সেটি বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছে না।

এ যুগে যদি আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাই তবে ইসলামের জন্য নিবেদিত-প্রাণ কর্মীদের নতুন সংকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাদের সবাইকে হযরত বিলাল (রা)-এর হিম্মত ও অধ্যবসায় নিয়ে ময়দানে নামতে হবে। এযুগের মুসলমানরাও যদি সাহাবীদের (রা) অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন শুরু করেন তবে এর সুফল খুব শিগগিরই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

মুসলিমসমাজের জন্য এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে, প্রকৃত মুমিনসুলভ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। তিন দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে একাজের সূচনা করা যায় বলে আমার ধারণা। তা হচ্ছে (ক) সকল ইসলাম-বিরোধী শক্তি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টি করা; (খ) মুসলমানদের পার্থিব জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে দীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও দীনী অনুশাসনের ভিত্তিতে জীবনযাপন করবার প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং (গ) দেশ ও জাতি নির্বেশেষে সমগ্র মানবসমাজকে দীনের দাওয়াত দিতে থাকা।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, খোদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আমার মত এক নগণ্য মানুষকে দীনের দাওয়াত দেবার ঘটনা থেকেই আমার মনে এরূপ প্রত্যয় জাগ্রত হয়েছে যে, খুব শিগগিরই দুনিয়ার বুকে নতুন কোনও বিপ্লব আসন্ন। সুতরাং সে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনবার জন্য মুসলিম উন্মাহকে অবশ্যই মানসিক প্রস্তুতিগ্রহণ করতে হবে।*

* গুজরাটের 'শাহীন' ও নয়া দিল্লির 'নয়ী দুনিয়া'তে প্রকাশিত সাক্ষাতকারটির ভাষা ও উপস্থাপনা প্রায় এক।

ভুপালের ডায়েরি

ভক্তিতে 'ভগবান' ছিলেন শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন। মাত্র বছর দু' আগেও তিনি ছিলেন ভারতীয় হিন্দুর পুজানীয়পুরুষ। পৈত্রিক সূত্রে তিনি মোহন্ত বা দেবস্থানস্বামী। মোহন্তগিরি পেশা অঢেল অর্থ উপার্জনের উৎস ও সর্বোপরি অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীর ভালোবাসার মাঝে তিনি যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর অধিপতিও ছিলেন তিনি নিজে। পৈত্রিক আশ্রমের বৈভব আর বিলাসিতার মাঝে লালিত ভগবান শিবশক্তি ছিলেন ভারতীয় হিন্দুর আরাধ্যপুরুষ। শতাব্দের সনাতন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে লালন করে যে আসন তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সে আসনের ভগবানও ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের চিন্তা ও সর্বোপরি তাওহিদী কালেমার শ্বাশত আহবান ভগবান শিবশক্তিকে এক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সে সত্য হচ্ছে ইসলাম, যার ছায়াতলে নবজীবন লাভ করে ভগবান শিবশক্তি হলেন ডক্টর ইসলাম-উল-হক। ১৯৮৬ ইং সালের ১০ মে ভুপালের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এক হলফনামার মাধ্যমে ভারতীয় হিন্দুর এ ভগবানতুল্য পুরুষ সপরিবার ইসলামকবুল করেন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের এ ধর্মান্তরের ঘটনা সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষত, গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ভগবান শিবশক্তির ইসলাম কবুলের বিষয়টি গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুগোষ্ঠী ও ভারতের বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করতে থাকে।

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভগবান শিবশক্তির ইসলাম কবুলের খবর পাওয়ার সুবাদে তাঁর সান্নিধ্যে আসবার আকাঙ্ক্ষা আমার মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে। এ সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে আমি ভুপাল গমন করতে মনস্থ করি।

১৯৮৮ সালের ২৮ মে আমি ভুপাল যাওয়ার লক্ষ্যে বিমানযোগে কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করি। ২৯ মে কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে

মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর স্টেশনে পৌছাই। সেখান থেকে গাড়ি বদল করে 'ভুপাল ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার' ট্রেনযোগে ভুপাল রওয়ানা হই। আমি যখন ভুপাল পৌছাই তখন মসজিদে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। স্টেশনের কাছে এক মসজিদে ফজরের নামায আদায় করে জনৈক মুসুল্লিকে ভগবান শিবশক্তি ওরফে ইসলাম-উল-হক সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করি। বিদেশ থেকে আগত যাত্রী শুনে তিনি সদয় হয়ে আমাকে ইসলাম-উল-হক সাহেবের বাসায় পৌছে দেন।

আমি যখন ইসলাম-উল-হক-এর বাসায় পৌছাই তখন তিনি ফজরের নামায শেষ করে দরজায় দাঁড়ায়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে তাঁর সন্ধানে এসেছি শুনে আমাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি তাঁকে কদমবুছি করতেই তিনি সহাস্যে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "আরে ভাই, আন্দার আও"। তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। এ সময় আমি দীর্ঘযাত্রার কারণে স্বাভাবিকভাবেই পরিশ্রান্ত ছিলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোসল করবার প্রয়োজন আছে কিনা? আমি সবিনয় তাঁকে গোসল করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। তিনি তাঁর নবদীক্ষিত স্ত্রীকে বললেন, "আধা-গরম, আধা-ঠান্ডা পানি বাথরুম মে দি জিয়ে।" পানির বন্দোবস্ত হতেই আমি তৃপ্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে গোসল সেরে উঠলাম। যাত্রার কারণে আমার পরিধেয় বস্ত্র নোংরা হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর হক সেগুলো তাঁর স্ত্রীর হাতে দিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করতে বললেন। আমি তাঁর এই আচরণে একটু হতবাক ও লজ্জিত হলাম।

আমিগোসল শেষে ঘরে ফিরে দেখলাম নাস্তা রেডি হয়ে গিয়েছে। নাস্তার টেবিলে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা হলো। ডক্টর ইসলাম-উল-হক জানালেন, বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েক দিন আগে আরও একজন এসেছিলেন। নাস্তার পর্ব শেষ হবার পর তিনি আমাকে পরিশ্রান্ত যাত্রার কারণে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইতোমধ্যে বাইরের বেডরুমে আমার বিছানা স্থির করা হয়েছে। ডক্টর ইসলাম-উল-হক নিজ হাতে আমার শয়নকক্ষের বিছানা ঠিক করে বাইরে গেলেন। আমি বিশ্রামগ্রহণ করলাম এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের জোহরের আযানের পূর্বেই উঠে জনাব ইসলাম-উল-হক-এর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তারপর তাঁর পরিবারের সঙ্গে একত্রে দুপুরের আহার সেরে পুনরায় বিশ্রাম নিলাম। বিকেলে আসরের আযানশেষে পুনরায় নামায আদায় করে আমি ও জনাব হক বাসার ড্রইংরুমে বসে দীনী আলাপ শুরু করলাম।

আলাপের সময় ডক্টর ইসলাম-উল-হক চোস্ত হিন্দিতে কথা বলছিলেন। ইংরেজিতেও তাঁর দখল-জ্ঞান দেখে অবাক হলাম। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে জনাব হক

জানালেন, পৃথিবীর বারটি ভাষার ওপর তাঁর দখল রয়েছে। আলোচনা করে আরও জানতে পারলাম যে, তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওরিয়েন্টালিজমে এম, এ এবং গুরুকুল কাংড়ি থেকে আচারিয়া পদবী পান। তাছাড়া বিশ্বের দশটি প্রধানধর্মের ওপর ডক্টর অব ডিভাইনিটি ও ওরিয়েন্টালিজমে পুনরায় পিএইচ. ডি লাভ করেছেন বলে তিনি আমাকে জানালেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ইসলামগ্রহণের পেছনে কোন বিষয়টি মূলত কাজ করেছে? উত্তরে তিনি জানালেন, বিভিন্ন ধর্মের ওপর পড়াশোনা করে আমি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামের সৌন্দর্য ও মানবিকতাবোধের সঙ্গে অন্য কোনও ধর্মের তুলনাই হয় না। এটি হচ্ছে ইসলামগ্রহণের একটি কারণ। অপর কারণ সম্পর্কে তিনি বললেন যে, একদা গভীর রাত্রে তাঁকে ও তাঁর বিদূষী স্ত্রীকে ইসলামগ্রহণের জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ। তিনি বলেন, এ দু'টো কারণেই আমরা মূলত ইসলামগ্রহণ করি। কথা প্রসংগে তিনি ভ্যাটিক্যানের ধর্মগুরু পোপ জনপল কর্তৃক খৃস্টধর্ম গ্রহণের অনুরোধ ও তা প্রত্যাখ্যান করে ভগবানের মুকুট ধারণের বিষয়টা উল্লেখ করেন।

কথায় কথায় মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত হয়ে আসলো। আমি আর ড. ইসলাম-উল-হক অযু করে বাড়ির কাছে হকি স্টেডিয়ামে মাগরিব নামায আদায় করতে গেলাম। মাগরিব নামাযশেষে ফিরে এসে আমার ভুপাল শহর দেখবার ইচ্ছে জাগলো। আমি ইচ্ছার কথা ড. হককে জানালে তিনি সম্মতি এবং সেই সঙ্গে এলাকার জনৈক হাদী সাহেবকে আমার গাইড হিসেবে সঙ্গে দিলেন। আমি যথারীতি তাঁর অনুমতি নিয়ে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যখন শহর দেখে হাদী সাহেবের সঙ্গে বাড়ি ফিরি তখন রাত অনেক হয়েছে। বাড়ি ফিরে জনাব ইসলাম-উল-হক ও তাঁর পরিবারকে আমার জন্য জেগে থাকতে দেখে ভীষণ লজ্জিত হলাম। অতঃপর এশার নামায আদায় করে রাতের খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন অর্থাৎ ১ জুন '৮৮ ইং সকালে ডাইনিং টেবিল নাস্তা খাওয়ার ফাঁকে ড. ইসলাম-উল-হক সাহেবের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা হলো। এ সময় তিনি গত ২০-২১ ফেব্রুয়ারি '৮৮ ইং আসামের বদরপুরে আল জামায়াত আল আরাবিয়া আল ইসলামিয়ার সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার বক্তব্যের পর উপস্থিত বেশকিছু হিন্দু ইসলামগ্রহণ করে।

তিনি বলেন, খোদ ভুপালেই এ পর্যন্ত ৮০ জন হিন্দু মুসলমান হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে ডক্টর ইসলাম-উল-হককে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি স্মিত হেসে জানালেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাসপোর্টের অভাবে তিনি বাংলাদেশ যেতে পারছেন না। এ প্রসংগে তিনি বাংলাদেশের খুলনা জেলায় গত মার্চ মাসে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানানোর কথা উল্লেখ করে জানালেন, শুধু পাসপোর্টের কারণে তিনি অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করতে পারেননি। ফলে এটি তাঁর যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আমি ড. ইসলাম-উল-হককে জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মান্তরিত হবার পর পাসপোর্টে পেতে সরকারি পর্যায়ে তাঁর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা? তিনি জানালেন কিছুটা সমস্যা ও জটিলতা তো রয়েছেই। এ বিষয়ে তিনি আমাকে তাঁকে লেখা ভারতের কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং-এর একটি পত্র দেখালেন। তাতে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর পাসপোর্ট লাভের বিষয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন।

এভাবে ভুপালে ২ (দুই) দিন ড. ইসলাম-উল-হক-এর সঙ্গে অতিবাহিত করলাম। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমার খোলা-মেলা আলাপ হয়েছে। এবার আমার ফেরার পালা। মনের ইচ্ছেটা তাঁকে জানালাম। তিনি আমার সঙ্গে স্টেশনে আসলেন এবং রিজার্ভেশনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন।

বিদায় নেওয়ার লগ্নে, মনটা খারাপ হয়ে এলো। আমি ড. হকের সহধর্মিনী বেগম খাদিজা হক ও কন্যা আয়েশা হকের সঙ্গে দেখা করে তাদের মেহমানদারির জন্য ধন্যবাদ জানালাম। একইভাবে, ড. ইসলাম-উল-হককে বিনয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় চেয়ে নিলাম।

ভুপাল থেকে স্বদেশ ফেরার পথে ড. ইসলাম-উল-হকের প্রতিচ্ছবি বারংবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। বিশেষ করে ২ (দুই) দিনের ভুপালের জীবনে এ মানুষটির স্নেহ-ভালোবাসা ও আতিথেয়তা বারবার আমার মনকে আলোড়িত করতে থাকলো। ভুপাল থেকে যখন স্বদেশের মাটিতে পা রাখলাম, তখন মনে হলো বহুদিন পর এমন একজন পরিপূর্ণ মানুষের সাক্ষাত পেয়েছিলাম, যাকে কখনও ভোলা যাবে না।*

* সত্য মুক্তি মানবতা, পৃষ্ঠা ৬৮-৭৩ লেখক মেসবাহ উদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশে ড. ইসলাম-উল-হক ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

উনিশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ইং রাত দশটা। ফোনে দাওয়াত পেলাম বাংলাদেশ মুজাহেদিনের কাছ থেকে। দাওয়াত ছিল বিশ্বের সাড়া জাগানো নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল হকের সম্মানে আয়োজিত ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্নভোজে। ঐ দিন একই সময় আমার আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম ছিল। বিব্রতবোধ করলাম। তবে কেন যেন দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। অথচ একই সময় অনুষ্ঠিতব্য দু'টি প্রোগ্রামে কি করে যোগ দেবো তা আমার মনকে ব্যাপকভাবে চিন্তিত করে তুললো। ঠিক এমনি সময় আর একটি ফোন এলো। রিসিভার তুলে যে সংবাদটি পেলাম তা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অনিবার্য কারণবশত আমার পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম বাতিল হয়েছে। অনাবিল আনন্দে মনটি ভরে গেল। একটি চরম অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গভীর শোকরিয়া আদায় করলাম মহান করুণাময় আল্লাহর।

দেড়টায় পৌছলাম দাওয়াত স্থলে। আসলেন প্রধান অতিথি জনাব ড. ইসলাম-উল-হক দু'টোর একটু পরে। এর ক'দিন আগে গুলশান মসজিদের সেক্রেটারির অফিসে তাঁকে প্রথম দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু আলাপ করবার সুযোগ হয়নি উৎসাহী জনতার প্রচণ্ড ভীড়ে। কিন্তু এখানে দাওয়াতির সংখ্যা ছিল একেবারেই স্বল্প। সকলে মিলে জনা দশেক। পরিবেশ ছিল আলোচনার জন্য খুবই চমৎকার। কিন্তু তবুও খাবারের পূর্বে তাঁকে আলোচনায় টেনে আনতে মন চাইলো না। তাই চুপ করে ছিলাম। তিনি অবশ্য নিজেই ইসলামের মহীয়ান দিকগুলো নিয়ে কিছু কথা বললেন।

খাবারের রকম ছিল প্রচুর, পরিমাণ ছিল প্রচুরতর এবং এর পরিবেশনায় আন্তরিকতা ছিল প্রচুরতম। খেতে বসে শুনলাম ড. ইসলাম-উল-হক দিনে মাত্র একবারই খান, শুধুমাত্র মধ্যাহ্নভোজ। অথচ তাঁর চেহারা দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। দোহারা গড়ন। মেদের বাহুল্য নেই— নেই সারা শরীরে অস্বাভাবিক কোনও কিছু। আছে চোখে মুখে বেহেশতের আলো। সাধারণ বেশ, কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সদা হাসিমাখা মুখখানা পরিচয় বহন করছিল তাঁর অকৃত্রিম সারল্যের।

খাবারের পূবেই খোঁজ নিলেন তাঁর ড্রাইভারের। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানালেন যে, ড্রাইভারকে তাঁর সঙ্গেই খেতে দিতে হবে। বক্তব্যটির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে জানালেন যে, দিন কয়েক আগে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন। সেখানেও খাবারের আয়োজন ছিল অনেক। কিন্তু গৃহস্বামী ড্রাইভারদের খাবারের ব্যাপারে তেমন সুনজর দেননি। অথচ খাবারের পর গৃহস্বামী তাঁকে একগাদা নোট দেবার অপচেষ্টা করেছিলেন। তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন : মেজবানের এ ব্যবহারে তিনি যে শুধু হতবাক হয়েছিলেন তাই নয়, মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম করণও খুঁজে পেয়েছিলেন এর মধ্যে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যাঁরা আল্লাহর বাণী ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করেন তাঁদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনও কল্যাণ হতে পারে না। ইসলাম কোনও পণ্য নয়— নয় অর্থ উপার্জনের উৎস।

খাবারের শেষে তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, কারও কোনও প্রশ্ন আছে কিনা? অযাচিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইসলামগ্রহণে তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চাইলাম। জবাবে সহাস্য তিনি বললেন : ছিলাম ভগবান, আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় হতে পেরেছি ইনসান। আর ইনসান চরিত্রের প্রধানতম যে গুণ ইনসানিয়াত তা হলো ইসলামের অনবদ্য অবদান। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : ইনসানিয়াতের অপর নাম হলো ইসলাম। তিনি আরও বললেন যে, তরবারি নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত মানবতাবোধ ইসলামের দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করেছে— করছে আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং সেদিন দূরে নয় যেদিন সারা বিশ্বের মানুষ ইসলাম-স্বীকৃত মানবতাবোধের বিমলিন সরোবরে অবগাহন করবার জন্য দলে দলে যোগদান করবেন।

বিশ্বের মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তাঁর চোখে মুখে একটা করুণভাবের সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন যে, এর কারণ মাত্র একটি এবং তা হলো : মুসলমানেরা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (স) মত পথ থেকে আজ অনেক দূরে। তিনি আরও বললেন যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা রাসুলের জীবনাদর্শ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত না করবেন ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের জীবন থেকে অমানিশার অন্ধকার দূর হবেনা। তারা রইবে নিগৃহীত, উৎপীড়িত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। কারণ রাসুল (সা) জীবনের অপর নাম আল-কুরআন এবং আল-কুরআন প্রবর্তিত জীবন-ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর অপরিসীম দান। আর শুধুমাত্র স্রষ্টা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা গ্রহণের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে প্রশ্ন করতেই তাঁর চোখেমুখে ভেসে উঠলো মোহনীয় হাসির এক অপরূপ রেখা। বললেন : বিশ্ব খেলাফতের সূচনাস্থল হবে বাংলাদেশ এবং এখান থেকেই ইসলামের যে অপ্রতিরোধ্য বিজয় নিশান উড্ডীন হবে তারই পতাকাতলে সমবেত হবে সারা বিশ্বের মানুষ।

গভীর আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান ড. হকের বক্তব্যের দৃঢ়তা, প্রকাশভঙ্গির দক্ষতা, উপমা চয়নের অপূর্ব ক্ষমতা ও তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলে। তন্ময় হয়ে চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। বিদায় নেবার উদ্যোগগ্রহণ করে আমাদের সকলের উদ্দেশে বললেন : আপনারা এই বিশ্বাস রেখে সততার সঙ্গে কাজ করে যাবেন যে মায়ের প্রসব বেদনার ন্যায় ইসলামের সর্বব্যাপী বিস্তারের প্রসব-বেদনা শুরু হয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন এমন একজন দাইয়ের (ধাত্রীর) যিনি মাতা ও সম্ভাবনাময় জাতকের পরিচর্যা করতে পারেন এবং সে দাই ইতোমধ্যেই তাঁর আরাধ্য কাজ শুরু করেছেন। কোনও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই তিনি আবারও বললেন যে, আগামী দশবছরের মধ্যেই বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে এবং এতদঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করবে। কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, আমি যেসব কথা বললাম তা আপনারা দেশবাসিকে জানান।

তাঁর শেষ উপদেশ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে বর্তমান লেখাটি লিখতে। তাঁর বক্তব্য সত্য হোক, সফল হোক, মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে এই আমাদের একান্ত মোনাজাত। [দৈনিক ইনকিলাব]।

মুহাম্মদ আয়েনউদ্দীন

রাজশাহীর মাদরাসাময়দানে ড. হকের ভাষণ

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। ড. ইসলাম-উল-হক রাজশাহীর মাদরাসাময়দানে বিশাল জনসামবেশে বক্তৃতা করেন :

"নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। ব্রাদ্রানে মিল্লাত! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" বন্ধুরা, আমি যখন সালাম দেই, তখন আপনারা আমার সালামের জবাব দেবেনে। যেন জমিন, আসমান এবং মহাশূন্য সাক্ষ্য দেয় যে, এ স্থানে এসব ঈমানদার মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে শান্তি ও রহমতের জন্য দুআ করেছেন।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, আজ আল্লাহর মিশন চালু রয়েছে। আজ পৃথিবীর বহু জায়গায় দীন ইসলামের জ্যোতির ব্যাপক প্রসার ঘটছে। আল্লাহর দরবারে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, ১৪ শ' বছর পূর্বে হযরত মুহম্মাদ (স) যেভাবে বিশ্ব মানবতার কাছে সালাম ও শান্তি পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমরাও সে-ভাবেই শান্তির বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা,

আল্লাহর অনুগ্রহেই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমি আপনাদের সামনে কিছু ধ্বনি দেবো–আপনারা তার প্রতিধ্বনি দেবেন।

ধ্বনি : নারায়ে তকবীর (উচ্চাস্বরে আল্লাহর বিরাটত্ব ঘোষণা কর) সমবেত জনতার প্রতিধ্বনি : আল্লাহ আকবার (আল্লাহ মহান)!

ধ্বনি : দীন ইসলাম।

প্রতিধ্বনি : জিন্দাবাদ!

ধ্বনি : মিল্লাতি মুহম্মদী

প্রতিধ্বনি : জিন্দাবাদ!

ধ্বনি : উম্মতে ইসলামিয়া

প্রতিধ্বনি : জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ!

ধ্বনি : হামারে আল্লাহ

প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়!
ধ্বনি : হামারে মাবুদ, হামারে মাবুদ
প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়!
ধ্বনি : হামারে কুরআন, হামারে কুরআন
প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়,
ধ্বনি : হামারে নবী, হামারে নবী
প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়!
ধ্বনি : হামারে দীন, হামারে দীন
প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়!
ধ্বনি : হামারে কেবলা, হামারে কেবলা
প্রতিধ্বনি : এক হ্যায়, এক হ্যায়!
ধ্বনি : দুনিয়াকে মুসলমানো
প্রতিধ্বনি : এক হো যাও!
ধ্বনি : দুনিয়া কে মুসলমানো
প্রতিধ্বনি : মুমিন হো যাও!
ধ্বনি : হর ফিরকা কো
প্রতিধ্বনি : মিটা দো, মিটা দো!
ধ্বনি : দুনিয়ামে ইসলাম কো
প্রতিধ্বনি : ফয়লা দো, ফয়লা দো! (প্রসার ঘটাও, প্রসার ঘটাও)।

প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা আমার সংগে যে ধ্বনি দিলেন, যে আওয়াজ বুলন্দ করলেন, সে জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ!

আজকের এ সময়ের যে ধ্বনি তাতে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, দুনিয়ার মুসলমান যদি আজ একতাবদ্ধ না হয়, ঐকমত্যে না পৌঁছে, তবে বিশ্ব মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এক একজন মানুষ এক একটি ইনকিলাব, এক একটি বিপ্লব। আমাদের মাবুদ আল্লাহ। আমাদের কুরআন এক, আমাদের দীন (জীবনব্যবস্থা) এক।

আমি আজ আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

পিপাসা। আপনারা সকলেই জানেন যে, পিপাসা কেবল মানুষেরই লাগে না। প্রত্যেক জীবেরই পিপাসা লাগে। কিন্তু মানুষের পিপাসার ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে, রূপ আছে। যখন মানুষের পূর্ণ পিপাসা হয়, তখন পানির সঙ্গে সেই পিপাসার মিলন ঘটিয়ে দেয়া হয়।

তদরূপ আপনাদের পিপাসা আর আমার পিপাসা যখন এক হয়েছে তখনই আমাদের এ সাক্ষাত বা মিলন হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা,

যখন কোনও মুসলমান অন্য কোনও মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তখন যদি তারা তাদের প্রভুর প্রশংসা করে, রসুল (স)-এর তারিফ করে তা হলে তাও তার ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স)-এর আনুগত্য করা ইবাদত। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, আসসালামু কাবলাল কালাম অর্থাৎ বাক্যালাপের পূর্বেই সালাম দিতে হবে। তাই আমি আপনাদের সঙ্গে সালাম দ্বারাই কালাম বা কথার সূচনা করতে চাই।

সালামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশি। সালামের অর্থ, নিজের জীবনে শান্তিগ্রহণ করা এবং অন্যদের কাছে শান্তি পৌঁছে দেয়া। সাহাবায়ে কেরাম (রা) ব্যাপকভাবে সালাম আদান-প্রদান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) অনেক সময় বাজারে কেবলমাত্র সালাম করবার জন্য যেতেন।

এ সালামের কারণেই যে আরবভূমি অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেখানে শান্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

সালাম তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে শান্তি এনেছিল, পুরো পরিবেশ শান্তিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

রসূল (স)-এর জামানায় এক লোকের নাম ছিল কালবি। সে বড় বড় পাপকাজে লিপ্ত ছিল। মদ্যপান করতো, জুয়া খেলতো। সে একদিন চিন্তা করলো মুহম্মদ (স)-এর কাছে যাওয়া দরকার। রসূলল্লাহ (স)-এর দরবারে সে হাজির হলো। রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে পৌঁছাবার পর তার ওপর হযরত (স) এর এমন প্রভাব পড়লো যে, সে আবেগভরে বলে উঠলো, ইয়া রসুলুল্লাহ, আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। হযরত (স) তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-কামেলা পড়ালেন।

জিব্রাইল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহর রসূল (স), আল্লাহ আপনাকে এবং ওই কালবিকেও সালাম প্রেরণ করেছেন।

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন, তবে আল্লাহ জীবন্ত সত্তা, অবশ্যই তিনি আমাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন। কালবি (রাঃ) যখন কালেমা পড়লেন, আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ

করে দিলেন এবং আল্লাহ জিব্রাইল (আ) কে বললেন যে, নবী (স) কে এবং ওই কালবি (রা) কেও সালাম বলে আস।

আমরা যদি মুসলমান হই তবে কেন আল্লাহ আমাদের সালাম প্রেরণ করবেন না। আমরা তো মনে করি যে, আমরা মুসলমান। কিন্তু মুসলমান কখন হয়? যখন তার মধ্যে অনুভূতি জাগে। যখন একজন এ কথা না বোঝে যে, মুসলমান হলে কি হয়? তখন বুঝতে হবে যে, ইসলাম সম্পর্কে তার অনুভূতি বা সঠিক ধারণা নেই।

মুসলমান 'দিল' (হৃদয়) হয়, দেমাগ (মস্তিষ্ক) হয় না। সেই কালবি (রা) যার দিল মুসলমান হয়েছিল, তার ওপর আল্লাহর সালাম পৌঁছেছিল।

আমার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর সালাম সমগ্র বাংলাদেশে পৌঁছাক।

আপনাদের কাছে আমার পরিচয় দেয়া হয়েছে। ভাই ও বন্ধুরা, আমি জানতাম না যে, সালাম কি বস্তু। আমাকে সালাম পৌঁছানো হয়েছে, আমি মুসলমান হয়েছি। এ সালাম যার জীবনে পৌঁছে, সে তুফান (প্লাবন) হয়ে যায়, ইনকিলাব (বিপ্লব) হয়ে যায়। যেখানে সালাম হবে— সেখানে ইনকিলাব হবে, তুফান হবে।

ইসলাম মোটাসোটা বা কৃশকায়দের জন্য নয়, ইসলাম ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য (জীবন) আছে। ইসলাম অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পৌঁছার প্রাণ চাঞ্চল্য।

আমি একজন শাস্ত্রকার। আমি পড়েশুনে দেখেছি :

বেদ, জিন্দাবেস্তা, বাইবেল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে হুজুর (স) সম্পর্কে অজস্র আলোচনা আছে। বিজ্ঞান অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। ইসলাম একটি বিজ্ঞান। এর যে সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য আছে, তার অনেক নজির আমি আপনাদের খেদমতে তুলে ধরতে পারি।

সকল জাতির স্রষ্টা বা মাবুদ একজন। আদম (আ) একজনই— প্রথম মানব। মানবজাতি সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান-সন্ততি।

আমাদের সকলের রক্ত-সম্পর্ক, পরিবার, রাষ্ট্র, সবকিছুর ওপর ইসলামের স্থান। যখন মানুষ চলে তখন একটি রাস্তার ওপর চলে, সেই রাস্তা বা তরিকার নাম হযরত মুহম্মদ (স)-এর তরিকা।

আল্লাহ তাঁর 'রেযা' বা সন্তুষ্টি হিসেবে মুহম্মদ (স)-কে মানবরূপে প্রেরণ করেছেন। যিনি মুহম্মদ (স)-কে চেনেন, তিনি আল্লাহকেও চেনেন। যিনি মুহম্মদ (স)-কে চেনেন না, তিনি আল্লাহকেও চেনেন না।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আজ আমি আপনাদের ও আমার প্রাণ-প্রিয় রসূল (স) সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। এ আকাশ, এ পৃথিবী যেরূপ সত্য, হযরত মুহম্মদ (স)-এর নবুয়ত, রিসালত, চারিত্রিক গুণাবলী ও মানবিক বৈশিষ্ট্য তেমনি সত্য।

এ পৃথিবীতে হিটলার এসেছেন, মুসোলিনি এসেছেন, অনেক বড় বড় মানুষ এসেছেন; অনেক মুনি-ঋষি এসেছেন; অনেক নবীও এসেছেন। কিন্তু আমি একটি কথা বলবো, আপনার কাছে কী সম্পদ আছে তা বলবো।

এ সকল বড় বড় মানুষের জীবনের কোনও না কোনও একটা দিক আমাদের সামনে খোলা আছে। কিন্তু কারো পুরোজীবন, পুরোচরিত্র পাওয়া যায় না। ভারতের অনেক মুনি-ঋষি ছিলেন কিন্তু তাদের পূর্ণপরিচয় পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র ভগবানের অবতার (?) কিন্তু তাঁর পারিবারিক জীবন কিরূপ ছিল? তাঁর অনেক স্ত্রীর কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অনেক মহাপুরুষের চরিত্র সম্পর্কের শুধু কিংবদন্তী পাওয়া যায়।

হযরত ঈসা (আ) বড় সুন্দর মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিস্তারিত কাহিনী আমাদের কাছে অনুপস্থিত।

কুরআন আল্লাহর বাণী–যা জিব্রাইল (আ)-এর মাধ্যমে সরাসরি মুহাম্মদ (স)-এর নিকট পৌঁছেছে। হুজুর (স)-এর বাষট্টি বছর কয়েক মাসের জীবনের মধ্যে নবুয়তের ২২ বছরের জিন্দেগিতে কুরআন মজিদের প্রতিটি অক্ষর তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, যেখানে কুরআন আছে সেখানেই নবী (স) জীবনের প্রতিফলন আছে।

কুরআন নিজে শিক্ষা দিতে পারে না, শিক্ষা দেন নবী (স)। যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণের জন্য তৈরি হয়, আল্লাহ তাকে শিক্ষাদান করেন।

ইসলাম একটি পূর্ণ দীন বা জীবনব্যবস্থা। এটা কোনও নিছক ধর্ম নয়। দীন হচ্ছে সেটা কুরআন হাদিসের মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে। আল্লাহ এবং ভগবান এক নয়। যতবার আল্লাহ বলবেন, ততবার বেহেস্তের দরজা আপনার জন্য খুলে যাবে।

মুসলমান কোনও জ্ঞাতিভাই নয়, কোনও গোত্র বা বর্ণ নয়, কোনও জাতি নয়— উম্মত। আপনারা জাতির পরিচয় না দিয়ে উম্মতের পরিচয় দিন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা ও মুহব্বত পোষণ করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

ভগবানের রাজশাহী সফর

ভারতীয় নওমুসলিম ড. ইসলাম-উল-হক বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তাঁর এ সফরের শেষপর্যায়ে তিনি চারদিনের সফরে বিমানযোগে ঢাকা থেকে রাজশাহী এসে পৌছান। দিনটি ছিল ১৯৮৯ সনের ২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার।

রাজশাহীতে ড. ইসলাম-উল-হককে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাজশাহী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৫৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় বাস ও মাইক্রোযোগে প্রায় ৩ শ' লোক রাজশাহী বিমানবন্দরে ড. হককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হয়। দুপুর সাড়ে এগারটায় ড. ইসলাম-উল-হক রাজশাহী বিমানবন্দরে পৌছুলে তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দেয়া হয়। ড. ইসলাম-উল-হক স্ত্রী ও কন্যাসহ রাজশাহীতে একটি বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি ২ ফেব্রুয়ারি রাণীবাজার জামে মসজিদে মাগরিবের নামায পড়েন এবং নামায শেষে মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি মুসলমানপ্রধান দেশ। এখানে সত্যিকার মুসলমান দেখতে পাবেন, এ আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আফসোস করে বলেন, এখানকার মুসলমানরা নিজস্ব কৃষ্টিকালচার ছেড়ে বিদেশী ও বিধর্মী কালচার গ্রহণ করেছেন।

৩ ফেব্রুয়ারি ৮৯ রোজ শুক্রবার তিনি হেতম খাঁ বড় মসজিদে জুমার নামায আদায় করেন। নামাযের আগে তিনি মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। ঐ দিন বিকেলে তিনি রাজশাহী মাদরাসাময়দানে একটি ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন। এ জনসভায় প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগম হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি '৮৯ রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের মহিলাদের এক বিরাট সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। মহিলাদের এ সমাবেশে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নারীর দেহ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নয়। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কনাকে দেখিয়ে বলেন, এরা একসময় কপালে টিপ পরতেন। সেই টিপ ফেলে দিয়ে এখন তারা মুসলমান হয়েছেন। তিনি বলেন, বোরকা অবরোধ নয়। বোরকা নারীর ভূষণ, ইসলামের নির্দেশিত নারী একটি অলংকার। বাংলাদেশী মুসলমান

মহিলাদের এভাবে দেখবেন এটা তিনি আশা করেননি। তিনি মুসলমান মহিলাদের মুমিনা হবার আহ্বান জানান। সভায় তাঁর কন্যা আয়েশা হক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বোরকা পরে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইসলাম-উল-হক রাজশাহীতে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেন, মানুষ মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে কুফর (অবিশ্বাসী), অপরটি মুসলিম বা বিশ্বাসী। এই মুসলিমকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ হচ্ছে মোনাফিক, আর এক ভাগ হচ্ছে মুসলমান এবং অপর এক ভাগ হচ্ছে মোমিন। তাঁর মতে, এই মোমিনই হচ্ছে মুসলমানদের পূর্ণরূপ। একজন মুসলমান মোমিন হলে তার ঐ শূন্যস্থান অন্য একজন অবিশ্বাসী দ্বারা পূরণ হতে পারে। তাই তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের মোমিন হবার দাওয়াত দেন। এ বিষয়ে পাকিস্তান থেকে তাঁর লেখা একখানা পুস্তিকা প্রকাশ হয় সেসময়।

ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতে মুসলমানেরা সত্যিকার মুসলমান হিসেবে জীবিকানির্বাহ করতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু নানা কারণে তা তাঁরা পারেন না। কিন্তু বাংলাদেশ একটি মুসলমানপ্রধান দেশ। এদেশের রাষ্ট্রীধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সত্যিকার মুসলমান হবার পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানদের মধ্যে তিনি সত্যিকার ইসলামী তমুদ্দুন ও তাহজিব দেখতে পাননি। এটা তাঁকে দারুণভাবে পীড়া দিয়েছে।

তিনি তাঁর ইসলামগ্রহণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, স্বপ্নে নবী করিম (স) কে সাক্ষাতের ব্যাপারটি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে তিনি বলেন, নবী করিম (স) তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবার পর যে সুবাস তিনি পেয়েছিলেন— সেই সুবাস এখনও তিনি অনুভব করেন। তিনি বলেন, নবী করিম (স) তাঁকে লোকদের কালেমা পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করিম (স) স্বপ্নে তাঁকে আরও বলেছেন যে, এ উপমহাদেশ থেকে কুফরির পরিসমাপ্তি ঘটবে। তিনি বলেন, তাঁর বড় মেয়ে স্বামীসহ মুম্বেতে থাকেন। তাঁর জামাতা সেখানে একটি আশ্রম পরিচালনা করেন। তারা এখনও হিন্দু রয়েছেন। মুসলমান হবার পর তিনি একবার মেয়ের জামাইর কাছে গিয়েছিলেন। জামাইর বাপ-মা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। মেয়ে-জামাইও দুবার ভুপালে তাঁর বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। তাঁর মেয়ে ও জামাইর মুসলমান হবার কোনও সম্ভবনা আছে কি-না এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা তাঁর জানা নেই। তবে আল্লাহ পাক হেদায়েত করলে তাঁরা মুসলমান হতে পারে।*

---

* সত্য যুক্তি মানবতা, লেখক খালেদা নাজনীন খান, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৮।

পঞ্চম অধ্যায়
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য একটি ইতিহাস, একটি অনন্য উদ্যম ও অনুপ্রেরণার নাম। অদম্য অনুসন্ধিৎসার দীপ্ত উদাহরণ, সত্য ও কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদনের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

সত্যের প্রতি সহৃদয় আকর্ষণ তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল। ধর্মাধর্মের চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। সত্যের মহিমান্বিত আহ্বান সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট।

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য ১৯১৬ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর (বর্তমানে শরিয়তপুর) জেলার গোসাইরহাট উপজেলার দাসের জঙ্গল গ্রামে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশীকান্ত ভট্টাচার্য। মাতা ক্ষিরদা সুন্দরী (রাঙাবউ)।

ইসলামগ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল সুদর্শন ভট্টাচার্য। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৭ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। তাঁর মুসলিম নাম রাখা হয় আবুল হোসেন। কিন্তু পৈতৃক পদবী ভট্টাচার্য যুক্ত করে তিনি নিজের নাম লিখতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, "যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণ করে থাকেন তাদের সকলেই হিন্দুজাতির তযসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে একশ্রেণীর হিন্দুলেখক ও বুদ্ধিজীবী অপপ্রচার চালিয়ে এসেছেন। তাদের প্রচারণা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করবার জন্য আমি

নিজ নামের শেষে 'ভট্টাচার্য' পদবী ব্যবহার করি একান্ত বাধ্য হয়েই, বংশীয় পদমর্যাদা বা বাহাদুরী প্রকাশের জন্য নয়।"

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে বিশ্বস্রষ্টার সংখ্যাসম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি যখন স্কুলে লেখা-পড়া করতেন তখন জনৈক মুসলমানশিক্ষকের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। সেই শিক্ষক একদা শিশু সুদর্শনকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "কর্তা অনেক হলে গোলমাল বাঁধে। সারাজাহানের কর্তা একজনই। আমরা মুসলমানরা সকলকিছুর মূল হিসেবে একজন কর্তাকেই মানি। তুমি একজনকেই খুঁজতে চেষ্টা করবে।"

সুদর্শন ভট্টাচার্য তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের একথা জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারেননি। 'তুমি একজনকেই খুঁজতে চেষ্টা করবে' এ মহান উপদেশ তাঁর শিশুমনে শেকড় গেড়ে বসে এবং পরবর্তীতে মহীরুহে পরিণত হয়।

কালের চক্র আবর্তিত হয়। সুদর্শন ভট্টাচার্যের মনোজগতেও নানান জিজ্ঞাসা প্রবলতর ওয়ে ওঠে। অনুসন্ধিৎসার ব্যাকুলতাই তাঁকে খৃস্টান ও মুসলিমপণ্ডিতদের সান্নিধ্যে টেনে আনে। অবশেষে ইসলামী জীবনাদর্শের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান।

এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা আকরম খাঁ, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান আনওয়ারী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফি আল-কোরায়শী প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পরামর্শ সুদর্শন ভট্টাচার্যকে ইসলামগ্রহণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামগ্রহণের পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য রংপুরের মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন।

গাইবান্ধায় অবস্থানকালে তিনি 'নওমুসলিম তবলিগ জামায়াত' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ সরকার ও হিন্দুনেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার মুখে সে সংগঠনের তৎপরতা অল্পকালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি কলকাতা চলে যান।

১৯৪৬ সালে দেশবিভাগের মাত্র একবছর আগে তিনি মালদহ জেলায় মহকুমা প্রচার কর্মচারী (Subdivisional Publicity Officer) হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্টের পর তিনি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের রাজশাহীতে চলে আসেন।

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক মহফিল হক সাহেবের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন।

সুদীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চাকুরি করবার পর ১৯৭৪ সালে গণসংযোগ কর্মকর্তা (Public Relation Officer) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষিতথ্য সংস্থা থেকে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

১৯৬৮ সালে ঢাকায় 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরণ এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

নওমুসলিমদের মুসলমানসমাজে পুনর্বাসনকল্পে গঠিত হলেও আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এ সমিতি চার দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারিত করতে থাকেন। এ চার দফা কর্মসূচি ছিল : (১) নওমুসলিমদের পুনর্বাসন, (২) অমুসলমানসমাজে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো, (৩) খৃস্টান মিশনারিদের উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্ত প্রচারণার মোকাবিলা করে উপজাতীয়দের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা এবং (৪) সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

তিনি ১৯৭৮ সালে মক্কাকেন্দ্রিক রাবিতা-ই-আলম আল ইসলামীর তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল মরহুম শেখ মুহাম্মদ আলী আল হারাকানের আমন্ত্রণক্রমে পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করেন। এর আগে তিনি একই বছর Muslim World League আয়োজিত করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। এরপর একই সংস্থা কর্তৃক কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে তদানীন্তন সরকার তাঁকে সে সম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়নি। সে বছর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান থেকে তাঁকে সফরের দাওয়াত দেওয়া হলে একই কারণে সেসফরও বাতিল হয়ে যায়। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি এদেশের লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর মহৎ কর্মে সর্বান্তকরণে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন অমুসলমান তাঁর হাতে বয়াতগ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অমোঘ আহ্বানে তিনি এতো তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে চলে যাবেন এতটা আশা আমরা কেউ করিনি।

১৯৮৩ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনাজপুরের রাণীর বন্দর থেকে ঢাকা ফেরার পথে পাবনার সমাসনারিতে তাঁর জীপটি দুর্ঘটনা কবলিত হলে অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে ঢাকার পিজি হাসপাতালে পরের দিন ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন পিজিতে চিকিৎসাধীন থাকবার পর কিছুটা সুস্থ মনে হলে তাঁকে কলাবাগানের বাসায় আনা হয়। কয়েকদিন পর আবার তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার

মোহাম্মদপুরের রাবিতা মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর জীবনসায়াহ্ন ঘনিয়ে আসে।

১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ মহান দীনী খাদেম ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তাঁর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হাজার হাজার নওমুসলিম বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হারিয়ে ফেলেন তাঁদের পিতৃতুল্য একজন প্রিয় অভিভাবক।

পরের দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথমে কলাবাগান খেলার মাঠে ও পরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে তাঁর সালাত-ই-জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন ছায়াঘেরা বনানী গোরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হয়।

তিনি আর কখনও ছুটবেন না কোনও দুঃস্থ নওমুসলিমের মনের কথা শোনবার জন্য টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। দেবেন না কাউকে সত্যিকার মুসলমান হয়ে গড়ে ওঠবার উপদেশ। তবে তাঁর মূল্যবান রচনাসমূহে আমরা খুঁজে পাবো সত্য ও কল্যাণের পথে চলবার দিকনির্দেশনা আর সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার সুপরামর্শ।

তাঁর দাওয়াতী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৯৮৪ সালে ইফা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করে সম্মানিত করেন।

তিনি যেমন সু-বক্তা ও বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন শক্তিমান লেখকও। তিনি ছোট-বড় প্রায় ২০ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর এ সমস্ত রচনার প্রায় সবগুলোই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে :

১। বিশ্বনবীর বিশ্বসংস্কার।
২। রোযাতত্ত্ব (১৯৪৬)
৩। মরুর ফুল (কাব্য, ১৯৪৬)
৪। আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম (১৯৭৬)
৫। আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না (১৯৭৭)
৬। একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমানসমাজ (১৯৭৭)
৭। কারবালার শিক্ষা (১৯৭৮)
৮। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৮০)
৯। নবীদিবস (১৯৮১)

১০। ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১)
১১। আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০)
১২। শেষনিবেদন (১৯৭৯)
১৩। দীন-ধর্ম-রিলিজিয়ান (১৯৮২)
১৪। এপ্রিল ফুলের বেড়াজালে মুসলমানসমাজ (১৯৮৩)
১৫। কুরবানির মর্মবাণী (১৯৮১)
১৬। ঠাকুরমার স্বর্গযাত্রা (১৯৮১)
১৭। বিড়ালবিভ্রাট (১৯৮১)
১৮। মূর্তিপূজার গোড়ার কথা (১৯৮২) ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেন। তাঁর এসব কবিতার বেশকিছু তৎকালীন লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে ছড়িয়ে আছে।

মহুরুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের গদ্য, পদ্য, দাওয়াতকর্ম, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সবকিছুতেই একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিশিলিত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি, আজকাল তাঁর মতো ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্বের বড়ই অভাব। ইবাদত-বন্দেগি, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুতেই তিনি শরিয়তের অনুবর্তী ছিলেন। বেশভুষায় ছিলেন সর্বদা সাধারণ মানুষ। অতি কথন, অতি ভোজন, অপব্যয়, অহমিকা ইত্যাদি ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই বন্ধুবৎসল ও সদালাপী ছিলেন। রাব্বুল আলামিন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদউস দান করুন।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে সুধীবৃন্দ

এ-উপমহাদেশের প্রখ্যাত নওমুসলিম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলাম প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য একটি নাম, একটি ইতিহাস। এ উপমহাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ সুন্দর ও সার্থকভাবে পৌঁছে দেবার কাজে তিনি ছিলেন সর্বদা নিবেদিতপ্রাণ।

মরহুমের স্মরণে আমার সম্পাদিত এবং ইসলাম প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'সত্যের সন্ধানে' শীর্ষক স্মারকের জন্য গৃহীত সাক্ষাতকারে ক'জন শীর্ষস্থানীয় সুধী তাঁর সম্পর্ক যে মন্তব্য করেন তা খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বিচারপতি এ, কে, এম, বাকের

দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিচারপতি আলহাজ্জ এ, কে, এম, বাকের মরহুম মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের ইসলাম প্রসারের ইতিহাসে মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। জন্মগত মুসলমান না হয়েও তিনি ইসলামের খেদমতে যে অবদান রেখে গেছেন তা তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর লেখা বইগুলোতে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব অতি সুন্দরভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো দেশে যখন খৃস্টান হবার জোয়ার এসেছিল তখন তিনি সর্বাপেক্ষা দৃঢ়হস্তে সেটাকে রুখে দাঁড়ান।"

মরহুমের বিভিন্ন অবদানের কথা উল্লেখ করে বিচারপতি বাকের বলেন, "নবাগত মুসলিমভাইদের জন্য ঢাকায় অবস্থিত একটি আশ্রয়স্থল নিউকনভার্টস হোমও তাঁরই নিরলস চেষ্টার ফল।"

"ইসলাম প্রচারের জন্য আমি তাঁকে দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তিনি সর্বদা সহজ সরল জীবনযাপন করতেন।"

বিচারপতি বাকের আরও বলেন, "নিজের জন্য তিনি কিছু করতেন না। যা কিছু করতেন সবই অন্যের জন্য। আমি তাঁকে অত্যন্ত অমায়িক ও ন্যায়নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি।"

"ইসলামের জন্য মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের যে ত্যাগ তা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। নওমুসলিমভাইদের খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার যে অবদান তিনি রেখে গেছেন তা আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে" বলে বিচারপতি বাকের মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আমি তাঁকে দীনীবন্ধু হিসেবে সবসময় পেয়েছি। তিনি আমাকে দীনের খাতিরেই খুব মহব্বত করতেন। আমিও তাঁকে খুব মহব্বত করতাম।"

মরহুমের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "তাঁর সবটুকুই হচ্ছে ইসলাম। আমি তাঁকে একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানি। তিনি ইসলামের জন্য সবসময়ই কাজ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের আজেবাজে ধারণা পোষণে মরহুম ভট্টাচার্য সবসময়ই তীব্র বেদনা অনুভব করতেন।"

মরহুমের আকস্মিক ইন্তেকাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, "হঠাৎ করে আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের মতো ইসলামী ব্যক্তিত্বের চলে যাওয়াতে মুসলমানসমাজের একটি বিরাট ক্ষতি হলো, যে ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য ছিল না। পার্থিব কোনও সুখসুবিধার প্রতি তাঁর খেয়াল ছিলনা। ইসলামের জন্য তিনি জীবনের সবটুকু বিলিয়ে দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।"

মরহুমের সমাজসেবা সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "সহায়-সম্বলহীন নওমুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন। ছুটে বেড়াতেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। তিনি ইসলামের যে আলো পেয়েছেন তা সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তীব্র অস্থিরতা অনুভব করতেন। শুধু তাই নয়, নওমুসলিমদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন এটাই তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সমাজসেবা। মরহুমের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলো অমুসলিমসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে বহুলোক উপকৃত হতে পারবেন। মরহুম ভট্টাচার্য অমুসলিমসমাজের ত্রুটিগুলো যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর লেখনির মাধ্যমে আলোচনা করেছেন তা অন্য কেউ করতে পারেনি।"

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজুর রহমান-এর কাছে মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি যখন ষাটের দশকে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি তখন থেকেই খুব সাদামাঠাভাবে আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার দিন-তারিখ অবশ্য এখন আমার মনে নেই। তবে সেদিন এমন একটি ঘটনা ছিল যেখানে তিনি কিছু বলছিলেন আর আমি শুনছিলাম।"

"তাঁর কথাগুলো বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কেন জানি তাঁর সুন্দর কথাগুলো আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল সেদিন। আমার ঔৎসুক্য মন যে-ধরনের কথা খুঁজে বেড়ায় সেদিন ঠিক সে ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কথাবার্তা আমার খুবই ভালো লেগেছিল। আমি এমন একজন মানুষের খোঁজ করতাম যে মানুষটি সৎ হবে, সরল হবে, ভেতরেবাইরে এক হবে; তারপর পরের উপকারের জন্য যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত থাকবে। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলবে। ভয় বা ভীতি, প্রলোভন বা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সত্যপথ থেকে সরিয়ে দেবেনা এমন ধরনের একটা চরিত্র যদি মানুষের চরিত্র হয় তাহলে তেমনি একটি চরিত্রের তালাস আমি করি; যেটি আমি আবুল হোসেন হোসেন ভট্টাচার্যের মধ্যে পেয়েছি।"

মরহুমের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "মরহুম ভট্টাচার্য ইসলামের জন্য কাজ করেছেন। দলগত আকর্ষণ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক তাঁকে ভালোবাসতো।"

ড. মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, "যিনি হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজ থেকে এসে ইসলামী সমাজে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু সমাজের কাছে তিনি কিছু পাবার আশা করেননি। তিনি যা চাইতেন তা সমাজের জন্য; মিল্লাতের জন্যই চাইতেন।"

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর মাধ্যমে মরহুমের রচনাবলী প্রকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগ নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "এতেকরে একজন গুণী ব্যক্তির প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করা হবে, ঠিক তেমনি দেশ ও দশেরও যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে।"

আবুদ ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

ডি. আই. টির চেয়ারম্যান জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া বলেন, "ব্যক্তিগত জীবনে যে-কজন ইসলামী আখলাক আকিদা পালনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের প্রতিফলন দেখেছি। তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক। তিনি মানুষের সুখে সুখী ও মানুষের দুঃখে দুঃখী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আর এজন্যই ছিলেন তিনি বাতিব্যস্ত। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ইসলামের জন্য শশব্যস্ত হয়ে সবসময়ই ছুটে বেড়াতেন। তিনি সমাজসেবার ব্যাপারেও প্রথম

শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম ও সমাজের খিদমতের জন্য তিনি তাঁর জীবনের সর্বস্বত্যাগ করেছেন।"

জনাব ইয়াহিয়া আরও বলেন, "আল্লামা আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের ন্যায় ব্যক্তিত্বের আকস্মিক অন্তর্ধানে ইসলামী খিদমতের গতি যথেষ্ট পরিমাণে শ্লথ ও মন্থর হয়ে পড়েছে।"

মোস্তফা আলী কাশতকার

কৃষিতথ্য অধিদফতরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা আলী কাশতকার মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "কয়েক বছর খুব কাছ থেকে মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্যকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার কোথাও কোনও ফাঁক বা ফাঁকি ছিলনা। কোনও কাজের ব্যাপারে যতখানি আশা করতাম তাঁর চেয়ে ভালো, সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তিনি তা সমাধা করতেন। আস্থা হারানোর কোনও সুযোগ দিতেন না। তাঁর মধ্যে জানবার ও বুঝবার তীব্র পিপাসা সবসময়ই লক্ষ্য করেছি।"

"তাঁর মধ্যে মাতৃভক্তি ছিল খুবই নিবিড় ও গভীর। কারণ ইসলামগ্রহণের পরও তাঁর অমুসলিম মায়ের কাছে টাকা-পয়সা পাঠাতেন। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলামগ্রহণ করেছে তাদের ইসলামী তালিম-তরবিয়ত, পুনর্বাসন ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদাব্যস্ত। এছাড়া মরহুম ভট্টাচার্যসাহেব ছিলেন একজন সুবক্তা ও সুলেখক। তাঁর বক্তৃতা মানুষ যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন ঠিক তেমনি তাঁর লেখনিও সর্বশ্রেণীর পাঠকের মন কেড়ে নিতো।"

খলিলুর রহমান আনওয়ারী

জমঈতুল উলুম মাদরাসা ও ইয়াতিমখানা (দিনাজপুর)-এর অধ্যক্ষ জনাব মওলানা খলিলুর রহমান আনওয়ারী বলেন, "মরহুম মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চালচলন ও কথাবার্তা ছিল খুব সহজ ও সরল। সাদাসিধাভাবে জীবনযাপন করতে তিনি পছন্দ করতেন। দাম্ভিকতা ও অহংকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর অন্তর দয়ায় ভরপুর ছিল। গরিব-

দুঃখী ও এতিমদের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর লেখনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ধারালো ছিল।"

শামসুর রহমান

বাংলাদেশের পাবলিকেশনস লি.-এর ম্যানেজিং ডাইরেকটর জনাব শামসুর রহমান বলেন, "মরহুম ভট্টাচার্যসাহেবকে একজন উত্তম মানুষ হিসেবে দেখেছি। তাঁর অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তিনি খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আদর্শ কবুল করবার পর নিশ্চুপ থাকেননি। ইসলামের মধ্যে যে মাধুর্য তিনি দেখতে পেয়েছেন তা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। সমাজের দুঃখী ও অভাবী মানুষের অবস্থা জানলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন এবং নিজের সাধ্যমত উপকার করতে কখনও দ্বিধা করতেন না। আদর্শ প্রচারে তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কখনও তাঁকে আলস্যপরায়ণ হতে দেখা যায়নি। নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র পরওয়া করেননি। নিজের জন্য কোনও সম্পদ যোগাড়ে মনোযোগ না দিয়ে বরং যা পেয়েছেন সবই ইসলামের জন্য কুরবান করে গেছেন।"

মুস্তাফা ইয়াসীন খান

সিনিয়ার স্বাস্থ্যশিক্ষা অফিসার (রংপুর) জনাব মুস্তাফা ইয়াসিন খান বলেন, "মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য কোনও অন্যায় বরদাশত করতে পারতেন না। তিনি জীবনে কোনও অন্যায় করেছেন বলে আমার জানা নেই। নীতিগতভাবে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হলে তিনি তা এড়িয়ে চলতেন। তাঁর একটিই অহংকার ছিল সেটি হচ্ছে, তিনি ইসলাম পৈতৃক সূত্রে পাননি, অর্জন করেছেন। তিনি অত্যন্ত সদালাপী ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। চিরাচরিত বাংলাদেশের ইসলামী সমাজের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হতো না।

ইসলামী সমাজসেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। নওমুসলিমদের পুরাপুরি মুসলমান করে গড়ে তোলার দিকে তাঁর নযর ছিল। বাংলাদেশের ইসলাম সম্পর্কে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের ভুল ধারণা নিরসনে তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁকে Reformer বললে ভুল হবে না। তিনি তাঁর সমাজ ত্যাগ করবার পর অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিছুতেই তিনি দমেননি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সববাধা অতিক্রমে সচেষ্ট ছিলেন।"

মোতাহার আলী

"আদর্শ মানুষ বলতে যেসব গুণের প্রয়োজন তাঁর মধ্যে সবগুলোই বর্তমান ছিল। তিনি নবী করিম (স)-এর একজন পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। কখনও কোনও অবস্থাতেই ইসলামের খেলাফ বা নবী (স)-এর আদর্শ থেকে কাউকে বিচ্যুত হতে দেখলে প্রতিবাদ করতেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। অল্প খেতে এবং সাদাসিধা জীবনযাপন করতে ভালোবাসতেন।"

ওপরের কথাগুলো বলেছেন ইসলাম প্রচার সমিতির কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য পুলিশ অফিসার মোতাহার আলীসাহেব।

আলহাজ্ব বদরে আলম

ইসলাম প্রচার সমিতির সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব আলহাজ্ব বদরে আলম মরহুম মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "তিনি একজন সৎ, সরল, ধৈর্যশীল, দয়াপরবশ ও আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি ছিল।"

জনাব আলম আরও বলেন, "মরহুম ভট্টাচার্যের খুবই সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

মরহুমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলতে গিয়ে জনাব আলম, বলেন, "১৯৭৮ সালে রাবিতার দাওয়াতক্রমে মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এবং আমিসহ সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল হজ্বে যাই। এদলে কবি আল মাহমুদ ছিলেন। কোনও এক ঘটনার ব্যাপারে মাহমুদ সাহেবের ওপর ভট্টাচার্য সাহেব কিছুটা মনোক্ষুন্ন হন এবং পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেন। এতে মাহমুদ সাহেবও কিছুটা মনখারাপ করেন। আমি এবং অন্য সঙ্গীরা যখন মাহমুদ সাহেবের মনখারাপের কথা ভট্টচার্য সাহেবকে জানাই তখন তিনি তর্কে না গিয়ে আকস্মিকভাবে মাহমুদ সাহেবকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং আবেগ-আপ্লুত হয়ে মাফ চান। অন্যের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য তাঁর এ আকুলতার কথা আজ আমাদের মনে পড়ে।"

"সমাজসেবামূলক কাজে তিনি খুবই উৎসাহী ও তৎপর ছিলেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য তিনি শারীরিক অসুবিধা ও পথের দূরত্ব উপেক্ষা করে চলতেন।"

"তাঁর লেখনির মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন ও ঘটনাবলি থেকে যেসব উদাহরণ সংগ্রহ করে অন্যের কাছে সুন্দর ও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখনিয় মধ্যে আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার রয়েছে।"

ইসলামের জন্য মরহুমের ত্যাগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব আলম আরও বলেন, "নিজের জীবনের সবকিছুই তিনি এ জন্য কুরবান করেছেন। এ ব্যাপারে আরও উল্লেখযোগ্য যে, চাকুরিজীবনে তিনি যেমন ইসলামের খিদমতের বিনিময়ে কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না। ঠিক তেমনি অবসরজীবনেও ইসলাম প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেও বিনিময় হিসেবে কোনওরকম পারিশ্রমিক বা ভাতা গ্রহণ করতেন না। এমনকি কোনও লোক তাঁকে পারিশ্রমিক বা রাহা-খরচ হিসেবে কিছু দিলে তাও তিনি নিজে না নিয়ে সমিতির তহবিলে দিয়ে দিতেন।"

ভেলেরিয়া বোরোচভা

রুশরমণী ভেলেরিয়া বোরোচভা ২০ বছরের অধিককাল আগে ইসলাম-গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর কুরআনের অনুবাদকে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা অন্যতম সেরা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করছেন। তিনিই এগিয়ে এসেছেন রাশিয়ায় কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রে অনেক গবেষক ও বিজ্ঞজনের মৃত্যুজনিত অভাব পূরণে।

ভেলেরিয়া বোরোচভা

ভেলেরিয়া বোরোচভা (Valeria Borochva) নিজের কুরআন অনুবাদ সম্পর্কে বলেন, "পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত আমাকে তার প্রেমিক বানিয়েছে আর এ ভালোবাসাই আমাকে তা রুশভাষায় অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে।"

ভেলেরিয়া বোরোচভা কিন্তু কোনও আলেম বা ইসলামবিশেষজ্ঞ নন। ইসলামের আইনশাস্ত্র বা ফিকাহ বিষয়েও তিনি কোনও ডিগ্রিধারী নন। হ্যাঁ, তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি রুশভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০ মিলিয়ন মুসলমানের জন্য যা এক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বর্ণিত ও প্রশংসিত হচ্ছে।

আল-আরাবিয়া ডট নেটকে দেয়া সাক্ষাতকারে তিনি তাঁর রুশভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুবাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমার স্বামী সিরিয়ার দামেস্ক শহরে বসবাসকারী এক আরব। তার সঙ্গে আমি ১০ বছর কাটাই দামেস্কে। এর আগে আমি আরবি জানতাম না। সেখানেই আরবি শিখি। আরবি শেখার পর সেখানে আমি একটি আরবি-রুশ অবিধান রচনা করি।"

তিনি আরও বলেন, "আমার শ্বশুর একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর একটি বড় লাইব্রেরি ছিল। সেখানে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি আমি পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কুরআন তরজমায় মনোনিবেশ করি। দামেস্ক থেকে

প্রত্যেক বছর মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি গবেষণা একাডেমির উদ্দেশে সফর করতাম। একাডেমিতে ছিল একটি অনুবাদ দফতর। ১০ পারা অনুবাদ সম্পন্ন করবার পর একাডেমির আলেমরা পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করেন। আরবি ও রুশভাষা জানা তিন বিজ্ঞ আরব ও দুই রুশ আলেম সদস্যের এ কমিটি খুব ভালোভাবে আমার তরজমা পর্যবেক্ষণ করেন।" বোরোচভা উল্লেখ করেন, "প্রথমে এ বোর্ড তাঁর তরজমা সম্পর্কে অনেক টীকা যোগ করেন। পাশাপাশি তাঁরা অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। তাঁরা বলেন, অনুবাদ হয়েছে প্রথম শ্রেণীর। এ কারণেই আমরা এর অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন চালিয়ে যেতে পারছি। এর মধ্যে যদি অনেক ভুলভ্রান্তি পেতাম তবে পর্যবেক্ষণে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারতাম না। প্রতিবারই তাঁরা অনুবাদ সম্পর্কে বৈঠকে বসতেন এবং এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করতেন।" তিনি জানান, "তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে সিরিয়ায় বসবাসের সুবাদে তা সহজেই ডিঙ্গানো সম্ভব হয়েছে। সিরিয়ার সাবেক মুফতি শায়খ আহমদ কিফতারো এবং তাঁর ছেলে শায়খ মাহমুদ কিফতারো সবসময় তাঁকে সাহায্য করেছেন। অনুপ্রেরণা এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।" তিনি বলেন, "আমি প্রতিনিয়ত অনেক বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছি। প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। তেমনি ড. যুহাইবির সাহায্য নিয়েছি, যার কাছে কুরআনুল কারিমের তাফসির সংক্রান্ত অনেক কিতাব ছিল।"

তিনি যোগ করেন, "বহু আলেম আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি ভেলেরিয়া যদি একা একা বসে থাকতাম, তাহলে কুরআনের তরজমায় অনেক ভুল হতো।" নিজের ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভালোবাসাই আমাকে ইসলামে দাখিল হতে প্রেরণা ও চেতনা জুগিয়েছে। আমার বিশ্বাস, খোলা মন নিয়ে যিনিই এ কুরআন শেষপর্যন্ত পড়বেন, শেষাবধি তাঁকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলতেই হবে।"

অনুবাদের মুদ্রণ ব্যয় সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, "শেখ জায়েদ বিন সুলতান (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত করেন) আল-আজহার একাডেমির কাছে একটি চিঠি পাঠান, তরজমা যথার্থ হয়েছে কি না তিনি তা জানতে চান। নিশ্চিত হবার পর ২৫ হাজার কপি অনুবাদ ছাপার খরচ বহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন শেখ জায়েদ। এপর্যন্ত অর্ধ মিলিয়ন কপি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। সউদি আরবের শাযখ খালেদ কাসেমিও অনেক কপি ছাপিয়েছেন। লিবিয়া ও কাতার থেকেও এর অনুবাদ ছাপা হয়েছে।"*

* ইন্টারনেট, দৈনিক আমার দেশ, ৯/১২/২০১১

কে এল গাউবা

প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ী কে এল গাউবা বলেন, "হিন্দুধর্ম জীবিতদের জন্য মোটেও মাথা ঘামায় না; ওই ধর্মের অনুসারীরা বরং পুনর্জন্মে আস্থাশীল। কিন্তু ইসলামে ঈমান আনবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সমস্ত জাতির নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র প্রভাবশীল শক্তি। আমার পরিবারের ইসলামগ্রহণ উপলক্ষে আপনারা যে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার যে সুযোগ দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় প্রদান করেছেন সেজন্য আমার সারামন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্য থেকে আমাকে ইসলামে দাখিল হতে দিয়ে সত্যের মহত্তম পথে অগ্রসর হবার জন্য সুযোগ করে দিয়ে সবার সামনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্র ও অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেজন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মানবশিশু জন্মমুহূর্তে প্রায় সবদিক থেকেই নির্মল ও পবিত্র থাকে। তখন তার হাড়মাংস থাকে অপরিণত, কিন্তু গোলগাল চেহারার মধ্যে থাকে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত একখানি হাসিমাখা মুখ। সে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়; ঘ্রাণ ও আস্বাদনের ক্ষমতাও তার থাকে। কিন্তু তার মধ্যে কোনও বুদ্ধিজ্ঞানের পরিচয় থাকে না। কিছুকাল পর্যন্ত সবাই–সবকিছুই তার কাছে অভিন্ন বলে মনে হয়। পরে আস্তে আস্তে সে তার পিতামাতাকে চিনতে শুরু করে; এটা ওটা করে সমস্ত কিছুর ভিন্নতা বুঝতে থাকে এবং জীবনের বৈচিত্র্য অনুভব করতে শুরু করে। অনুরূপভাবে একজন বয়স্ক মানুষেরও আধ্যাত্মিক শৈশব থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ধীরে ধীরে বহু বছরের জাগ্রত সাধনার মাধ্যমেই সেই মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের মোকামে পৌঁছানো সম্ভব।

আমি জানি, আমরা ইসলামকবুল করবার পরে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে (উল্লেখ্য, কে এল গাউবা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষিত

হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক)। এ ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও আক্রোশ যে গোটা সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রসূত–এমন কথা আমি মানতে রাজি নই। তবে হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলো একটা বিষয়ে অভ্রান্ত যে, আমি কস্মিনকালেও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলাম না। আমার কাছে ধর্মের ব্যাপারটিই ভিন্নরকম অনেকটা সংস্কারের বশে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার মত। এ ধরনের মনোভাব সম্পর্কে একেক জনের অভিমত একেক করম। আমার ব্যাপারে অবশ্য কথা উঠেছে যে, আমি দুনিয়াদারির উন্নতি চাই বলেই মুসলমান হয়েছি; কেউ কেউ বলেছেন যে, আমার মুসলমান হওয়াটা নাকি প্রেমের মোহ। অন্যদিকে অনেকে এও মনে করতে ছাড়েন না যে, আমি বিপথগামী হয়ে পড়েছি। কিন্তু কিভাবে আমি কাকে বোঝাবো যে, অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে প্রেরণা আসে তা তর্কের বাক-বিতণ্ডায় ব্যাখ্যা করা যায় না। তেমনি খালি-যুক্তির ওপরেও তাকে দাঁড় করানো যায় না।

আমি যখন মিসরে ছিলাম তখনই আমি ইসলামী কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হই। যতই বছর পার হয়েছে, সেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যখনই আমি কোনও মসজিদের পাশ দিয়ে যেতাম, তার মহিমাময় গাম্ভীর্যের গভীরতা যেন আমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তির আহ্বান জানাতো। আমি মুগ্ধ ও বিমোহিত চিত্তে অভিভুত হয়ে পড়তাম। আমি যেন মসজিদের গম্বুজের ডাক শুনতে পেতাম; মনে হতো প্রতিটি গম্বুজ যেন আমাকে ঈমানদারদের কাতারে শামিল হবার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। মনে হতো, ওই ডাকে সাড়া দিলে আমি যেন পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার হৃদয় উজাড় করে দিতে পারতাম। জগত যদি জানতে চায়, কেন আমি সমস্ত মতাদর্শ বাদ দিয়ে ইসলামকবুল করলাম, তাহলে তাকে জানাবার জন্য আমার বক্তব্য এটাই। তার পরও যদি কেউ এর ব্যাখ্যা দাবি করেন, তাহলে তাঁর জন্য আমি আমার নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করতে পারি।

১. প্রথমত, ইসলামের সারল্য ও ঔদার্য। মাত্র দুটি সাধারণ শর্তের ওপর ইসলামের গোটা বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। এ শর্ত দুটি এতই সহজ ও সরল যে, সাধারণ বুদ্ধির মানুষও তা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শর্ত দুটি হলো : আল্লাহর একত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত। একত্ব সেই আল্লাহর, যিনি কারুর জাত কিংবা জন্মদাতা নন। যাকে দু'জন উপ-দেবতায় ভাগ করা সম্ভব নয়; যার কোনও আকৃতি কাদামাটি দ্বারা তৈরি করবার কিংবা পাথরে খোদাই করবার কথা কল্পনাও করা যায় না।

২. ইসলামের প্রতি আমার ঝুঁকে পড়বার দ্বিতীয় কারণ হলো ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ, এর গণতান্ত্রিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সাম্যবাদ

সমাজতান্ত্রিক বা বলশোভিকিজমের সাম্যবাদের মতো নয়। সর্বহারাদের জন্য চিন্তাশীলদের ধ্বংস করবার নীতি ইসলামী সাম্যবাদের বিরোধী। তাছাড়া যে ধর্মে সাদা চামড়ার মেয়েদের প্রতি তাকাবার অপরাধে নিগ্রোদের বিনাবিচারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং যে ধর্মে শ্বেতাঙ্গরা আল্লাহ্‌কে আলাদা করে নিয়ে পূজা করবার জন্য নিজেদের মনগড়াভাবে তৈরি করে নেয়, সেই খৃস্টধর্মের সাম্যবাদের সঙ্গেও ইসলামী সাম্যবাদের কোনও মিল নেই। মুসলমানদের যে কেউ ধনী অথবা গরিব, সাদা অথবা কালো, বাদশাহ্ কিংবা গোলাম যেকানও মসজিদে ইবাদত করতে পারেন। এ ঐক্য উল্লেখিত সহজ বিধানসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দীক্ষাগ্রহণের কালে কোনও বাহ্যিক আড়ম্বরের বালাই ইসলামে নেই। শুধুমাত্র কালেমা পড়ে নিয়ে উক্ত দুই প্রধান শর্তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবার কথা ঘোষণা করলেই যেকোনও মানুষের সামনে বিশ্বের মহত্তম ভ্রাতৃত্বের সিংহদ্বার তার সামনে খুলে যায়, যে ভ্রাতৃত্বের পরিচয় শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবেও সেখানে সকল মানুষ সমান। দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেকোনও নওমুসলিম যেকোনও রাজা-বাদশাহ্‌র সঙ্গে একই মুসল্লায় সালাত আদায় করবার অধিকার পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সে একই দস্তরখানায় খানপিনায় শরিক হতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে এই যে মহত্তম ভ্রাতৃত্ববোধ বিরাজ করছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও কি তার সন্ধান মিলবে?

৩. আধুনিক অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুখের বিষয়, ইসলামে অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নেই। মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্য সেখানে অনুপস্থিত। হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ বর্তমানে 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের জাতে ওঠাবার অর্থাৎ অপবিত্রকে পবিত্র করবার দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু দুটি কারণে এ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। প্রথম যে হিন্দু সে জন্মগত-ভাবেই হিন্দু। তাকে তৈরি করা হয় না বা তৈরি করা যায় না। কেননা সে শুধু হিন্দু হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে না; তার গোত্রের পরিচয়েও সে পরিচিত হয়। সে জন্য গোড়াতেই বলেছিলাম, হিন্দুধর্ম শুধু মৃতের পুনর্জন্মেই বিশ্বাসী– জীবিতদের নয়। কোনও শুদ্র যেমন ক্ষত্রিয় হতে পারে না, তেমনি কোনও ক্ষত্রিয়ও কখনও ব্রাহ্মণ হতে পারে না। খুব জোর রাজনৈতিক বা আধা-রাজনৈতিক কারণে কিংবা মহাত্মা গান্ধীকে তার আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করবার স্বার্থে অস্পৃশ্য ও অচ্ছুতদের বরদাশত করা যেতে পারে। এমনকি 'শুদ্ধি'র পরেও কোনও অস্পৃশ্যের পক্ষে উচ্চবর্ণের হিন্দুর স্বীকৃতি লাভ সম্ভব না।

পবিত্রতার বিষয়টাকে শুধুমাত্র প্রচারণার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য বা জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়। বরং অনুরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় মাত্র। ধর্মান্তর বা চরিত্র সংশোধন এমন একটি ব্যাপার যা সরাসরি পরম স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে কোনও মানুষই দম্ভসহকারে বলতে পারে না যে, আমি অপর মানুষকে পবিত্র করবার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। এ রকম পবিত্রতার দাবি যিনি করবেন, তারই প্রথম পবিত্র হওয়া উচিত।

ইসলামের মতে, ঈমান আনবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। তার নিজেই হৃদয়মনের সমস্তকিছু স্থির করে নিতে হয় সর্বশক্তিমানের সামনে। এরই প্রেক্ষিতে আমি আজ অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যদের কাছে বাণী পৌঁছে দিতে চাই যে, তাঁরা আজ চিন্তা করে দেখুন, কোথায় তাঁরা নির্ভয়ে নির্বিবাদে সবকিছু স্পর্শ করবার অধিকার পাবেন? কোথায় সকলে তাঁদেরও নিসংকোচে ও নির্দ্বিধায় স্পর্শ করতে পারবেন? কোথায় তাঁদের ছায়া পড়লেও খাদ্যবস্তু অপবিত্র হবে না। কোথায় যোগ্যতার বলে সমাজের যেকোনও স্তরে উঠতে কোনও বাঁধা নেই? কোথায় শুধুমাত্র সুকর্মের তুলাদণ্ডে মানুষের সম্মান ও প্রতিপত্তি যাচাই করা হয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর প্রতিটি প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব আর তা হলো ইসলাম। এখন অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্যরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখুন, সেই ইসলামের উদার উন্মুক্ত ধর্মালয়ে তাঁদের পক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করা উচিত কিনা?

৪. আমার ইসলামগ্রহণের চতুর্থ ও সর্বশেষ কারণ হলো, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যুগের দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার ব্যাপারে ইসলামের অপূর্ব উপযুক্ততা। আধুনিক কালের সমস্যাদির মোকাবেলা করবার ক্ষমতা অন্য কোনও ধর্মের নেই। আজকের দুনিয়া হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের দুনিয়া। এ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের পরম পূর্ণতা ঘটেছে শুধুমাত্র ইসলামে। প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজ আবার নতুন করে নারীদের মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবি শুনতে পাই। অর্থাৎ বিবাহিত জীবন আজ কেলেংকারিতে ভরে উঠেছে। অথচ ইসলাম পরিপূর্ণভাবে নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামের মতে, বিবাহ হচ্ছে একটি সুস্থ ও সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক।

ইসলামী আইন-কানুন তৈরি হয়েছে ফেরেশতাদের জন্য নয়, মানবজাতির জন্য। হৈ হুল্লোড়, বেলেল্লাপনা, ঝগড়া-ফাসাদ, ব্যভিচার, অবিবাহিত মাতৃত্ব ইত্যাকার সমস্যা আজ আধুনিক বিশ্বের ঘরে ঘরে। অথচ এ আধুনিক বিশ্বই ধর্মকে একটি অপার্থিব মত ও পথ বলে গণ্য করে। আবার এই আধুনিক বিশ্বেরই অনেকে চান সত্য, বিশ্বাস, সততা প্রভৃতি সদগুণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রূপায়িত হওয়া উচিত। অথচ এ ধারণার বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে একমাত্র ইসলামেই । তাই বর্তমানে যেখানে গির্যাসহ অন্যান্য উপাসনালয় শূন্য হয়ে পড়ছে, সেখানে মসজিদগুলো ভরে উঠছে বিশ্বাসী মানুষের ভীড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের ইহ ও পারলৌকিক ইতিবাচক ও আর্থিক উন্নতি আর প্রগতির মহত্তম পন্থা হচ্ছে ইসলাম। এ যে মহান সামাজিক ভ্রাতৃত্ব, শত শত বছর পূর্বে যার সূচনা ও পরিকল্পনা করে গেছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। আসুন আমরা সবাই মিলে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিজেদের নিয়োজিত করি, উৎসর্গ করি। পরিশেষে আমি আবারও এ ভেবে আনন্দ প্রকাশ করছি যে, আমি সত্য সত্যই আপনাদের মধ্যে শামিল হতে পেরেছি। বিষয়টি আমার জন্য গর্বের এবং গৌরবের। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ইসলামের খিদমতে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকবার তওফিক দান করেন।*

---

* কেএল গাউবা (বার. এল ল')-এর আগের নাম কানাই লাল গাউবা। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী। পিতা দিল্লির প্রখ্যাত শিল্পপতি। গাউবা পরিবারসহ ইসলামগ্রহণ করলে সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুসলমান হবার পর তিনি খালিদ লতিফ গাউবা নামধারণ করেন। ১৯ মার্চ– ১ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে আসামের গোহাটি থেকে প্রকাশিত অসমীয় ভাষার সাপ্তাহিক 'মুজাহিদ'-এ 'মই কিয় ইছলামগ্রহণ করিছো' শিরোনামে গাউবার বক্তব্য ছাপা হয়।—গ্রন্থকার

বশির পিকার্ড

রক্তে ইংরেজ ও ফরাসি সংমিশ্রণ রয়েছে। জন্ম ৩১ জুলাই ১৮৮৯ ঈসায়ী সালে। ভাষা ও সাহিত্যে তিনি অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯১২ সালে কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বিভিন্ন ঘাত-সংঘাতময় জীবনযাপনের পর সরকারি চাকুরিগ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পদত্যাগ করে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে পুনরায় শুরু করেন অধ্যয়ন। ১৯২২ সালে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। বশির পিকার্ড একজন খ্যাতনামা কবিও। ইসলাম সম্পর্কে তিনি বলেন :

'ইসলাম' হলো সেই ধর্মের সত্যিকার নাম, বিভ্রান্তিকরভাবে যাকে পাশ্চাত্য জগত কর্তৃক 'মুহাম্মদীয় ধর্ম' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামের অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ। এর আরেক অর্থ হয় শান্তি, যে শান্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের মারফত হাসিল হতে পারে।

'আল্লাহ্' আরবি শব্দ, যার অর্থ একমাত্র উপাস্য, অন্য কোনও শরিক যার নেই। আজকের যুগে, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও এ মূল শিক্ষা পাশ্চাত্যের সাধারণ জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। মুহাম্মদ (স) একই সঙ্গে ছিলেন পয়গম্বর এবং মানুষ। ভুলবশত তাঁকে 'মোহামেট বা মোহাম্মেদ' বলা হয়ে থাকে। অলৌকিকতার দাবি তিনি কোনও দিনই করেননি। ওপরন্তু নিজের মানবিকতার ওপরে করেছেন গুরুত্ব আরোপ। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি যারা আত্মসমর্পিত তারাই হলো মুসলমান। তারা তাদের রসূলের অলৌকিকতার দাবিদার নয়। রসূলুল্লাহর মতো তারাও তাঁকে মানুষ বলেই মেনে থাকে। সেজন্যই মুসলমানেরা মুহাম্মদ (স)-এর পূজা থেকে বিরত। তাদের সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর নিমিত্তে। তারা বরং রসূলুল্লা (স)-এর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য আল্লাহর শান্তি ও রহমত প্রার্থনা করে থাকে।

পাশ্চাত্যে একটা ধারণা রয়েছে যে, ইসলাম হলো মুহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন এক ধর্ম। এ ধারণার ভুল। আসলে ইসলাম ছিল আদম, ইবরাহিম, মূসা এবং বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে উল্লেখিত সকল নবী-রাসূলের ধর্ম।

যিশুখৃস্টের ধর্মও ছিল ইসলাম। মুহাম্মদ (স) তাঁর নবুয়তের গুনে লুপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত এ ধর্মের পুনরুজ্জীবন দান করেছেন। মুহাম্মদ (স) সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে বাণী প্রচার করে গেছেন, তা হলো : আল্লাহ এক, তাঁর কোনও শরিক নেই; কোনও সাহায্যকারী নেই। তিনি ছাড়া বন্দেগির উপযুক্ত আর কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহ্‌রই বন্দেগি আমাদের করতে হবে।

এবারে আসুন, ইসলামকে আমরা যাচাই করে দেখি। দু'ভাবে আমরা এ কাজ সমাধা করতে পারি। এক. মতবাদের দিক থেকে; দুই. এর কার্যকারিতা বিবেচনা করে। প্রথমেই ধরা যাক, ইসলামের বিশ্বাসের সরলতার কথা। ইসলামের বিশ্বাস : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই, মুহাম্মদ তাঁর রসূল)। প্রথমেই আল্লাহর কথা–যার উদ্দেশে সকল প্রশংসা; এবং তিনি এক; দ্বিতীয়ত মুহম্মাদের কথা— আল্লাহর রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু–আল্লাহ্ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। জীবনের ধারা জটিল, সে চায় সহজ উপলব্ধি, বুঝবার জন্য ইসলাম তাই তার সৌন্দর্য ও আল্লাহর একত্বকে কত সহজে প্রকাশিত করেছে। আল্লাহ্ এক; তাঁর কোনও অংশিদার বা শরিক নেই। কোনও সমকক্ষ কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই তাঁর। কোনও কিছুই আল্লাহর মত নয়। আল্লাহ্‌র একত্ব তাঁর স্থায়িত্বের মতোই সুদৃঢ়। সকল সৌন্দর্য, সকল শক্তি, সকল জ্ঞান তাঁরই অধিকারে। এখন দেখুন, এ বিশ্বাসের পটভূমি কত সরল ও সহজ। আমাদের সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে যিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু এবং দয়াবান। কোনও ঋষিদরবেশ, কোনও পীর-পয়গম্বর বন্দেগির উপযুক্ত নয়। কেননা একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্। সকল কিছুর যিনি স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, সারা দুনিয়ার তিনি প্রভু; তিনিই শ্রবণকারী এবং জবাব দানকারী।

এখন হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা এ নশ্বরদেহি মানুষ কী করে আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতে পারি? তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি বা তাঁর ওপর নির্ভরশীল হতে পারি? আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হতে পারে (তাঁর দয়া এব ইচ্ছানুসারেই) একমাত্র গভীর সাধনা ও জীবনের গভীর অনুধ্যানের দ্বারা। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে; জীবনের দুঃখদুর্দশা ও আনন্দঘন মুহূর্তেও এ পর্যাবেক্ষণ থেকে বাদ থাকা চলবে না। সর্বোপরি থাকবে আল্লাহর শরণ। এ সমস্তের মারফতও আমরা আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং এ উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের মূল ভিত্তি।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সর্বোত্তম অবদান তাঁর রহমত। আল্লাহর এ অযাচিত ও অকৃপণ রহমতের দৌলতেই মানবিকতার ধারা প্রবাহিত। যার চোখ আছে দেখবার মত, হৃদয় আছে বুঝবার মত, সে-ই অনুভব করতে পারবে আল্লাহ্‌র এ রহমত এবং তারই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে : সকল প্রশংসা তাঁর, যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াশীল।

আল্লাহ্‌র আরেক রহমতের প্রতিও মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। সে হলো, সংশোধনার্থে শাস্তিদান। জীবন ও জীবনের দুঃখ-কষ্ট যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখবো, আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করবার অর্থই হলো তাঁর রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা এবং তারই পরিণতি ডেকে আনে আল্লাহ্‌র গজব। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা কি আল্লাহ্‌র গজবেরই প্রতিফল নয়? আল্লাহ্‌ একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন; এ সীমানার আওতাধীন জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষ ও সৃষ্ট জিনের প্রতিই তাঁর রহমত বর্ষিত হচ্ছে অবিরাম। কিন্তু সীমানার এ গণ্ডি অতিক্রম করবার অর্থই হবে তাঁর গজবের পথে পাড়ি জমানো। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সত্যপথ প্রদর্শনকারী।

এখন আসুন আমরা আমাদের বক্তব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফিরে যাই। এ অধ্যায় ইসলামী ঈমানের দ্বিতীয় অধ্যায়ও বটে।

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।

এ ঘোষণা হচ্ছে ইসলামের কার্যকর দিকের প্রকাশ। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে রাসুলুল্লাহ্‌র কাছে কুরআন নাযিল হয়েছিল। এ কুরআনের মারফত সত্য প্রকাশিত হয়েছিল বিস্তারিতরূপে। সত্যের পথে কিভাবে চলতেফিরতে হবে, তা পুস্তকে এত চমৎকার ও এত সুবিন্যস্তভাবে আলোচিত হয়েছে যে, চক্ষু-কর্ণের অধিকারী হৃদয়বান কোনও ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ্‌র রহমতের সত্যিকার স্বরূপ অনুধাবন করতে ভুল হবার কথা নয়। এ ঘোষণা ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তিও বটে।

আল্লাহ্‌র রাস্তা বলতে আমরা কি বুঝি? সে রাস্তার আরেক নাম হলো সালাত বা নামায। কোনও ঋষি-দরবেশ, পীর পয়গম্বরের বন্দেগি নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগি ইসলামে নির্দেশিত হয়েছে। নামাযের গুরুত্ব ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে এবং তার জন্য সময়ও দেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট করে— যেন আল্লাহ্‌র শরণ নতুন প্রাণ খুঁজে পায় এবং এ জন্যই দিনেরাতে পাঁচবার যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা নামাযের জন্য নির্দেশিত হয়েছে।

নামাযের পরেই এসেছে রোযার তাগিদ। মুসলমানদের জন্য রোযা ফরজ। যিশুখৃস্ট রোযা করেছেন, রোযা রেখেছেন অন্যান্য নবী-রসূলও। আল্লাহ্‌কে পেতে হলে রোযা বাদ দিলে চলবে না। শরীরের শক্তিনিচয়ের ওপর কে-না অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়? রোযা যেমন দেহের জন্য উপকারী, তেমনি উপকারী আত্মার জন্যও। আত্মার দৃষ্টিতে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়— আল্লাহকে বুঝবার জন্য রোযা তাই বড় সহায়ক।

রসুলুল্লাহ (স)-এর ওপর যে কুরআনে পাক নাযিল হয়েছে, সে কুরআনই হলো ঈমানের আলোস্বরূপ। এ কুরআনে হক ও বাতিলের তফাৎ বুঝিয়ে ঈমানদারকে সত্যের পথে চালিত করে। এখানে ইহজীবন সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। রয়েছে বহু গায়েবি বস্তুর খবর।

ইসলাম যদি জানতে চান, কুরআন পড়ুন। কুরআনের অনেক তাফসির বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবনকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না; পারবেন না ঋষি বা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করতে। বরং সাহসের সঙ্গে জীবনের সমস্যাবলীর মোকাবেলা আপনাকে করতে হবে। কুরআন পড়ুন, দেখবেন কিভাবে মানুষ সংসারধর্ম পালন করেও আল্লাহ্‌র পছন্দমত জীবনযাপন করতে পারে।

দান–খয়রাত এমন এক জিনিস, যা আল্লাহ্ পছন্দ করে থাকেন এবং এর মারফত নর-নারী উভয়ই আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করতে পারে। এ দান-খয়রাতের ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এ দান-খয়রাতের প্রথম হকদার হচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনেরা, যারা গরিব মিসকিন এতিম অথবা বিধবা এবং দুস্থ। কেউ যেন সওয়াল করে বিমুখ না হয়,এ হলো ইসলামের শিক্ষা। এ দান-খয়রাত দু'রকমের : (১) নির্দিষ্ট যাকাত— যা শুধু ধনীদের দিতে হয় ; (২) ব্যক্তিগত দান। গোপন এবং প্রকাশ্যে দু'ভাবে এ দানখয়রাত করা চলে, তবে গোপনীয় দানই উৎকৃষ্ট।

ইসলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও কার্যকর বিধান হলো হজ্ব। বছরে একবার সাধ্যমত মক্কা শরিফ ঘুরে আসবার নামই হজ্ব। এর মধ্যে রয়েছে একনিষ্ঠতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উৎকৃষ্ট নির্দশন। এ ভ্রাতৃত্ববোধ অলীক নয়, স্বপ্ন নয় অথবা ভুয়া আদর্শের গলাবাজি নয় বরং বাস্তব এক সত্য। জাতিবর্ণের গরিমা ভুলুণ্ঠিত হয়ে যায়, ধনী ও গরিবের ব্যবধান হয় বিলুপ্ত। সকল ঈমানদার একই ধরনের শুভ্র পোশাকে আবৃত হয়ে একই লক্ষ্য— সেই কাবা শরিফে এ অনুষ্ঠান পালন করেন। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে একত্রিত হন। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই; সেখানে সবাই এক

পরিবারভুক্ত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হয় ভাই, নয় বোন, পিতা নতুবা মাতা। নিশ্চয় সেই একের দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

এবার উপসংহারে আসা যাক। আমি জানি যে, ইসলাম প্রাচ্যের ধর্ম বলে একে শুধু প্রাচ্যবাসিদের স্বভাব-উপযোগী বলে মনে হয়ে থাকে। আমি এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করি।

এখানে আমার জিজ্ঞাসা যে, শ্রেষ্ঠ ধর্মমতগুলোর কোনটি প্রাচ্যের মাটি থেকে উদ্ভুত হয়নি? জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমঝোতায় মানবজাতি আজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে চিরঞ্জীব, চিরশক্তিমান ও চিরদয়াবান আল্লাহর ইবাদতের মূল্য। লর্ড হেডলি, লেডি এডোলিন করবোল্ড প্রমুখ মনীষীর হজ্ব উদযাপনের মাধমে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামই ইংরেজদের জন্য একমাত্র কার্যকর ধর্ম। ইসলামের প্রতি কেন আমি আকৃষ্ট হয়েছি তার কারণ বহুবিধ। এ স্বল্প পরিসরে সে সবের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

যা হোক, বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করে আমি আমার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পাবো যে, কেন আমি আধুনিক সভ্য দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে আমার ও আমার বংশধরদের জন্য গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।

খৃস্টীয় প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের মধ্যেই আমি লালিত-পালিত হয়েছি। কিন্তু খৃস্টমতবাদ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। একদিন খাজা কামালউদ্দিন সাহেবের Islam and Civilization পুস্তকখানি পড়বার সুযোগ আমার হয়ে গেল।

পুস্তকখানি পড়তে গিয়ে আমার মনে হলো, আমার সকল ধারণা বিশ্বাস ও মতবাদই যেন এ পুস্তকের মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ইসলামের মহান উদারতার তুলনায় খৃস্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা, মধ্যযুগীর ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের তুলনায় সমসাময়িক খৃস্টানদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এবং মুসলমানদের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার এ যুক্তিপূর্ণ মতবাদের তুলনায় খৃস্টানদের যিশুখৃস্ট কর্তৃক পাপমুক্তির যুক্তিহীনতা আমাকে স্বভাবতই ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলো। পরে আমি আরও বুঝতে পারলাম, ইসলামই একমাত্র মতবাদ যা মানবতার পরিপূর্ণ ধারক এবং একমাত্র এ মতবাদের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে পথ দেখানো যেতে পারে। সর্বোপরি একমাত্র এ ধর্মের মাধ্যমে বিনষ্ট করা যেতে পারে ধর্ম ও গোষ্ঠীগত যাবতীয় বৈষম্যের বেড়াজাল। ওকিং-এর মুসলিম মিশনের মারফত আমি রসুলুল্লাহ্ (স) সম্পর্ক আরও অনেক মুল্যবান

তথ্য অবগত হলাম। ওখানকার ইমামসাহেব আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রাবলী ইসলামী বিশ্বাস ও মতবাদ সম্পর্কে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করলো। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার মোকাবেলায় ইসলামের কার্যক্রমের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল এবং এর দু' এক মাস পর আমি নিজেই ইসলামগ্রহণ করে ফেললাম।

আমার সিদ্ধান্ত ছিল সজ্ঞানে; বস্তুর লাভালাভের দিকে দৃষ্টিপাত আমি করিনি। বরং এ নতুন ধর্মকে সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করে আমি পরিশেষে তা গ্রহণ করেছি।

অনায়াসলব্ধ বস্তু যেমন অবহেলায় বিনষ্ট হয়, তেমনি হালকা বিশ্বাসের সিদ্ধান্তও পরিশেষে গুলিয়ে যায়, আমার ধারণা।

সে কারণেই আমি যতদুর পেয়েছি–পাশ্চাত্য লেখকদের লিখিত ইসলাম ও বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কিত যাবতীয় সমালোচনা পড়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। ওইসব সমালোচনার অনেকগুলো পুস্তকই ছিল ইসলামী-বিশ্বাসের প্রতিকূল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বিদ্বেষহীন ও সংস্কারমুক্ত লেখকবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কীয় মতবাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি অনেকে বাস্তবে উদাহরণের সঙ্গে ইসলামী মর্মবাণীর সত্যকেও উপলব্ধিও করেছেন। এভাবেই বেশ কয়েক মাস ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আসল সত্যের সাক্ষাত লাভ আমার ঘটেছে। ঘটনাক্রমে এ সময় আমার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলো ঘটনা আমার এ বিশ্বাসকে সন্দেহাতীত করে তুলেছে। আমার মতো যারা নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে এখনও বিব্রত রয়েছেন, তাদের কাছেই ইসলামের আলোক পৌছানোর ব্রত এখন আমি গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকের মনের গভীরে শান্তির খবর পৌছানোই আমাদের মহান গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যের একমাত্র চাবিকাঠি।*

* সত্য মুক্তি মানবতা, আখতার-উল-আলম সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৩।

লর্ড হেডলি আল-ফারুক

ইসলামগ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল রাইট অনারেবল স্যার রোনাল্ড জর্জ এ্যালনসন। ১৮৫৫ ঈসায়ী সালে ইংল্যান্ডের এক জমিদারঘরে খৃস্টান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুল ও কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি লর্ড সভার একজন সদস্য হন। তিনি বৃটিশ নৌ-বিভাগীয় সামরিক বাহিনীর একজন লে. কর্নেল ছিলেন। পেশাগত দিক দিয়ে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হলেও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিখ্যাত সলিসবারি উইনচেস্টার জার্নালের (Salisbury & Winchester Journals) সম্পাদক এবং কতিপয় প্রখ্যাত গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা 'A Western Awakening to Islam' একটি বহুল প্রশংসিত গ্রন্থ। তিনি ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ১৬ নবেম্বর ইসলামগ্রহণ করেন এবং শেখ রহমতুল্লাহ আল-ফারুক নাম ধারণ করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারত উপমহাদেশ সফরে এসেছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় তাবলিগ সম্মেলনে লর্ড হেডলিকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সম্মানিত করা হয়। তিনি লন্ডনে একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা নিয়ে হায়দ্রাবাদের নিযামের আতিথ্যগ্রহণ করেন। নিযাম তাঁকে মসজিদের জন্য ষাট হাজার পাউন্ড দান করেন। তিনি লন্ডনে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ এবং হায়দ্রাবাদের নিযামের নামে মসজিদটির নামকরণ করেন। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির প্রচারমানসে লন্ডনে 'বৃটিশ মুসলিম

লর্ড হেডলি আল-ফারুক

সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। তিনি ছিলেন সংস্থাটির সভাপতি এবং সদস্য ছিলেন কে, জামাল উদ্দীন, স্যার আব্বাস আলী বেগ, ব্যারিস্টার কে, এন, আহমদ প্রমুখ। ভারত সফরকালে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের উদ্যোগে কলকাতায় তাঁকে সংবর্ধনা করা হয়। তাঁর পত্নী মিসেস পয়যারা ব্যাটন একজন অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং অনেক সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেছিলেন।

শেখ রহমতুল্লাহ্ আল-ফারুক ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে হজ্ব পালন করেন। তিনি ইসলাম প্রচার ও জনসেবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ৭০ বছর বয়সে তিনি মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী।

তিনি তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে বলেন, "আমি একদিন দু-দিন চিন্তাভাবনা করে ইসলামগ্রহণ করিনি। বহু বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার পরই ইসলামগ্রহণ করেছি। এটা আমার জন্য অতন্ত আনন্দ ও উৎফুল্লের বিষয় যে, আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে ইসলামের মিল খুঁজে পেয়েছি। আমি ভেবে বিস্মিত হই যে, ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত মহান, উদার ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ। যিশুখৃস্ট প্রচারিত খৃস্টধর্মের ন্যায়-নীতিসমূহের সঙ্গে ইসলামের নীতির প্রভূত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।"

আমি কোনও মুসলমান কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে ইসলামগ্রহণ করিনি। আমার বহু বছরের সাধনায় চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভের ফলে ইসলামের প্রতি আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বেনামী-পত্রে আমার জীবননাশের জন্য ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমর্পণ করি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য মহান স্রষ্টার মনোনীত দীন ইসলামগ্রহণ করেছি। আশা করি যে, অনেকেই ইহকালীন ও পরকালীন শান্তির জন্য আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।"

তিনি বলেন, "ইসলামের প্রকৃত রূপ যদি প্রচার করা হয়, তাহলে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিমাবিশ্ব এর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি পশ্চিমা-জগতের মানুষ এবং আমি আমার জনগণকে জানি। তারা তাদের মধ্যকার বর্তমান ধর্ম

নিয়ে খুবই ক্লান্ত। তারা ইসলামের মতো একটা ধর্ম খুঁজে ফিরছে। তাদের চিন্তা-ভাবনার ধরণ ইসলামের মতোই। পশ্চিমের একজন চিন্তাশীল মানুষকে যখন ইসলামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হবে, তখন সে চোখে চোখ রেখে তা শুনবে এবং সে বলবে যে, ইসলামের মতো এ-রকমই একটা ধর্ম সে তালাশ করছে। তাই আমাদের উচিত প্রচুর ইসলামী সাহিত্য সব জায়গায় পৌঁছে দেয়া। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন সংস্কৃতি, অগ্রগতি, ভালোবাসা, ধৈর্য ইত্যাদির ওপর প্রচুর বই প্রকাশ প্রয়োজন। সময় এসেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশ্বের প্রচুর জানবার।"

লর্ড হেডলি ২২ জুন ১৯৩৫ সালে লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু মুসলিমজগতই শোকাহত হয়নি; সেই শোক ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপেও। তিনি ছিলেন এক আকর্ষণীয় চরিত্রের মানুষ। ভদ্র, নম্র, বিনয়ী হিসেবে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। আল্লাহ তাঁকে এক উচ্চমানের মূল্যবোধের মানুষ হিসেবে তুলে এনেছিলেন।*

* Islam : Our Choice : প্রণেতা-ইব্রাহিম আহমদ বাওয়ানী, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ১৭-১৯।

জোনাথন ইয়াহিয়া

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থা ত্যাগ করে দলে দলে অমুসলিম শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে শত অপপ্রচার সত্ত্বেও মানুষকে ইসলামের দীক্ষা-গ্রহণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে অনেকে ইসলামগ্রহণ করছেন। ইউরোপে সর্বশেষ যাঁর ইসলামগ্রহণের ঘটনায় খৃস্টানদের মুখ ছোট হয়, তিনি হলেন বিবিস'র ডিজির একমাত্র পুত্র জোনাথন।

জোনাথন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ও আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর সঙ্গে একজন মুসলমানছাত্রের পরিচয় ঘটে। দু'জন থাকতেন একই ফ্লাটে। মুসলমান যুবকটির আচার-ব্যবহার ও নামাযপড়া দেখে জোনাথন মুগ্ধ হতে থাকেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, যে-মানুষ এত সজ্জন, তাঁর ধর্মও নিশ্চয়ই মহৎ। মুসলমান যুবকটির চারিত্রিক মাধুর্য জোনাথনের মন পরিবর্তন করে দিতে থাকে। তিনি যুবকটির কাছে ভিড়তেন না। দূরে দূরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর মন সম্মোহিত হতে পারে। তিনি বুঝতে পারেন যে, দূরে থেকেও যুবকটি তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করছে, কাছে টানছে। শেষবর্ষের মাঝখানে জোনাথন পড়াশোনা বাদ দেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিষয়ে বি, এ, (অনার্স) শ্রেণীতে ভর্তি হন।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও আধুনিক ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ফ্রাংক গোরম্যান একদিন বলেন, "জোনাথন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা রয়েছে। সে এখানে পড়াশোনায় মোটেও আগ্রহী নয়। তাঁর একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।"

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জোনাথন লেখাপড়া ভালো করতে থাকেন। বি, এ, (অর্নাস) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। অতঃপর তিনি ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণ' কোর্সে ভর্তি হন। এর কয়েক সপ্তাহ পর তাঁর মনে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হয়। তিনি মনে করেন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কাজ নিলে তিনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। যে

চিন্তা, সেই কাজ। তিনি ইসলামী সাংস্কৃতিককেন্দ্রে কাজে যোগদান করেন এবং মনপ্রাণ দিয়ে ইসলামী-গ্রন্থ ও কুরআন মজিদ পাঠ করে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামগ্রহণ করেন অনন্ত পরকালের শান্তির জন্য। তাঁর ইসলামী নাম ইয়াহিয়া।

জোনাথন ইসলামগ্রহণ করলেও পিতা জন বার্টনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তিনি সপ্তাহের তিন চারদিন পিতার সঙ্গেই কাটান। তাঁর পিতার ৫ লাখ পাউন্ডের একটি বিশাল 'ভিলা' রয়েছে। রাতে পিতাপুত্র একই ভিলায় থাকেন। তখন তাঁদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ধরা পড়েনা; তবে পার্থক্যটা ধরা পড়ে সকালে, যখন তাঁরা নিজ নিজ কাজে বের হন। একই টেবিলে নাস্তা সেরে পিতা জন বার্টন তাঁর লিমোজিন কারে চড়ে ঝড়ের বেগে যান তাঁর অফিস বিবিসি ভবনে; আর তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া পায়ে হেঁটে চলেন তাঁর কর্মস্থলের দিকে। তাঁকে পথে দেখে কেউ ভাবতেও পারবেনা যে, তিনি 'বিবিসি'র দোর্দন্ড প্রতাপশালী মহাপরিচালক জন বার্টনের পুত্র। সবাই তাঁকে একজন দীনহীনের পুত্র মনে করে। ভোগের পেয়ালা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বেছে নিয়েছেন ইসলামগ্রহণ করবার কারণে। ইসলাম তাঁকে দিয়েছে অনন্ত সুখিজীবনের সন্ধান। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তারুণ্যদীপ্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, হাতে পবিত্র কুরআন, মুখে আল্লাহর জিকির, পরনে ঢোলা পায়জামা, মাথায় টুপি, পায়ে সাধারণ চপ্পল। তাঁকে দেখে কে বলবে, তিনি কোটিপতির সন্তান? সাদাসিধে পোশাক পরে তিনি রওনা দেন দক্ষিণ লন্ডনের উদ্দেশে। সেখানে তিনি একটি 'মুসলিম বুকশপ' পরিচালনা করেন। তাঁর বুকশপে ইসলাম সম্পর্কে দুর্লভ বইপুস্তক পাওয়া যায়।

ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক ইয়াহিয়া যখন মাথায় টুপি পরে লন্ডনের পথে হাঁটেন, তখন আশে-পাশের লোকজন অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ভাবে— কে এই লোকটা? হ্যাট-কোটপরা সাহেবদের মধ্যে বড়ই বেমানান তিনি। কেউ কেউ তাঁকে দেখে কানাঘুষা করে, টিটকারি দেয়, মুচকি হাসে। কিন্তু কারুর দিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত মনে পথ চলেন। তিনি যেন জনসমুদ্রে একা। তাঁকে অনেকেই চেনে। তাঁর ধর্মান্তরিত হবার জন্য অনেকেরই গা-জ্বালা করে। দু'কথা শুনিয়েও দিতে চায়। কিন্তু সাহসে কুলোয়না। হাজার হলেও বিবিসি'র মহাপরিচালকের পুত্র তো। তাঁর পিতা জন বার্টনের বার্ষিক আয় ৩ লাখ ৫৪ হাজার পাউন্ড। তাঁর অধীনে বিবিসি'র কয়েক হাজার কর্মচারী রয়েছে। সকলেই

তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে। তাঁর ছেলে মুসলমান হবার ঘটনা সবাই জানে। তবে কেউ প্রশ্ন করবার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেনা।

পিতা জন বার্টন ও পুত্র ইয়াহিয়ার জীবনধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতা সারাদিন বিবিসি নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন। বিবিসি'র অন্যতম কাজ হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো। অপরদিকে, ইয়াহিয়া সারাদিন ব্যস্ত থাকেন ইসলাম প্রচার ও জনসেবার কাজ নিয়ে। পিতা ও পুত্র দু'জনই প্রচার কাজে নিয়োজিত। তবে একজন প্রচার কাজ চালিয়ে যান অর্থোপার্জনের জন্য; অন্য জন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায়।

ইয়াহিয়া নিজেকে দক্ষিণ লন্ডনের নরবেরিতে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এখানে ইসলামের রীতি-নীতি শিক্ষা দেবার জন্য একটি কোর্স খোলা হয়েছে। তিনি গ্রীষ্মকালে এ কাজে নিয়োজিত থাকেন। অন্য সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ছাত্র হয়েও অবকাশকালে অর্থোপার্জন করেন শুধুমাত্র ইসলামের খেদমত করবার জন্য।

ইয়াহিয়া বড় হয়েছেন পাশ্চাত্যসমাজে। কিন্তু তাঁকে দেখে কেউ মনে করবেন না যে, তিনি একদিন এ সমাজের একজন ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাবেশে, ইসলামী জলসায় ও তাবলিগ জামায়াতে চমৎকার বক্তব্য রাখেন এবং ওয়াজ নছিহত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন মজিদের আয়াত ও হাদিস-এর উদ্ধৃতি দেন। শ্রোতারা তাঁর সুমধুর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হন।

১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে ইয়াহিয়া বিয়ে করেছেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত মুসলিম তরুণীকে। তাঁর স্ত্রীর নাম ফাউজিয়া বোরা। তিনি একজন সাংবাদিক। এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ইয়াহিয়ার পরিচয় হয়। ক্ষণিকের পরিচয় উভয়ের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্কের ভিত রচনা করে। নব-দম্পতি সিরিয়া, জর্দান ও পূর্ব জেরুসালেম ব্যাপকভাবে সফর করেছেন। ফাউজিয়ার বয়স ২৪ বছর। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিসরের মধ্যযুগীর ইতিহাস' নিয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি অক্সফোর্ডের সেন্টহিলড কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেছেন।

ইয়াহিয়া ও ফাউজিয়া মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের জন্য ইসলামের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল ব্যাপকভাবে সফর করেছেন। জেরুসালেমের মুসলিম অংশে তাঁরা ঘুরে-ফিরে ওখানকার মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা

তাঁদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে ইসরাঈলের নির্যাতনের চিহ্ন দেখান। সফরকালে তাঁরা ফিলিস্তিনি স্বার্থের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

ইয়াহিয়াদম্পতি নিয়মিত নামায পড়েন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটি মসজিদে উভয়ে একসঙ্গে জামায়াতে নামায পড়তে যান। নামাযশেষে একত্রে বাসায় ফেরেন। ফাউজিয়া খুব ভালো ছাত্রী। তিনি স্বামী ও পড়াশোনা ছাড়া কিছু ভাবেন না। ইয়াহিয়া অত্যন্ত দৃঢ়চেতা যুবক। তিনি যা করেন, বুঝে-সুঝেই করেন। তিনি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখান থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারবেনা। তাঁর পিতা জন বার্টন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর বয়স ৫২ বছর। তিনি একজন ক্যাথলিক খৃস্টান। ২০ বছর বয়সে তিনি কাথ্যলিক ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া সম্পর্কে বলেন, "আমার পুত্র কখনও আমার ধর্মে আস্থাশীল ছিল না; সে গির্জায় যেতো না। নিজেকে রোমান ক্যাথলিক বলে পরিচয় দিতো না। তাই বলে সে ক্যাথলিক ধর্মকে অশ্রদ্ধাও করতো না। সে বলতো 'আমি খৃস্টান নই'। ইয়াহিয়ার মায়ের নাম জেনিলেক। তিনি একজন মার্কিন বংশোদ্ভূত শিল্পী। ইয়াহিয়ার ছোটবোনের নাম এলিজা। ইয়াহিয়া বেশ কিছুদিন তাঁর মা ও ছোটবোনের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছেন। তবুও পৈতৃক ধর্ম তিনি কখনও পছন্দ করেননি।"

আল্লাহ্‌র অপার মহিমা, বিবিসি'র মহাপরিচালক জন বার্টন সারাবিশ্বে ইসলাম-বিরোধী প্রচারণা চালালেও তাঁরই ঘরে উজ্জ্বল আভায় প্রজ্জ্বলিত হয় সত্যধর্ম ইসলামের আলো। ইয়াহিয়া বলেছেন, "আমি আমার পিতার মত বিখ্যাত নই। তাঁর মতো হতেও চাইনা। যা হয়েছি, তা-ই আমৃত্যু থাকতে চাই। ইসলাম আমাকে দিয়েছে মুক্তির সন্ধান। আমি এ চিরন্তন মুক্তির পথই আঁকড়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ।"*

* লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি মেইল' পত্রিকা, ৩১ আগস্ট, ১৯৯৭।

ইউসুফ ইসলাম

স্বনামধন্য বৃটিশ গায়ক, পপ সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার কেট স্টিভেন্স ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৯৭৭ ঈসায়ী সালে ইসলামগ্রহণ করেন এবং তাঁর নতুন নাম রাখেন ইউসুফ ইসলাম। তিনি ১৯৮১ সালে 'ইসলাম মাই রিলিজিয়ন' (Islam My Religion) অর্থাৎ 'আমার ধর্ম ইসলাম' নামে ইংরেজিতে একটি বই লেখেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থটিতে তাঁর ইসলামগ্রহণের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে কিছু চুম্বক কথা তুলে ধরা হলো। বইটিতে তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

ইউসুফ ইসলাম

তিনি বলেন, "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানবজাতির কল্যাণের জন মহান আল্লাহ বিশ্বের বুকে নাযিল করেছেন।" ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি প্রশংসনীয় বক্তব্য বইটিতে পেশ করেছেন। কেট স্টিভেন্স ইসলাম সমন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন তাঁর বড়ভাই ডেভিড-এর কাছ থেকে। ডেভিড ইংল্যান্ড থেকে জেরুসালেম ভ্রমণ করেন সেখানকার তীর্থস্থানগুলো দেখবার জন্য। দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে 'মসজিদুল আকসা' ছিল অন্যতম। ইতোপূর্বে তিনি কোনও মসসিদের ভেতরে প্রবেশ করেননি। মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে তিনি মুসলমানদের ইবাদত বা নামাযের নিয়মকানুন অবেলাকন করে বিমোহিত হন। ডেভিডের অনুভূতি "The atmosphere was so different from that of Christian Churches and Jewish Temples that he had to ask himself why is this

religion (Islam) such a big secret? He was struck by the behaviour of the Muslims and their peaceful form of worship" (পৃষ্ঠা ৫) অর্থাৎ খৃস্টান গির্জার এবং ইহুদিদের মন্দিরে যে নিয়মে উপাসনা করা হয়, তাঁর ভিন্ন প্রকৃতি ও পরিবেশ তিনি দেখতে পান 'মসজিদুল আকসায়'। মুসলমানদের এবাদতের নিয়ম ও সুন্দর শৃঙ্খলা দেখে তাঁর মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

তিনি এক কপি কুরআন শরিফ সংগ্রহ করে নিয়ে দেশে ফেরেন এবং তা ছোটভাই কেট স্টিভেন্সকে উপহার দেন। মি. স্টিভেন্স বহুদিন থেকেই সত্যের সন্ধানে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সারাবিশ্বের একজনই মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন। স্রষ্টাকে কোন পথে পাওয়া যায় এবং আত্মার শান্তি কোথায় আছে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা। মনোনিবেশসহকারে কুরআন শরিফ পাঠ করে তিনি বলেন : I had tried many spiritual paths without much satisfaction. I was like a boat without a direction, but when I read the Quran, I felt I was made for it and it for me. (পৃষ্ঠা ৬) অর্থাৎ "আধ্যাত্মবাদের বহু পথ আমি চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু কোথাও আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারিনি। আমি দিকবিহীন নৌকার ন্যায় চলছিলাম; আল কুরআন পাঠ করে দেখতে পেলাম, এ যেন আমার মনের শান্তির জন্যই নাযিল হয়েছে আর আমি যেন এর জন্যই।"

তিনি প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে যান কুরআন মজিদে। তাঁর মনের সকল প্রশ্নের জবাব তিনি পেয়ে গেলেন এ মহাগ্রন্থে। তিনি মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন নিশ্চয়ই এটা সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত কিতাব। এর মধ্যে আদৌ কোনও সংশয় থাকতে পারে না। তিনি ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশেষে লন্ডনের এক বড় মসজিদের খোঁজ পেয়ে সেখানে গেলেন ১৯৭৭ সালের শীতকালের এক শুক্রবারে। ঐ দিন জুম্মার নামাযের পর ঐ মসজিদের ইমামসাহেবের হাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে দাখিল হন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে আল-কুরআন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

মুসলিম উম্মার বর্তমান করুণ অবস্থার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "I think, a lot of muslims have lost their way because they have not really studied the Quran itself" (পৃষ্ঠা : ৬)। তিনি মনে করেন বর্তমান মুসলিমউম্মাহ্ শান্তির সরল পথ হারিয়ে ফেলেছে, সত্যিকার

অর্থে কুরআন না বুঝবার কারণে। তাঁরা অনেকে হয়তো কুরআন পাঠ করেন ঠিকই; কিন্তু এর মর্মবাণী তাঁরা বোঝেন না বলেই মনে হয়। যদি তাঁরা আল্লাহর বাণী বুঝতেন এবং তাঁর ওপর আমল করতেন, তা হলে তাঁদের এই করুণ অবস্থা হতো না। তিনি বলেন, সকল মুসলমান যখন এক আল্লাহ, এক কুরআন ও আখেরি নবীকে বিশ্বাস করেন, তখন তাঁদের মধ্যে ঐক্য না থাকবার কোনও কারণ নেই। তাঁদের মূল বিষয় সবই এক, তবুও তাঁরা কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন? তাঁদের উচিৎ সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। 'একতাই বল'– এই সহজ কথাটি যেন মুসলমানরা ভুলে গেছেন!

ইসলামী গান গাচ্ছেন ইউসুফ

জনাব ইউসুফ ইসলাম আল-কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে থাকেন। তিনি বলেন, "I am studying Arabic and my real longing is to be able to understand the Quran properly" (পৃষ্ঠা : ১১) অর্থাৎ "আমি আরবি ভাষা শিক্ষা করতে থাকি এই উদ্দেশ্যে–আমি যেন সঠিকভাবে কুরআন মজিদ বুঝতে সক্ষম হই।"

তিনি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। তাঁর কথা, মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই কুরআন পড়তে সক্ষম, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়জন আল্লাহর বাণী বুঝতে পারেন? কুরআন বোঝাটাই বড় কথা। কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে না পারলে হেদায়েত পাওয়া সহজ নয়। তিনি বলেন : "Every verse (of the Quran) is a complete guidance, a chapter in itself. It is the word of God for all time to come ad holds the central position for every true Believer." (পৃষ্ঠার :১১)। অর্থাৎ "কুরআনের প্রতিটি আয়াত পূর্ণাঙ্গ, যেন একটি অনুচ্ছেদ। এটা আল্লাহর কালাম সর্বকালের জন্য এবং প্রকৃত ঈমানদারদের হৃদয়ের সম্পদ।"

তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলমানদের কর্তব্য হলো–সারা বিশ্বে প্রজ্ঞা ও হিকমতের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করা।" আল-কুরআনের ভাষায় : "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করো নম্রভাবে।" (১৬ : ১২৫)

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে অশান্তি ও নৈতিক অবক্ষয় বিরাজমান, তা নিরসনের জন্য সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহর হুকুমত আল্লাহর জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিম উম্মাহকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাঁদের একতাবদ্ধ করা এবং আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা সহজ কাজ নয়। তবে ধৈর্য ও পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। যাঁরা আহলে কিতাব, তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের তাওহিদের কথা বলবে। খৃস্টান ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন 'তিন-এ মিলে এক' (God the father, God, the son and God the Holy Ghost) এভাবে তাঁরা গডের একটি পরিবার কল্পনা করে নিয়েছেন। যা সম্পূর্ণ রূপে বিভ্রান্তিকর। আবার কেউ 'ঈশ্বর এক' বলা সত্ত্বেও তাঁর বহু শরিক দেবদেবীর আরাধনা করে থাকেন। তাদের কাছে মানবতার দরদ নিয়ে পরকালের নরকাগ্নি থেকে রক্ষা করবার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী প্রথমে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে হবে। তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'–অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি–যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মৃত্যুদাতা ও পরকালের বিচারকর্তা। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামের আনুসঙ্গিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। মানুষের পূর্ণতা ও পরকালের মুক্তির জন্য আল্লাহ্তায়ালা যে শিক্ষা ও হেদায়েত পাঠিয়েছেন আল-কুরআন তাঁরই বাস্তবরূপ। কুরআন পড়বার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত করবার জ্বলন্ত নজির রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাদের জীবনাচারে।

ইসলামগ্রহণ করবার মধ্যে পাওয়া যায় দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও কামিযাবি। এটা একমাত্র আল্লাহ্র দান ও রহমত।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম : ১৯ আগস্ট, ১৯৯৯, ঢাকা।

স্যার আব্দুল্লাহ্ আর্চিবল্ড হ্যামিলটন

স্যার এ, এ, হ্যামিলটনের ইসলামগ্রহণের পূর্বে নাম ছিল স্যার চার্লস এডওয়ার্ড আর্চিবল্ড ওয়ারকিনস হ্যামিলটন (Sir Charles Edward Archibold Workins Hamilton)। তিনি ১৮৭৬ ঈসায়ী সালে ১০ ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত খৃস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যারনেট মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল ডিফেন্স কোরের (Royal Defence Corp) একজন লেফটেন্যান্ট এবং সেল্‌সি কনজারভেটিভ সংঠনের সভাপতি ছিলেন। সবদিক দিয়ে ইংরেজসমাজে তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ইসলামগ্রহণ তৎকালীন ইংরেজসমাজ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল।

আর্চিবল্ড হ্যামিলটন

তাঁর ইসলামগ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন : আমি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বয়সের দিক দিয়ে পুর্ণত্বপ্রাপ্তির পর থেকেই ইসলামের সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হই এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

আমি জন্মসূত্রে একজন খৃস্টান এবং খৃস্টানসমাজে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও গির্জার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস আমার পছন্দ না হওয়ায় আমি আমার সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগে যৌক্তিকতা খুঁজতে চেষ্টা করি। যতই দিন যেতে থাকে, ততই আমার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি শান্তির জন্য গভীর আকুতিসহ গির্জায় বিশ্বস্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে থাকি; কিন্তু তাতে কোনও উপকার পাই না। ইংল্যান্ড ও রোমের গির্জা আমাকে শান্তি দিতে পারেনি।

অবশেষে বিবেকের তাড়নায় আমি ইসলামগ্রহণ করি। মুসলমান হবার পর থেকে আমি আমার বিবেকের আদেশ পালন করতে থাকি এবং নিজেকে একজন উন্নততর ও সত্যসন্ধানী মানুষরূপে দেখতে পাই। ইসলামের সঙ্গে তুলনা করে অন্যান্য ধর্মে চরম বিদ্বেষ, অজ্ঞতা ও পক্ষপাতদুষ্টতা দেখতে পাই— যা আমার ভীষণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকেই জানেনা যে, ইসলাম দুর্বলের জন্য শক্তির উৎস এবং গরিবের জন্য ধনভান্ডার। বিশ্বের মানবগোষ্ঠী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১) স্রষ্টা যাদের করুণা করে ধন-সম্পদের মালিক করেছেন।

২) যারা পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে এবং

৩) যারা বেকার জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ইসলাম এ শ্রেণীবিন্যাস মানে না।

ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে। এখানেও সীমা নির্ধারিত রয়েছে। এটা গঠনমূলক সাম্যনীতি; কোনওভাবেই ধ্বংসাত্বক নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির কিছু আবাদযোগ্য জমি রয়েছে, কিন্তু তিনি জমিতে আবাদ করবার প্রয়োজনবোধ করেন না; বছরের পর বছর জমি পতিত ফেলে রাখেন। ইসলামী বিধানে সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি চিরকাল তাঁর জমির মালিক থাকতে পারে না; ওয়ারিশরা তাঁর সম্পত্তির মালিক হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ধনীর অর্থ সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। আর তা হচ্ছে দান, সাদকা, ফিতরা, যাকাত, ওশর প্রভৃতি।

ইসলামে জুয়া, লটারি, মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কারণ এসব মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সুদ মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণহেতু ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ।

ইসলামে জুলুম ও শোষণের স্থান নেই। ইসলামে অদৃষ্টবাদ বা ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত বলে কিছু নেই। বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ইসলামে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমল বা কর্তব্য সম্পাদন অপরিহার্য। আমলহীন ঈমান মূল্যহীন। ইসলাম বলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ইহজগতে ও পরকালে অবশ্যই ভোগ করবে। ইসলামের শিক্ষা–প্রত্যেক মানুষই নিষ্পাপআত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত কর্মক্ষমতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা সমান প্রদত্ত হয়। ব্যক্তিগত চর্চা ও সাধনায় তাঁর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সর্বজন-প্রশংসিত। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, চাকর-মনিব, ভদ্র-শূদ্রের কোনও পার্থক্য ইসলামে নেই; এখানে সবাই সমান। প্রত্যেক মুসলিমভাই আমার কাছে সম্মানের পাত্র এবং আমি তাঁদের বিশ্বাস করি। তাঁরা ওয়াদা খেলাফ করেননা। মুসলিম ভাইয়েরা আমার সঙ্গে আপনজন বা আপন ভাইয়ের ন্যায় সদয় ব্যবহার ও আদর আপ্যায়ন করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাই।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, ইসলাম মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য কাজের বিধান দিয়েছে। কিন্তু খৃস্টধর্মে সপ্তাহে মাত্র একদিন রোববারে গির্জায় প্রার্থনা করা হয়। সপ্তাহের বাদবাকি ছয়দিন স্রষ্টার জন্য কিছুই করণীয় নেই।

এসব বিষয় বিচার-বিবেচনায় ইসলাম আমার কাছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। আমি ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা মনে করেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি।*

* Islam : Our Choice, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪।

সানথা হুদা

ইসলাম পাশ্চাত্যসমাজে অতিদ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বিগত বছরগুলোতে সহস্রাধিক নরনারী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল স্কটল্যান্ডের রাজধানী শহর গ্লাসগোতেই মাসে গরে একজন মহিলা ইসলামগ্রহণ করছে।

বিখ্যাত পত্রিকা ডেইলি মেইলের এক সংখ্যায় তিনজন উচ্চশিক্ষিত বৃটিশ মহিলার ইসলামগ্রহণের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার মতে পাশ্চাত্যের নারীসমাজে ইসলামের প্রতি এ আকর্ষণ বিস্ময়ের ব্যাপার!

এদের একজনের বর্তমান নাম 'হুদা'। তাঁর ইসলামগ্রহণের পূর্বে নামে ছিল 'সানথা'। সানথা ইংল্যান্ডের ব্যালপোল রাবো অঞ্চলে লালিত-পালিত হন। তাঁর পিতা ছিলেন নিউক্লিয়ার-প্লান্টের একজন তত্ত্বাবধায়ক। হুদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনেই ইসলামগ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণ করবার পর নাসের নামক এক এশিয়াবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হুদা খন্ডকালীন চাকরিতে নিযুক্ত থেকে অবশিষ্ট সময় জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের কাহিনী নিম্নরূপ:

আমার পরিবারে তেমন ধার্মিক না হলেও আমি ও আমার ভাই প্রতি রোববার নিয়মিত গির্জার যেতাম। সাধারণ অভিজাত ইংরেজ-পরিবারের মতো আমরাও খাঁটি ইংরেজ পরিবেশে লালিতপালিত হই। আমার বয়স যখন বার বছর, তখন আমার পিতা-মাতার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এ ঘটনা আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল। স্কুলে আমি সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করলেও মনের দিক থেকে সুখি ছিলাম না। আমার দেহ মোটা হবার কারণে অন্যরা আমাকে বিদ্রুপ করতো। সুতরাং আমার বন্ধুসংখ্যাও কম ছিল। বিভিন্ন পার্টিতে অংশগ্রহণে আমার কোনও সখ ছিলনা। ধুমপান কিংবা অন্য কোনও মাদকবস্তুর প্রতি আমার তেমন আসক্তি ছিলনা। তবে মদের স্বাদ অবশ্য আস্বাদন করেছি। আমার সামাজিক জীবন কেবল গির্জার যুবক্লাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানেও কেবল মেয়েরাই ছিল আমার বান্ধবী। যদিও আমি লাজুক ছিলাম না;

কিন্তু বাল্যকাল থেকেই আমার চিন্তাধারা ছিল যে, নারীমাত্রকেই তার বিবাহ হওয়া পর্যন্ত 'বয়ফ্রেন্ড' থেকে নিজেদের সংরক্ষিত রাখা উচিত। 'এ' লেবেল পাস করবার পর আরবি পড়বার যোগ্যতা অর্জন করতে আমি লন্ডনস্থ 'স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড এশিয়ান স্টাডিজ'-এ ভর্তি হই। তখনও ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল শূন্যের কোঠায়। কিন্তু আরবি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার ইসলাম সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় মুসলমানদের সঙ্গে আমি ওঠা-বসা আরম্ভ করি। আমি দেখে বিস্মিত হই যে, মুসলিমপরিবারের লোকেরা বিশ্বের যেকোনও অঞ্চলবাসিই হোক না কেন, পরস্পর একান্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখেন। যেহেতু আমার পিতা-মাতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে এ আন্তরিক মেলামেশা আমার কাছে ভালো লাগতো।

আমার দৃষ্টিতে ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ঐ সবনীতি ও অনুশাসনাদি যা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন সাপেক্ষ। বিশেষ করে বিয়ের আগে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ-নীতি বাল্যকাল থেকেই আমার অন্তরে লালিত চিন্তাধারা সমর্থন করে। কিন্তু যে-জিনিসটি আমাকে সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তা হচ্ছে মুসলিমনারীদের পর্দাব্যাবস্থা। নারীদের ইসলামী পোশাক বেগানা-পুরুষের লোলুপদৃষ্টি থেকে তাদের দেহরক্ষা করে। এ-নীতি আমার খুবই ভালো লাগে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা নারীকে সেজেগুজে ঘোরাফেরা করবার ও স্বীয় দেহ-প্রর্দশনীর জন্য উৎসাহিত করে। আবার এ অভিযোগও শোনা যায়, পুরুষরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। হিজাব বা পর্দার বিধান থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা নারীদের এ জন্য সৃষ্টি করেননি যে, তারা কেবল দেহ-প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়াবে।

বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রথমবর্ষে ইস্টারের ছুটি পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমার প্রচুর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমি সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ফেলি যে, এবার আমার ইসলামগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। লন্ডনের 'রিজেন্টস পার্ক' মসজিদে কেট স্টিভেন্সের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। ইসলামগ্রহণের আগে তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা গায়ক। বর্তমানে তিনি ইউসুফ ইসলাম নামে খ্যাত। সেখানে একজন মার্কিন নওমুসলিম মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। সেই ভদ্র মহিলার সঙ্গে কয়েক মাস থেকে আমার বন্ধুত্ব ছিল। এর দু'বছর পর কতিপয় মহিলার উপস্থিতিতে আমি ইসলামগ্রহণ করি। আমার ইসলামগ্রহণ করবার পর কয়েকজন মহিলা আমাকে

তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। তারা আমার সম্মানে স্বাগতভোজের ব্যবস্থা করেন। প্রথম প্রথম মনে হতো যে, আমি যেন আজব অবস্থায় আছি। আবার এও ধারণা হতো যে, আমি আমার গন্তব্য স্থানেই এসে পড়েছি। কিছুদিন পর আমি একটি মুসলিম মহিলা-আবাসে স্থানান্তরিত হই। সেখানে আমি মুসলিম মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা করি এবং আমি আমার নাম পরিবর্তন করে 'হুদা' রাখি; হুদা অর্থ 'হেদায়েত' বা দিশা। আমার পরিবারের লোকেরা আজও আমাকে সাবেক নামেই ডাকে। প্রথম প্রথম আমার পরিবারের লোকেরা খুবই মনক্ষুন্ন ও হতাশ হয়েছিল। আমার পিতা বলতেন, 'ইসলাম তোকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে'। তাঁর ধারণা ছিল যে, এখন তো ভাবপ্রবণতার সময়, এ আবেগ একদিন না একদিন ঘুচে যাবে। কিন্তু বর্তমানে তিনি আমার মুসলমানিত্বে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। সামাজিকভাবে আমার কতিপয় ইংরেজ বন্ধু খুবই বিস্মিত হয়। অনেকে তো আবার ভ্রূক্ষেপই করেনি। কয়েক বন্ধুতো এখনও বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে।

ইসলামের কোনও কোনও অনুশাসন আমার কাছে খুবই সহজ মনে হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে আমার কোনও অসুবিধা বোধ হয়না; কিন্তু হিজাব বা পর্দা ব্যবহার করতে গিয়ে একটু অসুবিধা বোধ হতো। মাস ছয়েকের মধ্যে এতেও আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠি। বর্তমানে আমার সমস্ত পোশাকই ইসলামসম্মতভাবে তৈরি। এখনতো সেগুলো স্বাভাবিক ও রুচিসম্মত মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমার ইচ্ছা ছিল যেন ইসলামী পদ্ধতিতে আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং আমার এক বান্ধবীকে মনের কথা খুলে বলি এবং আমার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের দায়িত্ব তার ওপর অর্পন করি। আমার সে বান্ধবী নাসের সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সাক্ষাতকালে আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম। নিজেকে আমি ইসলামের সীমার মধ্যে রেখে পেশ করবার চেষ্টা করি। আমার এমন একজন স্বামীর প্রয়োজন ছিল, যে প্রকৃত অর্থে মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু হবার যোগ্যতাও রাখবে। সাক্ষাতের পর ভেবে দেখি যে, নাসের সাহেবের মধ্যে আমার কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী বিদ্যমান। পরের দিন জানতে পারলাম, নাসের সাহেব আমাকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমি আমার বান্ধবীদের উপস্থিতিতে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। অল্প কয়েক দিন পরেই আমার বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলি এবং মাস ছয়েক পরে আমরা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হই। আমি দেখেছি যে, পাশ্চাত্যসমাজে নারী

তার বাগদত্তা স্বামীর সঙ্গে বিয়ের আগেই যৌন সম্পর্কে স্থাপন করে। সুতরাং আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম। বিয়ের পর সাধারণত নিজেকে গুছিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে আমি এক থেকে দুই-এ পরিণত হয়েছি। আমরা পরস্পর বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। এটা আমার দৃষ্টিতে স্বামীর জন্য একান্ত জরুরি।

নাসের আমাকে বিয়ের পূর্বে পর্দাহীন অবস্থায় দেখেনি। অতএব বিয়ের পর সে আমাকে কাছে থেকে দেখে পছন্দ করবে কিনা, সে বিষয়ে আমার ভয় ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা উভয়েই শুরু থেকেই সুখি ছিলাম। বিয়ের পর আমাকে এভাবে গুছিয়ে নিতে হয়েছে যে, পারিবারিক জীবন, ঘর-সংসার, রান্নাবান্না এবং বর্তমানে আমার সঙ্গে যে আর একজন রয়েছে, সে আমার স্বামী সে-অনুভূতি। সুতরাং আমরা ইসলামের জীবনপদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন আরম্ভ করি। নাসের হচ্ছে একজন সার্বক্ষণিক চাকুরিজীবী আর আমি খণ্ডকালীন। অবশিষ্ট সময় আমি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি।

ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে বলে। পাশ্চাত্য-সমাজের নারীরা একথা শুনে নাক কুচকায়। কিন্তু ইসলাম নারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কিত বিধিবিধান স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। অতএব নারী-পুরুষের সমান হবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। ইসলাম নারীদের কাজ নারীদেরই দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছে। আর পুরুষের কাজ পুরুষের দায়িত্বে। ইসলামের মুলনীতি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং একে অন্যের জীবন সহজ ও সুন্দর করবার চেষ্টা করা।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম : ১৯ আগস্ট, ১৯৯৯ইং।

আয়েশা জান

লন্ডনের একজন মহীয়সী ইংরেজ মহিলার পরিবর্তিত নাম বেগম আয়েশা জান। সেখানকার মুসলিমসমাজে তিনি 'আম্মাজী' নামে পরিচিত।

বেগম আয়েশা জান ছিলেন লন্ডনের এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের সন্তান। ১৯৫২ ঈসায়ী সালে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। কীভাবে তিনি মুসলমান হলেন, এ সম্পর্কে কিছুকাল আগে তাঁর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

সাক্ষাতকারে তিনি বলেন : আমি এক গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান। ধর্মীয় পরিবেশেই আমার লালন-পালন হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, বাল্যকাল থেকেই আমাদের অনেক সামাজিক রীতিনীতি আমার চোখে অপছন্দনীয় বলে মনে হতো। বিশেষত শূকরের মাংসের প্রতি ছিল আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। আমি এর গন্ধও সহ্য করতে পারতাম না। আমাদের ঘরে যে-দিন এটা পাক হতো, সে-দিন কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যেতাম। কেন জানি ধীরে ধীরে পৈতৃক ধর্মের প্রতি আমার মনে এক ধরনের সন্দেহ ও বিরাগ জমাট বাঁধতে শুরু করে।

বই-পুস্তক পড়ে সময় কাটানো ছিল আমার সবচাইতে বড় হবি। নিকটবর্তী একটা পাঠাগারে গিয়ে আমি প্রায়ই নানা ধরনের বই-পুস্তক পড়তাম।

মুরুব্বীদের মুখে শুনতাম যে, সকল তত্ত্বজ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রাচ্যভূমি। খৃস্টধর্মও প্রাচ্য থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ফলে প্রাচ্য সম্পর্কে পড়াশোনার প্রতি আমার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রাচ্যের ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পড়তে গিয়েই ইসলামের ইতিহাস এবং মুসলিম মণীষীদের গৌরবময় কীর্তিগাঁথা সম্পর্কে জানবার সুযোগ লাভ করি।

ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করবার পর আমার পাঠস্পৃহা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, ইসলামই অন্ধকার অতীত থেকে মানবজাতিকে বর্তমান সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ে উন্নীত করবার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম

ভিত্তিস্থাপন করেছেন মুসলমানরা। পাশ্চাত্য সর্বপ্রথম মুসলমানদের কাছ থেকেই নতুন সভ্যতার পাঠগ্রহণ করেছে। ইসলামই নারীজাতিকে প্রকৃত মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। বিশেষত মানুষ এবং তার স্রষ্টার মাঝে খৃস্টধর্ম যেখানে কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় মাধ্যমের আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছে, সেখানে ইসলামের শিক্ষা প্রতিটি মানুষকে তার স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করবার পথ দেখিয়েছে।

পড়াশোনার এক পর্যায়ে জাস্টিস আমির আলী লিখিত 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' নামক বইটি আমি পাঠ করবার সুযোগ লাভ করি। বলতে গেলে এ বইটিই আমাকে পৈতৃকধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছে। এ বই পড়ে আমি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করি, যা বর্ণনা করবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। সেই প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি যথারীতি ইসলামগ্রহণ করি। আমি অবনত চিত্তে আল্লাহর শোকর করি; যিনি আমার মতো এক তুচ্ছ নারীকে তাঁর সত্যদীনগ্রহণ করবার তওফিক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমার একমাত্র কন্যাও আমাকে অনুসরণ করে ইসলামগ্রহণ করেছে। বর্তমানে সে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সুখে বসবাস করছে।

ইসলামগ্রহণ করবার পর ইসলাম এবং মুসলমানদের সেবা করাই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, লন্ডনের মুসলিমবোনদের কিছু খেদমত করবার সুযোগ আমি লাভ করেছি। 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে আমাদের একটি সংস্থা রয়েছে। ১৯৬২ ঈসায়ী সাল থেকে আমি এ-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। বর্তমানে আমি এ সংগঠনের সভানেত্রী। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হচ্ছে স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলিম মহিলাদের পারস্পারিক সংযোগ এবং মতবিনিময় করবার সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষত এ-দেশের বৈরী সামাজিক পরিবেশে মুসলিমনারীদের পক্ষে ইসলামী মূল্যবোধের ওপর টিকে থাকবার মতো সমস্যা কি করে মোকাবেলা করা যায়, এ বিষয়ে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে থাকি। সমাজকল্যাণমূলক আরও কিছু কাজ আমাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। গরিব অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করা এবং এতিম কিংবা কোনও কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের লালন-পালন করবার প্রতিও আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকি। ফিলিস্তিন ও কাশ্মিরের ছিন্নমুল মুহাজিরদের জন্য আমরা মাঝে মাঝে সাহায্যসামগ্রী সংগ্রহ করে প্রেরণ করে থাকি।

মুসলিমশিশুদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে আমরা 'মদিনা হাউস' নামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে এতিম ও অসহায় শিশুদের আশ্রয় প্রদান করা হয়ে থাকে।

আমি মনে করি, বৃটিশসমাজে ইসলামপ্রচারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রচার কাজ শুরু করতে পারলে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে এ-দেশটিকে একটি ইসলামী দেশে রূপান্তরিত করে দেয়া মোটেও কঠিন হবে না। এ-দেশের নতুন প্রজন্ম গির্জাশাসিত খৃস্টানসমাজে অবৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়েছে। নৈরাশ্যপীড়িত ছেলে-মেয়েরা দ্রুত নানা মারাত্মক নেশায় আক্রান্ত হয়ে হিপ্পিতে পরিণত হচ্ছে। আমার মনে হয়, একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই এসব বিভ্রান্ত ছেলেমেয়ে বর্তমান নৈরাশ্যের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত তাবলিগের কাজে শৈথিল্য সীমাহীন। আমার আকাঙ্ক্ষা লন্ডনে এমন একটি ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তরুণদের জন্য প্রচুর ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকার সংস্থান করা হবে। এখন পঠন-সামগ্রীর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি বলে আমি মনে করি। এতদসঙ্গে মুসলিম যুবশ্রেণীর মধ্য থেকে এমন একটি দল তৈরি করবারও প্রয়োজন মনে করি, যারা 'হাইড পার্কের' স্পিকার্স কর্ণারে হাজিরা দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে নিয়মিত ভাষণ দেবে। শহরের অন্যান্য এলাকাতেও প্রচারকদের দরকার বলে আমার ধারণা।

ইসলাম মানবজাতির মুক্তির পয়গাম। দুনিয়ার প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার অধিকার রয়েছে। ইসলামের বাণী অন্যের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহর তরফ থেকে আদিষ্ট। এ আদেশ পালন করবার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করা রীতিমত একটা অপরাধ। সুতরাং লোকলজ্জা বা অন্য কোনও অজুহাতেই এ দায়িত্ব থেকে দূরে থাকা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না।

সবশেষে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে আমাদের অনেক ভাইবোনই নওমুসলিমদের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। অনেকের আচার-আচরণে মনে হয় যেন মুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করবার ফলেই বুঝি তারা নতুন ইসলামগ্রহণকারীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এ ধারণা জাহেলিয়াতসুলভ। ইসলাম সম্পর্কে নওমুসলিমদের

জ্ঞান বোধগম্য কারণেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তারা মুসলিমসমাজের সর্বাধিক মনোযোগ পাবার অধিকারী। মানুষ স্বভাবগতভাবেই অনুভূতিপ্রবণ। কারও অনুভূতিতে আঘাত করা রীতিমত পাপের কাজ। তদুপরি, যারা স্বধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করে আসে, তারা তো আল্লাহর মেহমান। এদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে বলে আমার ধারণা। এসব লোকের সঙ্গে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক মুসলমানের একটা নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রতি নারী-পুরুষ সবারই সমান গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। অন্য সকল মতবাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্যই আল্লাহপাক ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। কাঙ্ক্ষিত সে-মর্যাদায় ইসলামী চিন্তাধারাকে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমরা কে কতটুকু ভূমিকা পালন করছি, তা অবশ্যই আমাদের সকলকে আল্লাহপাক জিজ্ঞেস করবেন।*

* 'মাসিক মদীনা', সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

প্রফেসর হারুন মুস্তফা লিওন

প্রফেসর হারুন মুস্তফা লিওন (Professor Haroon Mustapha Leon MA, Ph.D. LLB. FSP.) ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং একজন ভাষাতত্ত্ববিদ (Philologist)। তিনি শব্দবিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিক্ষিত-সমাজে তাঁর মর্যাদা ছিল গগনস্পর্শী। আমেরিকার বিখ্যাত পটোম্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর লিওন একজন খ্যাতিমান ভূ-বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন মুল্যবান বক্তৃতা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'The Philomathe' নামক বিজ্ঞানপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অস্ট্রিয়ার সাবেক শাহ ও সম্রাট সুলতান আব্দুল হামিদ তাঁর বহুমুখী অবদানের জন্য তাঁকে বহু উপহারে ভূষিত করেন। ড. লিওন ১৮৮২ ঈসায়ী সালে ইসলামগ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন :

ইসলামের গৌরবময় দিক হলো, ইসলাম যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের অনুসন্ধান ও পরামর্শ গ্রহণপূর্বক অধ্যয়নের নির্দেশ প্রদান করে। আল্লাহর রসুল (স) বলেন, মহান আল্লাহর যুক্তির ন্যায় উত্তম আর কিছু নেই।

হযরত ঈসা (আ) উপদেশ দিয়েছেন, সবকিছু যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখো, তারপর যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করো। ইসলামের একই নির্দেশ। কুরআন মজিদের ৫২ নং সূরা আল জুমা'তে আছে, 'যারা বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহার না করে অন্ধকারে পথ চলে, তাদের দৃষ্টান্ত পিঠে কিতাব বহনকারী গাধার ন্যায়।' কেননা গাধা জানেনা যে, তার পিঠে কত মূল্যবান জিনিস রয়েছে।'

মহান খলিফা হযরত আলী (রা) বলেন, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, জ্ঞানই আলো; কিন্তু যে জ্ঞানের মধ্যে সত্য নেই তা ঝাপসা বা অস্পষ্ট। ইসলাম সত্য

ও যুক্তিনির্ভর। সুতরাং যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে 'সত্য' জানতে হবে। প্রকৃত জানা একমাত্র যুক্তি দ্বারাই সম্ভব।

রসূলে করিম (স) পৃথিবী থেকে শেষবিদায়ের কয়েক দিন পূর্বেও এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে সাহাবারা (রা) অশ্রুসজল নয়নে রসুলুল্লাহ (স)-কে বলেছিলেন, "ইয়া রসুলূল্লাহ, আমরা আপনার কাছ থেকে পরামর্শ, উপদেশ ও নসিহত পেতাম, আপনার অভাবে কে আমাদের পরিচালনা করবে?"

রসূল (স) বলেন, "আমি যা যেভাবে করতে বলেছি, তদ্রুপ করবে এবং আমি যা করেছি' তাই করবে।" তিনি আরও বলেন, "মহান আল্লাহ প্রত্যেককে ব্যক্তিগত সরদারির জন্য দিয়েছেন 'বিবেক' এবং নিজেকে পরিচালনার জন্য 'যুক্তি'; এগুলো যখন ন্যায় ও সৎপথে পরিচালিত করবে, আল্লাহর বিশেষ রহমত তখনই তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে।"*

* Islam : Our Choice : ইব্রাহিম আহমদ বাওয়ানী, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৩২-৩৪।

স্যার জালাল উদ্দিন লডার ব্রান্টন

লডার ব্রান্টনের জন্ম ইংল্যান্ডের এক খ্যাতনামা খৃস্টানপরিবারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি একজন ব্যারোনেট, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও খ্যাতিমান মনীষী। খৃস্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতার অনুপ্রেরণায় বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী। ইংল্যান্ডের চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মিশনারি কাজ শুরু করেন। কিন্তু খৃস্টধর্মের মধ্যে তিনি তাঁর মনের সকল প্রশ্নের সমাধান না পেয়ে গির্জায় যাতায়াত বন্ধ করে জনসেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্থ মানব-সম্প্রদায়কে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করবার চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্মের পিপাসা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হয়। শেষপর্যন্ত তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কেন ইসলামগ্রহণ করেন, তা তাঁর কথায় শোনা যাক :

বাইবেলপাঠ করবার পর দেখলাম, তাতে পরস্পরবিরোধী কথা রয়েছে এবং 'আত্মা' ও 'অদৃশ্য' শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। অতঃপর ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকি। আমার ইসলাম সম্পর্কে জানবার বিশেষ আগ্রহের কারণ খৃস্টান ও ইহুদিসমাজ স্বভাবতই ইসলামবিরোধী। ইসলামের নবীর প্রতি তাঁরা চরম বিদ্বেষী।

ইসলামী গ্রন্থাবলী যতই পাঠ করতে থাকি, ততই আমি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হতে থাকি। আমার মনে হয়, ইসলামের মধ্যে এমন একটি মোহিনীশক্তি আছে, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। পল্লীর নিভৃত কোলে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে স্রষ্টার যশ ও গৌরবের কথা প্রচার করে সময় কাটাতে থাকি। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও পবিত্রতার অনুভূতি জাগ্রত করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য।

অতঃপর আমি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনী অধ্যয়ন করতে থাকি। তিনি কি করতেন, সে-বিষয়ে আমার কোনও জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু এটা আমার জানা ছিল যে, খৃস্টানরা একস্বরে আরবের এ প্রখ্যাত নবীর প্রতি অনেক

দোষারোপ করে থাকে। আমি গোঁড়ামি, হিংসা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে তাঁকে জানবার চেষ্টা করি। কিছুকাল তাঁর জীবনী অধ্যয়নের পর বুঝতে পারি যে, তাঁর সত্য দীন এবং স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সন্দেহের অতীত। মানব-সমাজের জন্য তাঁর উদার ধর্মমত জানবার পর আমি উপলব্ধি করি, এ মহান মানবকে দোষারোপ করা অত্যন্ত অন্যায়। যারা ছিল পৌত্তলিক, অন্যায়কারী অর্ধনগ্ন, তিনি তাদের একমাত্র স্রষ্টাকে চিনতে সাহায্য করেন, তাদের বিভ্রান্তির পথ থেকে সৎপথে আনেন এবং তাদের কাপড় পরা শিখিয়ে সভ্য ও মর্যাদাশীল করে তোলেন। যারা ছিল দস্যু, তাঁরা হয়ে ওঠেন অতিথিপরায়ণ। তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁকে মহান মানবতার অধিকারী জানবার পর চিন্তা করি, এ মহান নবী খৃস্টানদের দ্বারা অপমানিত হবেন, এটা সহ্য করা অন্যায়। আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি। এ সময় মিয়া আমিরুদ্দীন নামে এক ভারতীয় মুসলিমের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি আমার জীবন-প্রদীপে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর ইসলামের মহৎ গুণাবলীর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামগ্রহণ করি। সততা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইসলামের মধ্যে পূর্নমাত্রায় বিদ্যমান দেখতে পাই। আমার ইচ্ছা যতদিন দুনিয়ার বুকে থাকি, আমার সবকিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করবো।*

* Islam : Our Choice, ইব্রাহিম আহমদ বাওয়ানী, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৭-২৯।

মেভিস বি. জলি

ইংল্যান্ডের মেভিস বি. জলি (Mevis B. Jolly) নামের এ ভদ্র মহিলা সেখানকার এক খৃস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তুলনামুলকভাবে অধ্যয়ন করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে পড়েন : 'আমি একা বুদ্ধ নই। আমার পর আরও একজন বুদ্ধ আসবেন।' তিনি যে বিশ্বনবী হবেন— তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

তিনি বলেন, "আমি বাস্তব বিচার ও বিবেচনা প্রয়োগে সন্তুষ্ট হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছি। এটা আমার কোনও আবেগের ফসল বা মুহূর্তের পাগলামি নয়। দু' বছর যাবৎ অনেক যুক্তিতর্ক ও বিবেকের দংশন সহ্য করে অবশেষে আমাকে মহান ইসলামে দাখিল হতে হয়েছে।"

তিনি কীভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন, সে-কাহিনী তাঁর ভাষায় শোনা যাক :

খৃস্টান পরিবারে আমার জন্ম। ইংল্যান্ডের এক চার্চে অমাকে ব্যাপটাইজড (দীক্ষাস্নান) করানো হয়। বাল্যে আমার পড়াশোনার সূচনা হয় এ চার্চস্কুলে। আমি গসপেলে বর্ণিত যিশুখৃস্টের অনেক কাহিনী পড়ি। সে-সব আমার হৃদয়ে এক আবেগময় অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করে। খৃস্টধর্মীয় তত্ত্ব আমি যা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি তা ভেবেচিন্তে দেখবার স্পৃহা আমার মধ্যে জন্মলাভ করে। তাতে বহু অসংগতি লক্ষ্য করি। ফলে অনেক কিছুর প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি।

স্কুলজীবন শেষে আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক হয়ে পড়ি। এরপর আমি পৃথিবীর অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করি। খুব উৎসাহ নিয়ে বৌদ্ধধর্মের 'অষ্টশিলা' পড়লাম; কিন্তু তাতে কোনও নির্দেশনা বা বিস্তৃত বর্ণনা পেলাম না। তারপর পড়লাম হিন্দুধর্ম। এখানে শুধু তিন দেবতা নয়, শত শত দেবদেবীর পরিচয় পাই। এর সমস্ত উপাখ্যান শুধু কাল্পনিকই নয়, চরম অবিশ্বাস্য বলে আমার মনে হয়।

আমি ইহুদিধর্ম সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করি। কিন্তু আগেই অনুভব করতে পেরেছিলাম, এ পুরাতন বাইবেল আমার কাছে প্রকৃত ধর্ম বলে কোনওকালেই আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে না। আমার এক বন্ধু আমাকে আধ্যাত্মিক বিষয় পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সে আমাকে যোগসাধনা করতে বলেছিল ; কিন্তু সেসব আমি বেশিদিন পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি। কেননা আমার বেলায় আত্মমগ্নতা নিদ্রার শামিল ছিল।

বিশ্বযুদ্ধশেষে আমি লন্ডনে এক অফিসে চাকরিগ্রহণ করি : কিন্তু আমার মন থেকে কখনই ধর্মীয়-ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়নি। আমি বাইবেলের খৃস্টীয় ঐশ্বরিকতাবাদের বিরোধিতা করে পত্রিকায় চিঠি লিখি। ফলে আমি অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ি। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। নবপরিচিত এ মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ইসলাম সম্পর্কে আলাপআলোচনা করি। একথা স্বীকার করতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই যে, একজন সাধারণ মুসলিমের কাছ থেকে আমার জন্য পরম সত্যের রহস্য উদঘাটিত হয়। বিশ্বের কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলিম মনীষীর সঙ্গেও পত্রালাপ করি। এদের মধ্যে আল জিরিয়ার শেখ ইব্রাহিম, আল-আজহারের ড. মুহম্মদ এল বাহাই, প্যারিসের ড. হামিদুল্লাহ, জেনেভার ড, সৈয়দ রমযান, পাকিস্তানের মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী এবং ওয়াশিংটন ডিসির ইসলামিক কেন্দ্রের পরিচালক ড. মাহমুদ হোবাল্লা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এ-সময় আমি আরও কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলাম। তাঁরা আমার সমস্যাগুলো ভালোমত উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। তখন আমি যেসব বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, তন্মধে The Religion of Islam, Mohammad and Christ, The Sources of Christianity উল্লেখযোগ্য। অতঃপর আমি গভীর মনোনিবেশসহ কুরআন শরিফ পাঠ করি।

কুরআন শরিফ পড়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, এটা একান্তই পুনরাবৃত্তি। আমি আদৌ বুঝতে পারিনি যে, আমি ধীরে ধীরে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি। এ সময় রাতের পর রাত জেগে আমি পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকি। আমি ভেবে বিস্মিত হতাম, কীভাবে একজন নিরক্ষর মানুষের কাছে মানবজাতির প্রতি এত সুশৃঙ্খল নির্দেশনামা নাযিল হতে পারে! আমি জানতে পারি, যাঁরা নবী ছিলেন, তাঁরা জীবনে কোনও পাপ কাজ করেননি বা মিথ্যা বলেন নি। আর একটি চিন্তা আমাকে অস্থির করে তোলে যে, এ বিংশ শতাব্দে আর কেউ নবী হয়ে এলেন না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি পবিত্র কুরআনেই পেয়ে যাই যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং তিনিই শেষনবী; তাঁর পর কোনও নবী আসবেন না। কুরআন শরিফ যে, মহান স্রষ্টার প্রদত্ত গ্রন্থ, তাতে কোনওপ্রকার সন্দেহ নেই : কেননা তের শ বছরের মধ্যে নতুন কোনও নবীর আবির্ভাব ঘটেনি আর ঘটবেও না; কেননা এটা কুরআন পাকের চিরসত্য বাণী। অনুরূপ কুরআনের প্রতিটি বাক্য প্রমাণিত সত্য। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতিটি বাক্য সন্দেহাতীত। আল-কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর পরও অবিকৃত, অক্ষত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বের বুকে লক্ষ লক্ষ হাফেজ কুরআন শরিফ. মুখস্ত করে রেখেছেন। কুরআনের চ্যালেঞ্জ বিস্ময়কর; মানব ও জিনজাতিকে কুরআনের একটি সুরার মতো বা একটি বাক্য রচনা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেছেন, 'তা তোমরা কোনও দিন পারবেনা'। তা পারেও নি কেউ কোনও দিন। আল্লাহ্ স্বয়ং কুরআনের হেফাজতকারী। নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআনের সকল কথা ও বিধিবিধান মেনে নিয়ে আল্লাহ্ পাকের মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম পরকালের মুক্তির জন্য আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। আমি একজন মুসলমান হতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত।*

* Islam : Our Choice : ইব্রাহিম আহমদ বাওয়ানী, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৫৯-৬২।

আমিনুল ইসলাম খান চক্রবর্তী

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার দ্বারিয়াপুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে রায়বন্ধু চক্রবর্তীর পুত্র সন্তোষবন্ধু চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩০ শে চৈত্র (১৭/০৭/১৯৩৭) তারিখে। পিতা-মাতার বিয়ের একযুগ পর তাঁর জন্ম হলে খুশি হয়ে নাম রাখা হয় সন্তোষবন্ধু।

তিনি কেন ইসলামগ্রহণ করেন এ প্রসঙ্গে বলেন : আমার মাতা মনোরমা দেবীর মৃত্যু হলে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানমতে আমাকে চিতায় শায়িতা মাতার মৃতদেহের মাথায় অগ্নিস্পর্শ করা মাত্র আমার বুকখানা কেঁপে ওঠে। সেদিন থেকেই হিন্দুধর্মের প্রতি আমার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিজের বাড়ির বিগ্রহাদির পূজা করা ত্যাগ করি। আমার পিতা এতে রাগান্বিত হলেও মাতৃহারা শিশুসন্তানের জন্য কিছু বলতেন না। ফলে মনের অদম্য ইচ্ছা শিশুকাল থেকেই মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

১৯৫২ সালে শাহজাদপুর হাই স্কুল থেকে আমি ২য় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করি। অতঃপর নানারূপ প্রতিকুলতায় আমার কলেজে পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। ১৯৭২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আই. এ পাস করি। শাহজাদপুর হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে অবসর সময়ে আমার কাকা ড. মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ডিসপেন্সারিতে কমপাউন্ডারের কাজ করে ডাক্তারি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করি।

১৯৫৩ সালে এক বন্ধুর সঙ্গে ময়দানদীঘি গ্রামে এসে পল্লীচিকিৎসক হিসাবে সর্টট্রেনিং নিয়ে চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করি এবং মনের তাকিদে বিভিন্ন ইসলামী বই পড়বার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। সে বছরই চাটমহর থানার খানমরিচ ইউনিয়নের পরমানন্দপুর (পুকুরপাড়) নিবাসী হযরত মওলানা আব্দুল মজিদ খোন্দকার পীরসাহেবের হাতে ইসলামে বয়েত হই। অতঃপর সিরাজগঞ্জ কোর্টের প্রথম শ্রেণীর মাজ্যিস্ট্রেট ফয়েজ আহমদ সাহেবের কোর্টে এফিডেভিট করে আমার হিন্দুনাম পরিবর্তন করে আমিনুল ইসলাম খান চক্রবর্তী নাম ধারণ করি। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে দুধবাড়িয়া গ্রামের মরহুম জয়ধর মোল্লার প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ রেহানা বানুকে বিয়ে করি। আমাদের চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। আমি আমার পরকালের নাজাতের জন্য মুসলমান ভাইদের দুআপ্রার্থী। আমি বর্তমান উল্লাপাড়া থানার ময়দানদীঘি গ্রামে বাস করছি। আমি পি, টি, আই, পাস করে ১৯৪৭-১৯৯৩ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি এবং বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত আছি।*

---

* ইসলামের ছায়াতলে, পৃষ্ঠা-১৭১, অধ্যক্ষ এমএ হামিদ।

বেগম রওশন রিজিয়া খানম

বাংলাদেশের স্বনামধন্য দানবীর, বিখ্যাত সমাজসেবক ও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরনিবাসি রায়বাহাদুর রনদাপ্রসাদ সাহার বড়মেয়ে বিজয়ী রায়চৌধুরী টাঙ্গাইল জামে মসজিদের ইমামসাহেবের কাছে স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামী নাম রাখা হয় বেগম রওশন রিজিয়া খানম। তিনি জনাব শওকত আলী খাঁ বার-এট-ল এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এ বিবাহ উপলক্ষে ঢাকার শাহবাগ হোটেলে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় হাইকোর্টের জজ, ব্যারিস্টার, এডভোকেট, কুটনৈতিক মিশনের পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, তমিজ উদ্দিন খান, এ কে ব্রোহী, বসন্তকুমার দাস, মি. সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখসহ দু' শতাধিক মেহমান যোগদান করেন।*

ইভা স্রোভিক আয়েশা

পোলান্ডের মেয়ে ইভা স্রোভিক আয়েশা ১৯৯৯ ঈসায়ী সালে ইসলামগ্রহণ এবং বিয়ে করেন বাংলাদেশী আশরাফুল ইসলাম সিদ্দিকীকে ; কিন্তু তিনি বাংলাদেশে এখনও আসেননি। তাঁকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "আপনি কি বাংলাদেশে যেতে আগ্রহী?" তিনি বলেন : জী হ্যাঁ, আমি আমার স্বামীর পরিবার পরিজনকে দেখবার জন্য বাংলাদেশে যেতে চাই। তবে স্থায়ীভাবে সেখানে থাকবার ইচ্ছা নেই। অবশ্য একসময় আমার ইচ্ছা ছিল— সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবার; কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সবমানুষ বোধ হয় আমার স্বামীর মতো। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা ভুল। এখানকার বাংলাদেশী নারী-পুরুষের সঙ্গে মিশে আমি বুঝতে পেরেছি, তাদের শতকরা দশ জন Practical Muslim আর বাকিরা Traditional Muslim। আমি এমন দেশে স্থায়ী নিবাস গড়তে চাই, যেখানে ইসলামী শরিয়ত পরিপূর্ণভাবে কায়েম আছে এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে কোনও বাধা নেই।**

---

* মাসিক 'আমাদের দেশ' পাবনা, জুলাই, ১৯৫৯।
** মাসিক মদীনা, নবেম্বর, ২০০১, (পৃষ্ঠা-২৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম

ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, "ইসলামের সৌন্দর্য ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে আমি ইসলামে দীক্ষিত হলেও আমার ইসলামগ্রহণের কথা ইহুদিদের কাছে গোপন রেখেছিলাম। কেননা আমার প্রতি তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। আমার ইসলামগ্রহণের কথা আমার পরিবার-পরিজনদের কাছে প্রকাশ করি এবং তাদের এ ধর্মগ্রহণ করতে উৎসাহিত করি। তখন তাঁরাও ইসলামগ্রহণ করেন। আমার ফুফু খাদিজা বিনতে হারিসও ইসলামগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন উন্নত ও আদর্শ মুসলমানে রূপান্তরিত হন।"

পরে ইহুদিদের প্রশ্নের জবাবে তাদের বলি : "তোমরা রাসুল (স) কে মিথ্যা অপবাদ দিওনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করছি। তাঁকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তাঁরা আমাকে বললো, তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমাকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। আমি তাদের বলি : হে ইয়াহুদিসমাজ; আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আল্লাহর নবী তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল। তোমাদের কাছে মজুদ 'তাওরাত' কিতাবে তোমরা তাঁকে, তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ পাচ্ছো। সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান আনো।"

ইসলামগ্রহণের পর থেকে তিনি একজন পাকা মুমিনরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি তৎকালীন উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের মধ্যে একজন। তিনি রাসূলে আকরাম (স)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হবার দাবিদার ছিলেন।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম ও ইসলামের ছায়াতলে, অধ্যক্ষ এম. এ হামিদ, পৃষ্ঠা : ১২৭।

রেভারেন্ড পল

রেভারেন্ড পল (Reverend Paul) উগান্ডার একজন খৃস্টধর্মপ্রচারক। তিনি এ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের স্টাখুন গোত্রের ধর্মীয় নেতা ও ধর্মযাজক ছিলেন। পেশাগত দিক দিয়ে একজন স্কুল পরিদর্শক। ১৯৭৫ সালের ২৫ মে উগান্ডার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা খাদি শেখ সুলেমান সাহেবের অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি কেন ইসলামগ্রহণ করেন তাঁর নিজের কথায় শোনা যাক :

দীর্ঘকাল ধরে খৃস্টানধর্ম প্রচারের কাজে রত ছিলাম। খৃস্টানধর্মকে সত্যধর্ম বলে প্রচার করলেও আমার মনে সংশয় ছিল। কোনওমতেই মনের সন্দেহ দূর করতে পারি না। মারাত্মক সন্দেহের দোলায় আমার দিন কাটছিল।

মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থরাজি পাঠ করতে থাকি। কতিপয় ইসলামী গ্রন্থ পাঠ করে ক্রমে ক্রমে আমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু নিজের মান, সম্মান ও পদমর্যাদার কথা চিন্তা করে আমার মন ইসলামগ্রহণ করতে সম্মত হয় না।

একদিন পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই "পরকালে অবিশ্বাসীদের স্থান হবে জাহান্নামে এবং তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে"। এ-কথা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। ২৪ মে, ১৯৭৫ রাতে সত্যধর্মগ্রহণের জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে কান্নাকাটি করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে শুয়ে পড়ি। রাতে স্বপ্নে দেখি, অতি সুন্দর চেহারার এক বুজর্গ ব্যক্তি আমাকে ইসলামগ্রহণের জন্য সান্ত্বনাসহকারে উপদেশ দান করছেন।

পরদিন আনন্দিত মনে পার্থিব মান-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামগ্রহণ করি। যারা হিদায়েতের মুহতাজ, মহান আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত দান করুন। হিদায়েত একমাত্র আল্লাহ্পাকের হাতে।

উগান্ডার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন পরবর্তীকালে রেভারেন্ড পল-এর ইসলামগ্রহণের খবর জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অভিনন্দিত করেন।*

---

* ইসলামের ছায়াতলে, অধ্যক্ষ এম এ হামিদ, পৃষ্ঠা : ১২৮।

দাবৃবু দামারিস

শ্রীলংকার অধিবাসী 'দাবৃবু দামারিস' নামে একজন খৃস্টান-ধর্মযাজক নিজ উপলব্ধির আলোকে ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীলংকায় খৃস্টধর্মের শিক্ষা প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। শিশু-কিশোরদের মাঝে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসাবলী প্রচার ও শিক্ষাদানই ছিল তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব। শিশু-কিশোরদের কচি-কোমল অন্তরে তিনি এ ধর্মের নীতিমালা ও বিশ্বাস এভাবে দৃঢ়মূল করে দিতেন যে, অতঃপর তারা খৃস্টধর্ম ছাড়া অন্যকোনও ধর্মের কথা ভাবতেও পারতো না, গ্রহণ তো দূরের কথা। তাঁর এহেন কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই একদিন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার সুযোগ এসে যায়। মূলত তিনি ছিলেন একজন বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিধারী।

যখন তাঁর সামনে সত্যের আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হলো, তখন খৃস্টবাদের অন্তসারশূন্য মায়াজাল ও এধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সেবায় নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দেবার মোহ এ সাহসী পুরুষকে কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারলো না। সত্য সুস্পষ্ট হবার পর এসব ত্যাগ করে আসতে কোনও কিছুই বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি তিনি। আল্লাহর হিদায়াত লাভের ফলেই নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তিনি সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে পড়লেন। একদিন খৃস্টধর্মের তিমিরাচ্ছন্নতা কাটিয়ে ধর্মযাজকের পদ বিসর্জন দিয়ে তিনি ইসলামের খাদিম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এ খৃস্টধর্মগুরুর ইসলামগ্রহণের ঘটনাটি নিম্নে বর্ণিত হলো :

আজ থেকে বেশ ক'বছর আগের কথা। 'দাবৃবু' তখন চাকুরি নিয়ে সউদি আরবে আসেন। তখন তাঁর ধারণা ছিল মুসলমানরা হয়তো মূর্তিপূজক। ভ্রান্ত ধারণার বশে তিনি ভাবতেন মুসলমানরা বোধ হয় আকাশের চাঁদকে পূজা দেয়। কারণ, তিনি দেখতেন মাসের শুরুতে চাঁদের উদয়াস্ত নিয়ে বেশ মাথা ঘামায় তারা। সেদিন তাঁর জানা ছিল না যে, মুসলমানদের আল্লাহর এবাদত করবার প্রবণতার বহিঃপ্রকাশই এ আচরণ। আল্লাহর দেয়া বিধান রমযান, ঈদ ও হজ্বব্রত ইত্যাদি পালনের সঠিক দিনক্ষণ জানবার মানসেই তারা এরূপ গুরুত্ব দেয় চাঁদ দেখবার। দৈনিক পাঁচবার সালাতের ওঠা-বসা দেখে তিনি মনে

করতেন, এটা চন্দ্রপূজার ক্রিয়াকান্ডের মতোই তো দেখা যায়! তাঁর অস্পষ্ট ধারণায় মুশরিক মূর্তিপূজারিরা এরূপেই তাদের মূর্তির এবাদত করে বলে তিনি জানতেন। কাজেই একদা নিজেকে নিজে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "এ লোকদের তো আজ সত্যসত্যই মূর্তিপূজকরূপেই দেখতে পাচ্ছি, এরা পূজা করছে উদিত আকাশের চাঁদের!"

আসলে তাঁর মনে এসব ভুল ধারণা জন্মেছিল অন্য এক কারণে। এসব বিভ্রান্তিকর জগাখিচুড়ি মার্কা বিষয় নাকি রসূল (স) থেকে বর্ণিত বলে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তাঁকে কেউ বলেছিল। এ কারণে তাঁর চিন্তার বহু দূরে ছিল ইসলাম। ক'বছর আগেও যদি কেউ তাঁকে ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতো, তখন তিনি হেসে লুটোপুটি খেতেন।

দাব্‌বু যখন ভিসা নিয়ে সউদি আরবে আসেন, তখন মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর মানসপটের চিত্র ছিল এই যে, মুসলমানরা হলো বহু সংস্কৃতি, হরেক মতাদর্শধারী একটি জাতি। কিন্তু সামান্য ক'দিন পরেই তিনি যখন দেখলেন, আযানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা দোকানপাট ও সকল কর্মব্যস্ততা বন্ধ করে দিয়ে মসজিদে এসে সমবেত হচ্ছে, তখনি তাঁর চেতনা জেগে ওঠে; তিনি সচেতন হন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে বড়ই কঠিন ঠেকলো। আর তিনি ভাবতে শুরু করলেন, এতো এক রহস্যময় ব্যাপার! মুসলমানদের হৃদয়রাজ্যে ধর্মের অনুভূতি নিশ্চয়ই অনেক গভীরে প্রোথিত। তিনি আশ্চর্য হলেন ধর্মাচারের প্রতি মুসলমানদের অকৃত্রিম ভক্তি দেখে; নির্ধারিত এবাদতসমূহ যথাসময়ে সম্পাদনে তাদের গুরুত্ব ও আকর্ষণ লক্ষ্য করে বাস্তবজীবনে ইসলামের কল্যাণ, সুন্দর নীতিমালা ও মুসলমানদের সুশৃঙ্খল পরিমার্জিত আচরণের আলোকে তিনি মুগ্ধ হন। ইসলাম যে একটি চিরন্তন সত্য দীন, তা পালন করলে যে বিশ্বে ন্যায় ও ভালোবাসা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এ অনুধাবন গভীরতর হতে থাকে।

এক পর্যায়ে তাঁর অন্তরে এ-দীন সম্পর্কে জানবার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়, জাগ্রত হয় চরম অনুসন্ধিৎসা। ফলে শুধু জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করলেন না তিনি। বরং পবিত্র কুরআনের একটি অনুবাদ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। উদ্দেশ্য, মূল উৎস থেকে ইসলামের অনুপম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ। অতঃপর তাঁর এক বন্ধুর কাছে কুরআনের একটি অনুবাদ কপি দেখতে পেয়ে তা কিছু সময়ের জন্য চেয়ে নেন। অতঃপর সেদিন উৎফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরে ভোরের শুভ্ররেখা প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত সারাটি রাত জেগে তা পড়তে থাকেন। আল্লাহর কালামের মর্মস্পর্শতায় তাঁর দু'চোখ বেয়ে তখন নেমে এসেছিল অবাধ অশ্রুর বন্যা। এভাবে ফজরের আযানধ্বনি

তাঁর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হওয়া মাত্রই তিনি আকুল হয়ে যেন নিজের অজান্তেই গোসল করে সে-ওয়াক্তের সালাত আদায় করে নেন, যেমন করে থাকে মুসলমানরা। প্রথানুসারে যেহেতু একজন নওমুসলিমের ঈমান আনবার বিষয়টি প্রকাশ্যে জানাতে হয়, অন্যথায় সম্ভব হয় না পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নব্বীর যিয়ারত; তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে গিয়ে ইসলামগ্রহণের পদ্ধতি কি তা বাতলে দিতে বলেন। পরে শরয়ী বিচারপতির আদালতে গিয়ে ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় নবজন্মের ঘোষণা দিয়ে দাব্বু দামারিস আজ 'মুহাম্মদ শরিফ' নামে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীলংকার খৃস্টান ধর্মযাজক দাব্বু ইসলামগ্রহণ করবার পর শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। শুরু হয় নতুন ব্যক্তিত্ব বিকাশের অগ্রযাত্রা। তিনি অনুধাবন করতে লাগলেন ইসলাম শুধু জেনে নিয়েই তার বসে থাকলে চলবে না। এর বাইরেও কিছু কর্তব্য রয়েছে— যা ব্যক্তির কাছে ইসলাম অবশ্যই দাবি করে থাকে। আর তা হলো ইসলামের হিদায়াতের রৌশনিতে অন্যকেও আপ্লুত করা। বিশেষ করে যারা খৃস্টধর্মের ভ্রান্তি ও গোঁড়ামির নিগড়ে আবদ্ধ, সেসব ক্যাথলিক ছাত্রের তো ইসলামের অমিয় ধারায় সিক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। সে-মতে তিনি তাঁর হিদায়াত প্রাপ্তি ও ইসলামরূপ নিয়ামতে শোভিত হবার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে পরিজনের কাছে একটি পত্র পাঠান এবং ইসলামগ্রহণ যে তাদের পরকালে দোযখের অগ্নি থেকে নিস্কৃতি দেবে সেকথা বলতেও বাদ দেননি তিনি। এভাবে তিনি লাগাতার দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সত্য ও বাস্তবধর্মী। তাঁর পরিজন ও পড়শিরা ইসলাম কবুল না করে পারবে না। যে দিন আল্লাহ তাদের হিদায়াত দেবেন, ঈমান এনে তাঁরা সুপথপ্রাপ্ত হবেনই। সত্যিই ব্যর্থ হয়নি তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা। ইসলামগ্রহণের পর তিনি যে সত্যিকার মর্দে মুমিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ফলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনসহ আগের খৃস্টান ছাত্রদের বিরাট এক জামায়াত ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়। মুহাম্মদ শরিফ বলেন, এ নওমুসলিমদের উৎসাহিত করবার জন্য একটি উত্তমপন্থা ছিল— বাইবেলে বর্ণিত সমকালীন যুগে যিশুর মারামারি হানাহানির ঘটনাগুলোর সঙ্গে পবিত্র কুরআনে বিবৃত সে সম্পর্কে সংক্ষেপে যুক্তিগ্রাহ্য পটভূমি তুলে ধরা। বর্তমানে মুহাম্মদ শরিফ একজন মহান ইসলামপ্রচারক। তিনি বিভিন্ন দেশের আটটি ভাষায় পারদর্শী। এসব ভাষার লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে এখন তিনি ব্যাপৃত। ইসলামী দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথমত তিনি লক্ষ্য করেছেন— খৃস্টবাদের তুলনায় ইসলামী সাহিত্যের অপ্রতুলতা। খৃস্টানদের পুস্তক-পুস্তিকা যেখানে ব্যাপকভাবে ছড়ানো, সেখানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার-পুস্তিকা নিতান্তই সীমিত।

দ্বিতীয়ত তিনি যা লক্ষ্য করেছেন, তা হলো ইসলাম-প্রচারকরা নানা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের জ্ঞানের আলোকে ইসলামের হাকিকত ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে দাওয়াতি তৎপরতা চালাতে গিয়ে অতিকষ্টে সমস্যাসঙ্কুল পথে এগুচ্ছেন। তাই অনৈসলামী রাষ্ট্র ও জনপদে ইসলামের মৌল ধারণা সাধারণভাবে তুলে ধরতে হবে। আর তা করতে হবে খৃস্টানদের কর্মকৌশলের পূর্ণ অনুধাবনের আলোকে যথোচিত পন্থায়। সুতরাং তিনি খৃস্টান জনপদে ইসলামী দাওয়াতের কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বনের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের কাছে প্রথমত ইসলামই যে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত গ্রহণযোগ্য দীন, সে-বিষয়ে মৌলিক ধারণা দিতে হবে। পরে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের আলোকে হযরত ঈসা (আ) যে আল্লাহর নবী এবং তাঁর মাতা যে বেহেশতী নারীদের অগ্রগামিনী তা বোঝাতে হবে। তাদের সম্পর্কে মুসলমানদেরও যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তাদের যে মুসলমানরা সম্মানের অতি উচ্চাসনে আসীন বলে বিশ্বাস করে ও মানে, তাও বুঝিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন মজিদের অনুবাদ কপি ও ইসলামী মৌল আক্বিদা সম্পর্কিত পুস্তকাদি তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এজন্য অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় মাতৃভাষায় প্রচুর বইপুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে তাও পূরণ করতে হবে। বহু অমুসলিম এমন আছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী। কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধকতা তাদের এ অনুসন্ধিৎসার পথে পাহাড়সমান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগে এ অভাব পূরণের প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সামনে পথ দেখানোর মতো কেউ বা কোনও কিছু বর্তমান না থাকায় তার এ আবেগ-আবেদন অপূর্ণই থেকে যায়। অথবা কোনও পথ পেলেও ইসলামের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পথে তাকে পরিচালিত করবে এমন উপকরণ থাকে অপ্রতুল। ফলে এ ব্যক্তি খৃস্টানদের সাহিত্য পড়েই প্রভাবিত হয়ে পড়ে আর ইসলামের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়। কারণ, সঠিক ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিমপণ্ডিত মনীষীদের রচনা উপযুক্তভাবে তাদের হাতে পৌঁছায় না। তিনি বলেন, খৃস্টবাদের প্রচারের জন্য খৃস্টান ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেভাবে অর্থ ব্যয় করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৎপর, সে তুলনায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে তো কিছুই করা হচ্ছে না বলা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু রাষ্ট্র ও কতিপয় সংস্থা এক্ষেত্রে যতটুকু করছে, তা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খুবই অপ্রতুল।

মুহাম্মদ শরিফ বর্তমানে 'বুরায়দা তাওইয়্যাতুল জালিয়াহ' সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বে ইসলামী দাওয়াতকার্য আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দীনের ক্ষেত্রে একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি।*

---

* 'মুসলিম জাহান', ১ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা ও 'কেন মুসলমান হলাম?' পৃষ্ঠাঃ ১২৯-১৩৪।

ড. জিয়াউর রহমান আযমী

ড. জিয়াউর রহমান ইসলামগ্রহণের পর দক্ষিণ ভারতের একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী জ্ঞান লাভ করেন। তারপর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর মক্কায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং জামিয়া আজহার থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথমে তিনি রাবিতায়ে আলমে আল্-ইসলামীর এক গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

কুফরের অন্ধকার থেকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভকারী এ সৌভাগ্যবানের একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয় উর্দু ডাইজেস্ট, জানুয়ারি ১৯৭৮ ঈসায়ী সংখ্যায়। সাজ্জাদ হিজাজী কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাতকারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন :

"১৯৪৩ সালে ভারতের আজমগড় জেলার এক মহকুমা শহরের হিন্দু পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা ছিলেন চৌধুরী অর্থাৎ অনেক ভূসম্পত্তির মালিক। কলকাতায়ও আমাদের বিরাট ব্যবসা ছিল। আমার প্রাথমিক শিক্ষা মহকুমার এক মডেল স্কুলে শুরু হয়। তারপর আজমগড় শিবলি কলেজ সংশ্লিষ্ট হাইস্কুলে ভর্তি হই। এখানেই আমি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হই। এখানেই আমার জীবনপথের দিক পরিবর্তন হয়।

হিন্দুধর্ম যথারীতি অধ্যয়ন করিনি। তবে একটি হিন্দুপরিবারে জন্মগ্রহণ এবং চারপাশের কঠিন ধর্মীয় পরিবেশের কারণে আমি হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস ও তার আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও ছিলাম। তবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমার চরম গোঁড়ামিও ছিল। হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মকেই আমি সঠিক মনে করতাম না। কিন্তু পড়াশোনার পর ইসলাম যখন এ দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো যে, একমাত্র এটাই সত্যধর্ম, তখন আমি নতুন করে হিন্দুধর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি। এ উদ্দেশ্যে কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের শরণাপন্ন হই। তিনি গীতা ও বেদের বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু

তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হিন্দুধর্মের পৌরাণিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে আত্মতুষ্টির কোনও উপাদানই নেই। এ কারণেই হিন্দু যুবশ্রেণীর মধ্যে ধর্মের পৌরাণিক ধারণা ও অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে চরম অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।

খাজা হাসান নিজামীর হিন্দি ভাষায় অনূদিত কুরআন শরিফ পড়বার সুযোগ আমার হয়। আল্লাহর অতিরিক্ত মেহেরবানি ছিল যে, শিবলি কলেজেরই একজন অধ্যাপক তিনি। এক সাপ্তাহিক দারসে কুরআন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ দারস-চক্রে যোগদান করবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুমতি দেন।

ইসলামী গ্রন্থাবলীর ধারাবাহিক অধ্যয়ন এবং দারসে কুরআনে নিয়মিত যোগদান আমার মধ্যে ইসলামগ্রহণের অনুরাগ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মনের মধ্যে কিছু ঘটনা আমার রুহানি সফরের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো এবং থমকে দাঁড়িয়ে যেতাম। আমার সবচেয়ে বড়ো পেরেশানি এ ছিল যে, আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবো। বিশেষ করে আমার প্রিয় ছোটবোনদের ব্যাপারে খুবই পেরেশান ছিলাম। কিন্তু ইত্যবসরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার ফলে কোনও পরিণামেরই পরোয়া না করে ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ফেলি। সেই শিক্ষক যার দারসে কুরআনে আমি শামিল হতাম, একদিন সূরায়ে আনকাবুতের দারস দেন। তিনি প্রথমে যে আয়াত পড়েন তার অর্থ : "যেসব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেয়, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো; সে নিজের একটা ঘর বানায়। আর সব-ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর।" (আয়াত ৪১)।

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহকে ছাড়া আর সকল সহায় ও পৃষ্ঠপোষকতা মাকড়সার জালের মতো দুর্বল, ক্ষণভংগুর ও ভিত্তিহীন। তাঁর এ ব্যাখ্যা এবং হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভংগী আমাকে আলোড়িত করে এবং আমি অবিলম্বে ইসলামগ্রহণ করবার এবং সকল সহায় পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকে সহায় হিসাবে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করি। এ বৈঠকেই আমি আমার শিক্ষককে বলি, আমি এক্ষুণি মুসলমান হতে চাই। সেই সঙ্গে নামাযের কোনও বই তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে 'আল হাসনাত' রামপুর কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দিভাষায় লিখিত 'নামায কেয়সে পড়হে' শীর্ষক বইটি দেন। আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নামায শিখে ফেললাম। মাগরিবের নামাযের পূর্বে দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম এবং যথারীতি ইসলামগ্রহণ করলাম। তখনকার আমার মনের অবস্থা কখনও ভুলতে পারবো না।

ইসলামগ্রহণের পর তা জানাজানি হতে কয়েক মাস লেগে গেল। প্রথমে আমি মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়লাম। এর ফলে আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

নামাযের সময় চুপে চুপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে নামায পড়ে আসতাম। এভাবে প্রায় চার মাস অতীত হয়। কিন্তু আমার এ-তৎপরতা বেশিদিন গোপন রইলো না। আমি আজমগড়ে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকতাম। তাঁর ছেলে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে আমার মধ্যে পরিবর্তন দেখবার পর প্রথমে আমাকে এভাবে বোঝাতে থাকে যে, ইসলামগ্রহণের পর আমি পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। কিন্তু আমাকে অবিচল দেখবার পর সে কলকাতায় আমার পিতার কাছে পত্র লিখে সত্বর আসতে বলে, নতুবা তিনি আমাকে হারাবেন। পিতা পত্র পাওয়া মাত্র আজমগড় চলে আসেন। তারপর আমি সেসব অবস্থার সম্মুখীন হই, যার আশংকা করেছিলাম। অবশ্যি তার জন্য আমি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম। সেসবের বিস্তারিত বিবরণ আমার 'গংগা সে যমযম তক্' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বলছি।

আমার পিতা কলকাতা থেকে আজমগড় আসবার পর সরাসরি আমাকে কিছু বলবার পূর্বে আমার অবস্থা পর্যালোচনা করেন। অতঃপর আমার ওপর জিন-ভূতের আছর পড়েছে মনে করে বিভিন্ন পণ্ডিত-পুরোহিত নিয়োজিত করে আমাকে চিকিৎসা করাতে থাকেন। কোনও জিন-ভূত হলেতো ঝাড়-ফুঁকে বিদায় হয়ে যেতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো ভিন্নতর। পন্ডিত-পুরোহিত আমাকে যা কিছু খেতে দেন তা আমি বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে ফেলি। এ চিকিৎসায় ব্যর্থ হওয়ায় পিতা আমাকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যান। পিতার ধারণা ছিল, যেহেতু মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগই এ রোগের মূল কারণ, সেজন্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যই তিনি আমাকে কলকাতা নিয়ে যান। কিন্তু যোগাযোগ কিভাবে ছিন্ন হতে পারে? কলকাতা পৌঁছবার পর পরই সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। এতে আমার নামায পড়বার সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। পিতা এসব জানতে পেরে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়েন। পিতা সঙ্গে সঙ্গেই এলাহাবাদে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি আমাকে পাঠিয়ে দেন। এখানে আবার ঝাড়-ফুঁকের সঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিত-পুরোহিত আমাকে সমানভাবে বোঝাতে থাকেন। তাঁরা বলেন, ইসলামের চেয়ে হিন্দুধর্ম

অধিকতর পূর্ণাংগ। আমি তাদের কোনও প্রশ্ন করলে জবাব তাঁরা দিতে পারতেন না।

তাঁরা বলেন, আচ্ছা হিন্দুধর্ম যদি পরিত্যাগই করতে হয়, তা হলে মুসলমান হবার পরিবর্তে খৃস্টান হয়ে যাও। কারণ মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা এবং খৃস্টানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এ কথারই প্রমাণ করে যে, ইসলামের তুলনায় খৃস্টধর্ম অনেক শ্রেয়। জবাবে বলি, আমি মুসলমানদের দ্বারা নয়, বরঞ্চ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মুসলমান হয়েছি। অবশেষে কিছুকাল ঝাড়-ফুঁক ও আলাপ আলোচনার পর আমাকে দুরারোগ্য বলে ঘোষণা করা হলো এবং পিতা আমাকে পুনরায় বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ির লোকদের অবস্থাতো পূর্ব থেকেই বড়ো মর্মান্তিক হয়ে পড়েছিল। আমাকে একটি কামরায় থাকতে দেয়া হয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। মা-বোন, আত্মীয়স্বজন ইসলাম পরিত্যাগ করবার জন্য আমাকে অনুরোধ ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। আমাকে নিবৃত্ত করবার কোনও চেষ্টাই বাকি রইলো না। অবশেষে বড়ো কঠিন পদক্ষেপ নেয়া হলো। বাড়িশুদ্ধ লোক অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। আমার সামনে তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে অবিচল থাকবার তওফিক দান করেন। তাঁদের সকল চেষ্টা-তদবির ব্যর্থ হয়।

তারপর এক নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়। তাঁরা এক মৌলভী নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, ইসলাম কাউকে এ অনুমতি দেয় না যে, পিতামাতার জীবদ্দশায় তুমি ইসলামগ্রহণ করবে। তাঁরা যতদিন জীবিত থাকেন, ততোদিন তুমি ইসলাম তোমার মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখ এবং নামায থেকে বিরত থাক। মৌলভীসাহেবের কথা আমার কাছে বড়ো অদ্ভূত মনে হলো। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমার অধিক জ্ঞান না থাকায় তাঁর পরামর্শ ইসলামেরই নির্দেশ মনে করে তা মেনে নিলাম। এতে বাড়ির লোকজন ও আত্মীয়স্বজন আনন্দিত হন।

অল্প কিছুদিন পরই এ রহস্য উদঘাটিত হলো যে, ওই মৌলভী এমন এক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত— যার লোকেরা নিজেদের মুসলমানদের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে বিশ্বাস করে। ইসলামের সঙ্গে ওই মৌলভীর এ ফতোয়ার কোনও দূরতম সম্পর্কও নেই। আমি আগের মতো আবার নিজেকে ইসলামের ছাঁচে ঢালবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করি এবং রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে থাকি। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করি।

কিছুদিন পর আমি একটি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমন সময়ে স্থানীয় হিন্দুদের একটি দল মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিদের ওপর আক্রমণ চালায়। তখন মসজিদে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমি মুসলমান হবার কথা ঘোষণা করি এবং বলি যে, হিন্দুধর্মের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বাড়ি এসে দেখলাম, সকলে মর্মাহত। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলাম। অবশেষে পিতা একটি চরমপন্থী হিন্দু-সংগঠনকে আমার পেছনে লাগিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বিচিত্র কুদরতে আমাকে রক্ষা করেন। এরপরও আমাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

আমার বন্ধু-বান্ধবরা শহরের বাইরে একজনের গোয়ালঘরে আমাকে লুকিয়ে রাখেন হিন্দু চরমপন্থী সংগঠনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তারা শহরের সকল বাড়ি ও মসজিদে খুঁজে আমাকে না পেয়ে অন্যদিকে চলে যায়। এ সুযোগে একরাতে একজন সঙ্গীসহ ছদ্মবেশে রেলস্টেশনে যাই এবং অন্য এক শহরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানকার মুসলমানরা আমার মুসলমান হবার কথা জানতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের অনুরোধেই আমি সেখানে যাই। সেখানে একটি দীনী মাদরাসায় আমার ভর্তি হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওই হিন্দুসংগঠনের লোক সেখানেও পৌঁছে যায়; ফলে আমার সেখানে থাকা আর সম্ভব হয় না। সেখান থেকে বহুদূরে বাদাউনের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটা ছিল হিন্দুসংগঠনের নাগালের বাইরে। এখানে এক বছরের অধিক সময় কাটতে না কাটতেই হিন্দুসংগঠনটি সেখানে পৌঁছে যায়। তাদের সেখানে পৌঁছাবার আগেই অলৌকিকভাবে তাদের অভিসন্ধি জানতে পারি। ফলে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারি। এবার আমার গন্তব্য ছিল দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ। সেখানকার বিখ্যাত দীনী প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইসলাম'-এর কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই আমার সম্পর্কে জানতেন। তারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহআদরসহ গ্রহণ করেন। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এখানে অত্যন্ত একাগ্রহতার সঙ্গে প্রায় ছ'বছর যাবত দীনী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাই।

পাঁচবছর পর আমি আমার জন্মস্থানে যাবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করি। যিনি আমাকে সর্বপ্রথম ইসলামী বই পড়তে দিয়েছিলেন, তার বাড়ি গিয়ে উঠি। আমার আসবার খবর জানতে পেরে দলে দলে লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। আশ্চর্যের বিষয়— তাঁদের মধ্যে অনেক হিন্দুও ছিলেন। এর কারণ পরে জানতে পারলাম যে, তারা যখন জেনেছে এতো কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পরও আমি ইসলামের ওপর অবিচল ছিলাম এবং কোনও লোভলালসা ও ভয়ভীতি আমাকে পথচ্যুত করতে পারেনি, তখন তাঁদের ঘৃণা শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়।

এরই মধ্যে ঈদুলফিতর এসে গেল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো যে, আমি ঈদের নামায পড়াবো এবং খুতবাও দেবো। এর ফলে চারদিক থেকে হাজার হাজার লোক মিছিল করে ঈদগায় হাজির হয়। ঈদগার চারধারে বহু হিন্দুও দাঁড়িয়ে যায় আমার খুতবা শোনার জন্য। তারা অবাক হলো এ ভেবে যে, এমন এক ব্যক্তিকে যে কিছুকাল আগেও হিন্দু ছিল, মুসলমানরা তাকে তাদের ধর্মীয় নেতা ও নামাযে ইমামের মর্যাদা দান করলো কি করে। তারা ইসলামের এ দিকটি দেখবার এবং আমার খুতবা শোনার পর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

দারুল ইসলাম মাদ্রাজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর সউদি আরবে গিয়ে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে মক্কায় অবস্থিত বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি এবং জামিয়া আজহার, কায়রো থেকে পিএইচ. ডি. লাভ করি।

বর্তমান যুগে মিল্লাতে ইসলামিয়া যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তাহলো : বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা, মতবাদ ও 'ইজম' যা বিগত শতাব্দের শেষার্ধ এবং এ-শতাব্দের প্রথমার্ধ থেকে খাঁটি বস্তুবাদের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান দুনিয়ার একটা বিরাট অংশ নাস্তিক চিন্তাধারা ও মতবাদের পাদপীঠ হয়ে পড়েছে। এ-মতবাদ মানবজাতিকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মানুষের সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। বর্তমান জগত এ ইজমের প্রতি ত্যক্তবিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ও সংগঠিত পন্থায় ইসলামী বিশ্বে তার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দুর্ভাগ্যবশত তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বয়ং মুসলমানদের তরফ থেকে কিছুসংখ্যক দালাল পাওয়া গেছে। আমার মতে, এ-অবস্থায় পেরেশান হবার কোনও কারণ নেই। ইসলাম কোনও মানুষের নয়, আল্লাহর অবতীর্ণ দীন। মনগড়া চিন্তাধারা ও মতবাদ তার মুকাবেলায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এখন এ চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় সাফল্য লাভের জন্য মুসলিম চিন্তাবিদদের ময়দানে নামতে হবে এবং ওসব পথভ্রষ্টকারী চিন্তা ও মতবাদের মুকাবেলায় প্রকৃত ইসলাম তুলে ধরতে হবে। এটা করতে পারলে আমার বিশ্বাস, নাস্তিক মতবাদ বালির বাঁধের ন্যায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে।"*

---

* অধ্যাপক আবদুল গনী ফারুক সংকলিত 'হাম কিউ মুসলমান হুয়ে' গ্রন্থ ও 'কেন মুসলমান হলাম?' পৃ. ৬৪-৬৯।

দাউদ খান দেশমুখ

হৃদয়হীন হিংস্র জাত্যাভিমানের যাঁতাকলে পিষ্ট আজ বিশাল ভারতের বিপুল জনতা। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সিংহভাগ এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার আত্মসাতকারী বর্ণহিন্দু সমাজের অমানবিক পেষণে পর্যুদস্ত ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজ বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। ১৯৮১ সনে দক্ষিণ ভারতের মিনাক্ষীপুরমের বিপুল সংখ্যক হরিজন সে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছে। তখনকার সে সম্মিলিত ধর্মান্তরগ্রহণের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলো মারমুখো ভূমিকাগ্রহণ করবার পরও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ মোটেই কমেনি।

হিংস্র সাম্প্রদায়িক শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক। দিল্লি থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক নয়ী-দুনিয়ায় প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, আগ্রার জনপ্রিয় হিন্দি দৈনিক 'হিন্দুসেনানী' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ একজন সঙ্গীসহ আগ্রার একটি মসজিদে হাজির হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছেন। তাঁর ইসলামী নামকরণ করা হয়েছে 'দাউদ খান'। শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক, একটি জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার প্রধানসম্পাদক এবং একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মীরূপে সমগ্র উত্তর প্রদেশে বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত। কেন তিনি ইসলামগ্রহণ করলেন, এ সম্পর্কে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন :

"বর্তমানে ভারতীয় হিন্দুসমাজ সামাজিক শোষণ এবং নির্যাতনের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার চল্লিশ বছর পরও দলিতশ্রেণী মানুষের অধিকার লাভ করতে পারেনি। এখনও উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকজনকে মানুষ বলেই যেন স্বীকার করতে চায় না। জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরে তো বটেই, দেবমন্দিরে পর্যন্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সে অধিকারের দেয়াল লংঘন করা দলিত-

সম্প্রদায়ের কোনও মর্যাদাবান জ্ঞানসাধকের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এ ধর্ম শোষণের হাতিয়ার ছাড়া আর কি? এটা একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায়-অনাচারের বাহন হতে পারে, মানুষের ধর্ম হবার যোগ্যতা রাখেনা।"

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ আরও বলেন, "উচ্চবর্ণের শোষকদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার লক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতের বিপুলসংখ্যক দলিতশ্রেণীর লোক ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করেছে। এ-ধর্মান্তরের ফলে সংশ্লিষ্ট লোকগুলো নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে। আগে যেখানে তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতোও কেউ ছিল না, বর্তমানে সে লোকগুলোই উন্নততর জীবনের সন্ধান লাভ করেছে।

নওমুসলিম সে-লোকগুলোর পরিবর্তিত জীবনযাত্রাকে নজির হিসেবে তুলে ধরে হিন্দুধর্ম ব্যবসায়ীরা সারা ভারতে একটা তুমুল তান্ডবের সৃষ্টি করেছিল। এ বলে ওরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো-ডলারের দ্বারা বশীভূত করে এসব লোককে ধর্মত্যাগে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। আর এভাবেই নাকি ভারতকে মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় রূপান্তরিত করবার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু ব্যাপারটি কি আসলে তাই? উচ্চবর্ণের ঘৃণার আগুনে দগ্ধ হয়ে যেসব হরিজন শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের পরিচয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাকুল, সেই বিপুল জনতার জন্য ওরা কি করেছে?

মিনাক্ষীপুরমের কথাই ধরা যাক। বছরের পর বছর খরা ও দুর্ভিক্ষে মৃতপ্রায় লোকগুলোকে জীবনধারণের মত সামান্য ব্যবস্থা করে দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সাহায্যকারী ঐ লোকগুলোর আর্থিক অবস্থাও খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা নিছক মানবিক অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্দশাগ্রস্থ লোকগুলোর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে-সাহায্য পর্যাপ্ত না হলেও তাতে ছিল ভালোবাসা ও আন্তরিকতার পরশ। মিনাক্ষীপুরমবাসিরা কিন্তু প্রায় তাদের মতই গরিব মুসলমানদের সে সাহায্যে অভিভূত হয়নি। ওরা অভিভূত হয়েছিল মুসলমানদের আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখে! ওরা তখন অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল যে, তারাও মানুষ। তাদের মানুষের কাতারে স্থান দেবার মতো লোকও দুনিয়াতে রয়েছে।

এ ঘটনাটিকেই পুঁজি করে ভারতের ধর্মব্যবসায়ী কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু-সংগঠনগুলো আকাশ-পাতাল এক করে ফেলবার আয়োজন করেছিল। উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে ভেসে আসা পেট্রো-ডলারের এক প্লাবন তারা প্রত্যক্ষ করেছিল। আর কল্পিত এ প্লাবনের মুকাবেলা করবার কঠোর সংকল্প

ঘোষণা করে তারা হুজুগপ্রিয় হিন্দু জনগণের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা চাঁদাও সংগ্রহ করে ফেলেছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত কই গেল সে বিপুল অর্থ? দেশের কোথাও কোনও দলিত হরিজন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কি একটি টাকাও ব্যয় হয়েছে? একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী সে বিপুল অর্থের হরিলুট করেছে।"

প্রসঙ্গত শ্রী দেশমুখ প্রশ্ন করেন, "দু'চারজন দলিতলোক ইসলামগ্রহণের পর হিন্দুসংগঠনের নেতৃবৃন্দ আর্তচিৎকার জুড়ে দেন। অথচ তাদের চোখের সামনেই যখন বিত্ত ও ক্ষমতাগর্বী উচ্চবর্ণের শোষকেরা দলিত হরিজনদের দলবদ্ধভাবে পুড়িয়ে মারে, তখন ওরা মুখ খোলে না কেন? অত্যাচারীর কৃপানে আহত হয়ে অপঘাতে মৃত্যুর চাইতে কি ধর্মান্তরগ্রহণ বেশি গুরুতর ঘটনা?"

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ তাঁর নিজের শহর আগ্রার ভাংমন্ডি এলাকায় অবস্থিত তাল-হাবিবুল্লাহ মসজিদে উপস্থিত হন বিনোদ কুমার নামক তাঁর এক সঙ্গীসহ। ইমামসাহেবের কাছে সরাসরি তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেন এবং দু'জনেই এক সঙ্গে কালেমা পাঠ করে ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ দাউদ খান এবং সঙ্গী বিনোদ কুমারের নাম রাখা হয় মুহাম্মদ আকরম। দু'জনেই বর্তমানে বই-পুস্তক পাঠ করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং হাতে-কলমে ইসলামী ইবাদত-বন্দেগি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করছেন।

শ্রী দুর্গাপ্রসাদের ন্যায় একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক এবং একটি জনপ্রিয় হিন্দি দৈনিকের প্রধানসম্পাদকের ইসলামগ্রহণ স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যেও মারাত্মক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। উত্তর প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগ বিষয়টা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে। শ্রী দেশমুখের ন্যায় উত্তর প্রদেশের একজন বিরাট সামাজিক ব্যক্তিত্বের ইসলামগ্রহণ ইতোমধ্যেই নানা ধরনের গুজবের জন্ম দিয়েছে। প্রশাসনের একটি অংশ এ-মর্মে একটি হাস্যকর গুজব ছড়াচ্ছে যে, মুম্বের বিখ্যাত ধনী-ব্যবসায়ী এবং আন্তর্জাতিক চোরাচালানের সম্রাট নামে খ্যাত হাজীমস্তান নাকি উত্তর প্রদেশের দলিত হরিজনদের ধর্মান্তরিত করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবার একটা বিরাট পরিকল্পনাগ্রহণ করেছে।

সমাজে সর্বাপেক্ষা সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অন্তসারশূন্য জাত্যাভিমান এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের প্রতি অমানবিক হিংস্রতা আজ হিন্দুধর্মকেই গণ-বিবেকের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিতশ্রেণী আজ উচ্চবর্ণ ধর্মব্যবসায়ীদের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে আসতে চায়। গণচিত্তের এ ব্যাপক বিদ্রোহ ভারতের বর্তমান উচ্চবর্ণ আশ্রয়ী প্রশাসনের জন্য মারাত্মক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দলিতশ্রেণীর কেউ ইসলামগ্রহণ করলে ওরা দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র

একসঙ্গে নড়ে ওঠে। ওদের ধারণা, ইসলামের সামাজিক সাম্য ও মৈত্রীর সঙ্গে যদি দলিতশ্রেণীর পরিচয় গভীর হয়ে পড়ে, তা হলে এ ভারতের বুকেই আর একটা অবিশ্বাস্য গণবিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাওয়াটা মোটেও অসম্ভব নয়।

একই কারণে আগ্রার প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ ইসলামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন সমগ্রউত্তর প্রদেশব্যাপী উপসাগরীয় পেট্রো-ডলার এবং হাজীমস্তানের অগাধ সম্পদের জুজু আবিষ্কার করবার জন্য চারদিকে হন্যে হয়ে ছুটতে শুরু করেছে।

শ্রী দেশমুখ দাউদ খানে রূপান্তরিত হবার পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। একজন মুসলমানরূপে অতঃপর তাঁর সামাজিক ভূমিকা কি হবে, বিশেষত নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তাঁর কিছু করবার পরিকল্পনা আছে কি না, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন :

"ইসলামগ্রহণের পর আমাকে কি ধরনের সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, এটা আমি বুঝি। ইতোমধ্যেই চারদিক থেকে হুমকি আসতে শুরু করেছে। কয়দিন আগেও যারা সমীহ করে কথা বলতো, আজ তারাও যেন অপরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার ইসলামগ্রহণ কোনও আকস্মিক হুজুগের ব্যাপার নয়। অনেক পড়াশোনার পরই আমি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় লাভ করবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছি। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন মনুষ্যত্ব। একটা ঘৃণ্য জাত্যাভিমানের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দ্রুত নিশ্চিত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ-লোকগুলো নিম্নবর্ণের হরিজন নামে পরিচিত। এরা নিজেদের হিন্দুধর্মের অনুসারীরূপে পরিচিত করেও ন্যূনতম ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। মন্দিরে প্রবেশ করে আরাধ্য দেবতার পায়ে একটা ফুলের অর্ঘ নিবেদন করবার অধিকার থেকেও এরা বঞ্চিত। ফলে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এরা এমন এক পর্যায়ে অবস্থান করছে যে, অনেক ক্ষেত্রে জীবনকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করবার সুযোগ থেকেও এরা বঞ্চিত।

আমি সচেতনভাবেই বিশ্বাস করি যে, এ অগণিত অসহায় জনগোষ্ঠীকে একমাত্র ইসলামই মুক্তি দিতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি, হরিজনদের মধ্যে যারা খৃস্টধর্মগ্রহণ করেছিল, এক-দুই পুরুষ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও ওদের সেই অচ্ছুৎ পরিচয় দূর হয়নি। মানসিক দিক দিয়েও ওরা খুব একটা উন্নত হতে পারেনি। বরং একটা হীনমন্যবোধে তাড়িত হয়েই ওরা এখনও অনেকটা অপাংক্তেয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

অপরদিকে ইসলামী সমাজ যেকোনও জনগোষ্ঠী থেকে আগত তাদের একজন মুসলমান ভাইকে সমমর্যাদায় বুকে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধা করে না। ইসলামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বপরিচয় যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদি কারও মনে সংশয় থাকে, তবে মিনাক্ষীপুরম গিয়ে দেখে আসতে পারেন। ১৯৮১ খৃস্টাব্দে সেখানে যারা ইসলামগ্রহণ করেছিলেন, আজ তাদের দেখলে, তাদের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এ লোকগুলোই মাত্র কয়েক বছর আগে সমাজজীবনে অচ্ছুৎরূপে গণ্য হতো।"

তিনি আবেগজড়িতকণ্ঠে বলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা এবং সবকিছু দেখা-শোনার পরই ইসলামগ্রহণ করেছি। কালেমা পাঠ করবার পর থেকেই আমি মনে যে নতুন বল এবং উত্তাপ অনুভব করেছি, সেটা প্রকাশ করাই হবে আমার প্রথম কাজ। আমি আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানসিক দ্বিধাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে চাই।

বর্তমানে ভারতীয় মুসলিমসমাজের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হচ্ছে শক্তিশালী তথ্য মাধ্যমের অভাব। আমি এ ময়দানেরই একজন কর্মী। তাই আমার অভিজ্ঞতা আপাতত মুসলমানদের এ-প্রয়োজনটুকু পূরণের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত করতে চাই। ইতোমধ্যেই আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর দীনের জন্য কিছু কাজ করবার তওফিক আমাকে অবশ্যই দেবেন।"*

* নয়ী দুনিয়া, নয়াদিল্লি, ভারত।

গোলাম মুহাম্মদ

স্বামী আনন্দপ্রকাশ কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান। ১৯২৩ সনে লক্ষ্ণৌ শহরের মাওলানা আব্দুল বারীসাহেবের কাছে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। 'কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান :

"আমার মনে ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টির পরও বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করে আসছিলাম। পরে যখন আমি 'বারায়েন শুদ্ধি সমিতি'র কার্যভার গ্রহণ করি, তখন বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নেহায়েত দায়ে ঠেকেই আমাকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'শুদ্ধিকার্য' করতে হয়েছিল। আগ থেকে হিন্দুধর্ম তথা আর্যসমাজ সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছিল, শুদ্ধিকার্যে আত্মনিয়োগ করবার পর এ-আন্দোলনের ভেতরের রহস্য অবগত হয়ে তা ক্রমে বৃদ্ধি পেল। বাইরে চাক-চিক্যময় খোলস পরিয়ে ভেতরে যে অসুন্দরের অর্চনা চলছিল, তা জেনে আমার অন্তরের ভাব একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইসলামের ভেতর ও বাইরের সকল সৌন্দর্য তখন স্বমহিমায় আমার সামনে প্রকাশিত হলো, আমার অন্তরকে এক অব্যক্ত প্রশান্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুললো। আমার ইসলামগ্রহণের এটাই প্রধান কারণ।

স্বাধীনতা সত্য, আধ্যাত্মিকতা প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম। এ জিনিসগুলোর জন্য উন্নত মানবাত্মা সর্বদা উদগ্রীব থাকে। ... তাই আমি সত্যের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়লাম। আজ ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করে আমি বিগত দিনের সকল যাতনা ও দুঃখ ভুলতে পেরেছি।

আর্যসমাজের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করতে আমি ইচ্ছুক নই। কারণ, শান্তি ও মুক্তির বার্তা প্রচার করাই আমার ধর্ম। কারও প্রাণে ব্যথা দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্রাহ্মণ হিসেবে বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের বহু শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ আছে। কাজেই জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ গৌরবজনক মনুষ্য জন্ম থেকে কুকুর, বেড়াল, গরু, ভেড়া, ছাগলরূপে জন্মান্তরিত হবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। পক্ষান্তরে মহামহিম আল্লাহর দরবারে মাথা ঠুকে (সিজদা করে) তাঁর অফুরন্ত

করুণাধারায় স্নাত হয়ে মুক্তি পাবে একমাত্র মুসলমান। তাই মুক্তির আশায় আমি ইসলামের করুণাময়, ক্ষমাশীল বিশ্বপ্রভুর স্মরণ করেছি এবং সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এক ইসলাম ব্যতীত সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব দুনিয়ার আর কোথাও নেই।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, আমার জন্য যেন তাঁরা কোনওরূপ মনোক্ষুণ্ন না হন। আমি ইসলামকে একমাত্র সত্য ও মানবতার স্বাভাবিক ধর্ম জেনেই বরণ করে নিয়েছি। আজ আমি মুসলমান, আল্লাহর একমাত্র সত্যধর্ম আমি অবলম্বন করেছি। সত্যের বিমল আলোকে আমার অন্তরের সকল কালিমা মুছে গিয়েছে। তাই একজন নগণ্য ভারতবাসি হিসেবে প্রত্যেক ভারতসন্তানকে আমি সত্যের আহ্বান জানাচ্ছি। ভ্রান্তপথের পথিককে এভাবে সত্যের সন্ধান বলে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তাই আমি সরল প্রাণে স্বীয় কর্তব্য পালন করছি মাত্র। আমি ঘরে ফিরে ভ্রান্তপথের পথিককে বার বার সত্যের সন্ধান জানাবো, দ্বারে দ্বারে ঘুরেফিরে নিদ্রিতের কর্ণে আল্লাহর সত্যের আযান ঘোষণা করবো। প্রত্যেক দেশীয় ভাইকে উদ্ধার করা, মুক্তিপথের সন্ধান বলে দেয়া আমার কর্তব্য। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (স)-কে প্রাণের ভেতরে অনুভব করা আমার জীবনের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং তাই পেয়ে আজ আমি মুক্ত। আজ আমি পাপশূন্য।"*

* 'কেন মুসলমান হলাম?' পৃ. ২১৫-২১৭।

এন্টনি আবুল খায়ের

এন্টনি আবুল খায়ের দাক্ষিণাত্যের এক সম্ভ্রান্ত খৃস্টানপরিবারের সন্তান। সিংহলে ওয়েলেসিয়াল মিশনের প্রচারক থাকাকালীন তাঁর ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের সুযোগ হয়। ফলে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এন্টনি ইসলামগ্রহণের কারণ সম্পর্কে বলেন, "আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম, তাই বর্ণনা করবো। তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে শৈশব থেকেই আমি বিভিন্ন ধর্মের ওপর পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাইবেলের বহু শিক্ষার সঙ্গে ইসলামের শিক্ষার তুলনা করে আমি প্রথমেই দেখতে পাই যে, এ উভয় ধর্ম একই মূল প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আদম-হাওয়ার জন্ম, তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী, হযরত ইব্রাহিম (আ), দাউদ (আ) ও মুসা (আ)-এর আবির্ভাব এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য ও হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে এ উভয় ধর্ম একই বার্তা প্রচার করেছে। পরে যখন আমি ঈসা (আ)-এর ঈশ্বর-পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) হবার দাবি সম্পর্কে বাইবেলের উক্তিসমূহ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমার মনে বিষম সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়। এ সম্পর্কে সত্যের সন্ধান পাবার আশায় আমি কয়েকটি ইসলামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করি এবং পরিণামে পৈত্রিক-ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়।

ইসলামের আল্লাহ অজাত এবং তাঁর থেকেও কেউ জাত নয়। তিনি সর্বব্যাপী। তিনি চোখ ছাড়া দেখেন, কান ছাড়া শোনেন, জিহবা নেই তবু তিনি কথা বলেন। এমন যে মহাশক্তিমান আল্লাহ, তিনি কিছুতেই পুত্রের জনক হতে পারেন না। আল্লাহ বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে প্রাকৃতিক আইন সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজে কিছুতেই তা ভঙ্গ করতে পারেন না। আল্লাহর এসব আইন মানবসমাজ পরিচালনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যে ব্যক্তি তা মান্য করে চলবে, সে নিশ্চয়ই পরিণামে পুরস্কৃত হবে।

পবিত্র কুরআন বজ্রগম্ভীর স্বরে হযরত ঈসা (আ)-এর 'ক্রুসে' প্রাণ ত্যাগের প্রতিবাদ করেছে। অতএব, যে যিশুখৃস্ট ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ) নয়। প্রাচীন খৃস্টান লেখকরা নিজের নিজের কল্পনা বলে ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও হযরত ইসা (আ) কে এক ব্যক্তি বলে প্রচার করে একজন নবীর অবমাননা করেছে। ...

একমাত্র ইসলামেই বিশ্বের সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়ে আসছে। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি এ ধর্ম সর্বপ্রথমে প্রত্যাদিষ্ট হয় এবং পরবর্তী সকল নবী-পয়গম্বর এ ইসলামের বাণীই প্রচার করে গিয়েছেন। ইসলাম পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষ প্রেরিত-পুরুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি ইসলামের এ মহান শিক্ষা অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে—সে ইসলামগ্রহণ করতে বাধ্য হবেই; কিছুতেই সে বিপথে যেতে পারে না।

ইসলামের অতুলনীয় আকর্ষণীয় শক্তি, যুক্তি ও বিবেকসম্মত শিক্ষা, গৌরবজনক অতীত, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় উপদেশসমূহ এবং মহাগ্রন্থ কুরআনের হৃদয়গ্রাহী পবিত্র বাণীসমূহ পাঠ করা সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির জন্য একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর ইচ্ছায় সমুদ্রে নিজের অহমজ্ঞান বিসর্জন করে যে কোনও মানুষ বিধিনির্দিষ্ট পন্থায় ইসলাম অনুসরণ করবে, তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত।"*

* 'কেন মুসলমান হলাম?' পৃ. ২১৭-২১৮।

কবি মাধবী কুট্টি কমলা দাস

প্রখ্যাত দ্বিভাষী ভারতীয় মহিলা কবি মাধবী কুট্টি ওরফে কমলা দাস ১৯৯৯ ঈসায়ী সালের ১১ ডিসেম্বর ইসলামগ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। তিনি সেদিন তাঁর বাসভবনে দেখা করতে যাওয়া সাংবাদিকদের জানান, তাঁর ২৭ বছরের কলকাতাবাসের জীবনে তিনি বেশকিছু সৎ মুসলিম পরিবারের সংস্পর্শে আসেন, যাদের কাছ থেকে তিনি ইসলামগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ইংরেজি ও মালায়ালাম ভাষার এ কবি ঐদিন এক সেমিনার উদ্বোধন করতে গিয়ে তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তাঁর মতে ইসলাম হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে— যা তাঁর ধর্মে নেই। তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে সুরাইয়া নাম ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইসলামগ্রহণকারী প্রখ্যাত ভারতীয় লেখিকা মিসেস কমলা দাস বলেছেন, তিনি মুসলিমনারীদের রক্ষণশীল জীবন পছন্দ করেন।

১৫/১২/১৯৯৯ ঈসায়ী 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়ার'য় প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে কমলা বলেন, তিনি ২৭ বছর আগেই ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন; তিনি ৭০ দশকের শুরুর দিকে এ-বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করেন। স্বামী তাঁকে অপেক্ষা করতে এবং ইসলামের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করবার পরামর্শ দেন। ৬৭ বছর বয়স্কা মিসেস কমলা দাস গুপ্তা ইসলামগ্রহণ করবার পর বলেন, তাঁর ইসলামগ্রহণ নিজ রাজ্য কেরালায় অভিনন্দিত ও সমালোচিত হয়।

তিনি বলেন, তিনি দু'টি মুসলমান বালককে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পড়াতে গিয়ে নিজে ইসলামের ওপর বইপত্র পড়েন। এভাবেই তিনি ইসলামী শিক্ষার সংস্পর্শে আসেন।

ভারতের প্রভাবশালী সংবাদপত্র টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রশ্নের জবাবে কমলা বলেন, তিনি মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথা পছন্দ করতেন। পর্দার অনুসরণ তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে কিনা এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমি স্বাধীনতা চাই না। আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতা আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য দিক-নির্দেশনা চাই। নিজেকে রক্ষার জন্য আমি একজন শিক্ষক চাই। পর্দা মেনেচলা নারী অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে থাকে।"*

---

* দৈনিক সংগ্রাম, ১৩/১২/১৯৯৯ ও ১৬/১২/১৯৯৯ ইং।

এস. এম. আবুল হাদি

তামিলনাড়ুর অম্বিকাপট্টমের এম.এল.এ. যার বর্তমান নাম এস. এম. আবুল হাদি কয়েক বছর পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেন। একজন সুবক্তা হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি এখন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কি কারণে এবং কোন ঘটনা তাঁকে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, নিম্নে তাঁর আত্মজবানি থেকে তা জানা যায় :

সম্প্রতি আমি যে হিন্দুমত প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী আদর্শগ্রহণ করেছি এর পেছনে একাধিক কারণ আছে। এর উল্লেখযোগ্য দিক হলো জনতা সরকারের সময় বাবু জগজীবন রাম যখন বেনারসের এক মন্দির উদ্বোধন করলেন, তার পর থেকে সে মন্দিরে পুজা বন্ধ হয়। কারণ হিসেবে বলা হলো : নীচুজাত (বাবুজী)-এর হাতে মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে, তাই সে মন্দিরটাও অচ্ছ্যুৎ হয়ে গিয়েছে। এর শুদ্ধিকরণ ভিন্ন পূজা করা চলবে না। ভারতের অন্যতম নেতা ড. আম্বেদকর সংবিধান প্রণেতাদের একজন। তাঁকে পর্যন্ত আজ অচ্ছ্যুৎ মনে করা হয়। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও কি দেশে জুলুম অত্যাচারের মোকাবেলা করবার মতো মানসিকতা জন্মলাভ করেনি? বিশিষ্ট আইনজীবী আম্বেদকরও এক্ষেত্রে আইনের পরাজয় দেখে হিন্দুধর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য জাতীয় নেতাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বলা হয় আর্থিক উন্নতি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এসব সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু বাবুজীর ক্ষেত্রে তো সবকিছুই বিদ্যমান। তবু সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। এসব জটিল সমস্যা নিয়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম। শিখ, জৈন, খৃস্ট ও বৌদ্ধ সকল ধর্ম সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে চেষ্টা করলাম। উল্লেখিত ধর্মের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম।

কিন্তু কারও কাছে সন্তোষজনক সমাধান পেলাম না। অবশেষে ইসলাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টার একত্ব, জাগতিক বিধিবিধানের

মধ্যে ইসলামের দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি তখন ইসলামগ্রহণ করলাম। এরপর আরও ব্যাপক জ্ঞানলাভের জন্য কুরআন ও হাদিস অনুশীলন করতে আরম্ভ করলাম। আমার বাড়ির এবং আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের মর্যাদার কথা বোঝাতে লাগলাম। তারা একে একে ইসলামগ্রহণ করতে লাগলো। অতঃপর আমি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। যেখানে ইসলামগ্রহণ করতে লোকদের আগ্রহ লক্ষ্য করতাম, সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের কল্যাণকর ও সর্বজনীন বাণীগুলো প্রচার করতাম। আমার এসব কাজে যে বাধা-বিপত্তি আসেনি তা নয়। সমাজের গণ্যমান্যরা বাধা দিয়েছে। দেশে কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে। এছাড়া আমাদের সংখ্যা যখন দিন দিন বাড়তে শুরু করেছে, তখন সেসব নও-মুসলমানের একত্রে নামাযের জন্য মসজিদের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই এড়ুয়ার গ্রামে ৩০ ঘর পুরানো মুসলমানের সহযোগিতা নিয়ে এক টুকরো জমি ক্রয় করি। কিনুলুড়, কিড়াড়ম, কুন্তাওন, কুন্নুলুড়ু গ্রাম থেকে কিছু সাহায্য গ্রহণ করে এক মসজিদ নির্মাণ করি। অতঃপর যেসব অসুবিধা ছিল তা ক্রমান্বয়ে সমাধান করে নেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে আমি আমার আত্মিক পরিবর্তনের ফলে সারা এলাকার অবস্থা পাল্টে ফেলি।*

* কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মীযান, ২২ নভেম্বর, ১৯৮১।

মুহাম্মদ উসামা বিন আব্দুল্লাহ্

ইংল্যান্ডের খৃস্টানপরিবারে রবার্ট ক্যান্টনের জন্ম। পাশ্চাত্য পরিবেশেই তিনি লালিত পালিত। অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশে তিনি মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে মুসলিম যুবকদের জীবনে ইসলামের প্রতিফলন দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি আল-কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালেমা তৈয়ব ও শাহাদৎ পড়ে মুসলিম মিল্লাতে শামিল হন এবং মুহাম্মদ উসামা বিন আব্দুল্লাহ্ নামগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথায় ইসলামগ্রহণের কাহিনী তুলে ধরছি :

আমি তখন মালয়েশিয়ান সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ওঠাবসা করবার সুযোগ পাই। তাদের সদাচরণ ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমার অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে জানবার আগ্রহ জাগে। মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য আমি পবিত্র কুরআনের একটি ইংরেজি অনুবাদ ক্রয় করি। অতঃপর দীর্ঘ দু' সপ্তাহ ধরে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি কুরআনের প্রতিটি বাক্য অনুধাবনের চেষ্টা করি। অতঃপর স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমার মুখে 'কালেমা' উচ্চারিত হয়। আমি মুসলমান হই এবং মুহাম্মদ উসামা বিন আব্দুল্লাহ নামগ্রহণ করি।

প্রশ্ন করা হয় : কুরআন অধ্যয়নের ফলে আপনার জীবনে তার কি কি প্রভাব পড়েছে?

উত্তর : এ প্রশ্নের যথাযোগ্য বা যথার্থ উত্তর দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের জীবনে কুরআন পাকের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। আমি কেবল ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে পড়ায় মূল কুরআন, তার অলংকার, ভাবের গভীরতা ও প্রভাবশক্তি যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারিনি। তবুও কুরআনের মূল আবেদন এবং অন্তরে তার প্রভাব অনুভব করেছি। এ মহাগ্রন্থে বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য, রিসালতের শাশ্বত বিধান ও আল্লাহর একত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। কুরআন অধ্যয়নকালে আমি অনুভব করি যে, এর প্রতিটি বাক্য শাশ্বত সত্য, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ বা সংশয় নেই।

প্রশ্ন : অতীতে আপনি যেসব নিষিদ্ধ বস্তুতে অভ্যস্ত ছিলেন, তা বর্জন করতে আপনাকে কি কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে?

উত্তর : যেদিন আমি অমূল্য রত্ন ইসলাম লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্, সেদিন থেকেই আমি সেসব বর্জন করেছি। মদ্যপান ত্যাগ করা ও অন্যান্য গর্হিত অভ্যাস ও আচার-ব্যবহার বর্জন করা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযান মাসে রোযা রাখা আল্লাহর মেহেরবানিতে আমার কোনও সমস্যা হয়ে ওঠেনি; যদিও এগুলো মনের জোর না থাকলে আমার জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারতো। এটা এজন্য সম্ভব হয়নি যে, আমার মধ্যে কোনও অলৌকিক গুণ ছিল বা আমি কোনও অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলাম; বরং আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সঙ্গীদের দুআ ও সহযোগিতায় আমি সব সংকট থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম হয়েছি। যে দয়ালু প্রভু আমাকে সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছেন, তিনিই আমাকে পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করেছেন। অন্যথায় আমি ইসলামের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ কিছুতেই লাভ করতে পারতাম না।

প্রশ্ন : আপনি ইসলামগ্রহণ করায় আপনার পরিবারের অন্যদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর : আমি যখন ইসলামের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হবার খবর আমার পিতামাতাঁকে জানাই, তখন তাদের চোখেমুখে রীতিমত ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তবে তাঁরা কোনও নেতিবাচক আচরণ করেননি; কারণ তাঁরা সবসময় আমাকে সাহস যোগাতেন। তদুপরি আমাদের পরিবার হচ্ছে একান্ত শান্ত ও ভদ্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজও তারা এ নিয়ামত লাভে বঞ্চিত রয়েছেন। আমি আল্লাহ্ পরোয়ারদিগারের দরবারে সর্বদা দু'হাত তুলে তাদের জন্য দুআ করি, হে পরোয়ারদিগার, সে শুভদিন শিগগিরই দেখাও, যখন আমার চোখের সামনে আমার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি তোমার প্রিয়নবী (স)-এর শরিয়তের প্রচারক হয়ে কাজ করবে। মুসলমান ভাইদের কাছেও আমার আকুল আবেদন, বিশেষ বিশেষ দুআ'র সময় তাঁদের কথা মনে রেখে তাঁদের হিদায়েতের জন্য দুআ করবেন।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্য জগতে ইসলামপ্রচারের জন্য মুসলমানদের কি ভূমিকা পালন করা উচিৎ?

উত্তর : তারা যদি আত্মিক ও দৈহিক উভয় দিকে ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহলে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারবেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের আচরণ যদি কদর্য ও অনভিপ্রেত হয়, তাহলে

ইসলামের শত্রুরা তাদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বৃদ্ধি করবেই। যদি আমরা (মুসলমানরা) ইসলামের শিক্ষা ও নৈতিক গুণাবলীতে নিজেদের অলংকৃত করতে পারি, তাহলে বিশ্বের সামনে প্রকৃত মুসলমানের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হবো। কোনও মুসলমানের মধ্যে পূর্ণ মানবতাবোধ এবং অপরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। যদি আমরা সামান্য এ-কাজটুকু করতে পারি, তাহলে মুসলিমসমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ফলে অন্যদের চোখের ওপর থেকে বিদ্বেষের আবরণ খসে পড়বে এবং ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে।

ইসলামের অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করাই হবে পাশ্চাত্য জগতে ইসলামপ্রচারের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

প্রশ্ন : একজন মুসলমান হিসেবে আপনার ভবিষ্যত লক্ষ্য কি?

উত্তর : একজন মুসলমান হিসেবে অধ্যাপনাকেই আমি প্রাধান্য দেবো। কারণ দাওয়াতের জন্য এটা সুবিধাজনক এবং সু-মহান ভূমিকা রাখবার উপযোগী। আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন আজীবন এ-পথে ত্যাগতিতিক্ষার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করতে থাকি। আল্লাহ্ আমাকে ও আমার দীনী ভাইদের ইসলামপ্রচারের জন্য কবুল এবং সকল সুযোগ দান করুন। আমিন।*

* লক্ষ্ণৌর তামিরে হায়াত উর্দু পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, সাপ্তাহিক মীযান, ৯ জুলাই, ১৯৮৯, কলকাতা।

জর্জ আশকভান

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র জর্জ আশকভান তাঁর পরিচিতি ও ইসলামগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

ওয়াশিংটনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ভার্জিনিয়ায় আমার জন্ম হয়। আমার পিতা আমেরিকান নৌবাহিনীর অফিসার ছিলেন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের পৌত্র। সে পরিবারেই আমার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষার সকল স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার পিতৃপুরুষেরা চারশ বছর যাবৎ বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। শৈশব থেকেই খৃস্টবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার আগ্রহ আমার মাঝে প্রবল ছিল। কিন্তু কোনও পাদ্রিই আমাকে চিত্তপ্রশান্তিমূলক জবাব প্রদান করতে সক্ষম হননি। আমাকে স্বস্তি প্রদানে তাঁরা চরমভাবে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে এ বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহর সত্তা ও যিশুখৃস্টের সত্তা এক জিনিস নয়। জীবনের এ মুহূর্তগুলো আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল।

ইতোমধ্যে ফটো-সাংবাদিকতার পেশায় পা দেবার পর একদা দায়িত্ব পালনার্থে 'টাইমস' পত্রিকার পক্ষ থেকে লেবাননের গৃহযুদ্ধের চিত্র ক্যামেরাবন্দী করতে আমাকে বৈরুতে যেতে হয়। আরব ও মুসলিমদেশ হিসেবে সেখানে ভ্রমণের অনুভূতি আমার মনে ভীষণ ভীতি সঞ্চার করে। কেননা, আমেরিকার ফিল্ম ও মিডিয়াগোষ্ঠী আমার মনে যে ধারণার জন্ম দিয়েছে, তা হলো : মুসলমানরা কট্টরপন্থী সন্ত্রাসী জাতি। তাদের স্বভাব-চরিত্র হিংস্র ও জংলি প্রকৃতির। উন্নতি ও প্রগতির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু লেবাননের মাটিতে পা দিয়ে আমার সে-ধারণা পাল্টে যায়। কারণ আমার নিজচোখে দেখা অভিজ্ঞতার দর্পনে যা ধরা পড়েছে, তাতে আরবদের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সকল প্রচারণা মিথ্যা, বানোয়াট ও ঘৃণ্য, প্রোপাগান্ডা বলে প্রমাণিত হয়েছে। লেবাননে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় যে সকল মুসলমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তারা সর্বদা আমাকে যুদ্ধজনিত বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্য জানবাজি রেখেছে। আমার আদর-আপ্যায়নে তাঁরা যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয়

দিয়েছে। একবার খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আমার ওপর গুলি চালানো হলে আমি মারাত্মকভাবে আহত হই, তখন মুসলমানরাই আমার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করে। আপন সহোদরের ন্যায় তারা আমার যত্ন করেছে।

তখন আমার বয়স বিশ। যে-হোটেলটিতে আমি অবস্থান করছিলাম, তার পাশেই ছিল একটি মসজিদ। আমি প্রায়ই সে-মসজিদের ইমামসাহেবের কাছে যেতাম এবং তাঁর সঙ্গে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতবিনিময় করতাম। এ সাক্ষাতগুলো আমার মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। কিন্তু তখনও আমি কুরআন-হাদিস সম্পর্কে মোটেও অবগত ছিলাম না। তথাপি মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্তা, মেলামেশা ও তাদের সাহচর্য আমার মনের অনেক সংশয় দূর করতে সমর্থ হয়। আমি ফটো তোলার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধস্থলে যেতাম। এভাবে বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে চলে আসি আমেরিকায়।

আমেরিকায় এসে খৃস্টবাদের বোধ-বিশ্বাস ও খৃস্টানদের নানা দল-উপদল সম্পর্কে নতুনভাবে জানতে শুরু করি। গির্জার পাদ্রিদের সঙ্গে মতবিনিময় করি, কিন্তু তাঁরা আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন না।

তারপর আমাকে আফগানিস্তানে যেতে হয়। আফগানিস্তানে তখন রুশ দখলদারবাহিনী চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটনে আফগানের স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থক একটি সংস্থা আমাকে রিপোর্টিং-এর জন্য সেখানে পাঠায়। আফগান মুজাহিদদের যুদ্ধ-সামগ্রীর চাহিদা, তাদের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের তদন্ত করা ছিল আমার দায়িত্ব। ক'জন নেতৃস্থানীয় আফগান মুজাহিদকে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে এসে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবার জন্য আমি আহবান জানাই।

অতঃপর আবার আমি আফগানিস্তানে যাই। আফগান মুজাহিদদের মাঝে যে ঈমানী শক্তি ও চেতনা দেখেছি, তা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। আমি দেখেছি, তারা তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন মুহূর্তেও নামাযের সময় হলে সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তাঁদের ভাষ্য হলো, আমরা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই সবকিছু করি। আমি যে স্পৃহা ও উদ্যমের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করতে দেখেছি এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও সুপার পাওয়ার রুশবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি, তাতে আমার মনে তখনই এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের ওপর তাঁরা নিশ্চয়ই বিজয় অর্জন করবে।

আফগানিস্তানে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস অধ্যয়নের সুযোগ পাই। রাসূলের এক বাণী থেকে জানতে পারলাম, তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন : মনে রোখে, তোমরা ঈমানের দৌলতেই সফল ও বিজয়ী হবে। এতে

সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই যে, ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান আফগান মুজাহিদরা শেষপর্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রুশদখলদার বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমি নিজপেশায় আত্মনিয়োগ করি। ১৯৮৮ সালে আমি নিউইয়র্কে বন্ধুদের সহায়তায় 'রক এন্ড রোল' নামে একটি ব্যান্ড কোম্পানি চালু করি। সেখান থেকেই আমার জীবনের ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। পূর্বে আমার জীবন ছিল হাসি-তামাসা, ভোগ-বিলাস, মদ ও নারীনির্ভর। আমেরিকার সেরা চিত্র-তারকাদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। একসময় যাদের মুখ শুধু পত্রিকার পাতায় দেখতাম, তারা এখন আমার খুব কাছের বন্ধু। সে-সময়টা ছিল আমার প্রচুর অর্থ উপার্জনের সময়। একবছরেই আমার হাতে হাজার হাজার ডলার আসে। জীবনে এই প্রথম আমার হাতে এত অর্থ এলো। ইতোমধ্যে এক ধনকুবের বন্ধুর বিয়ের-অনুষ্ঠান ভিডিও করবার জন্য আমাকে নরওয়ে যেতে হয়। সে-সুবাদেও প্রচুর অর্থ আমার হস্তগত হয়।

১৯৯৬ সালে রক এন্ড রোলের প্রসিদ্ধ গায়ক এলটন জনের সঙ্গে এক ভ্রমণে যেতে হয়, তাঁর ভ্রমণ ভিডিও করবার জন্য। সে-ভ্রমণে ভিয়েতনামে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক এক কর্মকর্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অন্তত দু'দিনের জন্য হলেও বসনিয়া যেতে এবং সেখানকার যুদ্ধচিত্র ক্যামেরাবন্দী করতে। আমি তাঁকে বললাম, গৃহযুদ্ধের যে পরিমাণ চিত্র আমার ক্যামেরায় জমা আছে, তা অনেক দিনের জন্য যথেষ্ট। ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, মারাকেশ, আফগানিস্তান ও বৈরুতের বহু যুদ্ধচিত্র আমার কাছে রয়েছে। তাই বসনিয়া যাওয়ার প্রস্তাবগ্রহণ করলাম না। কিন্তু সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে টেলিভিশনে বসনিয়ার সংবাদচিত্র দেখে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। টিভিপর্দায় দেখা গেল, সারায়েভো শহরের একস্থানে নারী ও নিষ্পাপ শিশুরা খাদ্যের জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে-অবস্থাতেই তাদের ওপর শুরু হয়েছে সার্বদের ভারি গোলাবর্ষণ।

এ-চিত্র আমার জন্য ভীষণ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়। আমার অনুভূতি নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেননা আফগানিস্তানসহ অন্যান্য যুদ্ধস্থলগুলোতে নারী ও শিশুরাও হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে সত্য, তবে মূলযুদ্ধে পুরুষের প্রতিপক্ষে ছিল পুরুষ; কিন্তু বসনিয়ায় যা হচ্ছে, তা যে পুরো মুসলিম-জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুই তাদের টার্গেট। এ যেন এক ভয়াবহ ক্রুসেড।

দ্বিতীয় দিন জাতিসংঘের অফিসে কর্মরত সেই বন্ধুটিকে বললাম, বসনিয়া যাবার ব্যবস্থা করতে। টাইমসের কেন্দ্রীয় অফিসে আমাদের এ প্রোগ্রামের কথা জানালে তারা বললো, দু'দিন নয় বরং দু' সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করুন। কিন্তু এদিকে আমার কোম্পানির অনেক কাজ পড়ে আছে বলে তাদের জানালাম, বসনিয়ার জন্য আমি দু'দিনের বেশি সময় দিতে পারবো না।

সারায়েভোতে পৌঁছে দ্বিতীয় দিন আমি বসনিয়ার রাজপথে যে বীভৎস চিত্র দেখেছি, তা বর্ণনা করা কষ্টকর। ফরাসি নিরাপত্তাবাহিনীর সামরিক কনভয়ে করে এয়ারপোর্টের পথ ধরে আমি প্রথমেই হাসপাতালে গেলাম, সেখানকার চিত্র ক্যামেরাবন্দী করতে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে দেখলাম, সেখানেও সার্বরা গোলাবর্ষণ করেছে। হাসপাতালের বাইরে একজন আহত বসনীয়কে আমরা তাড়াতাড়ি ভেতরে পৌঁছে দিলাম। এদিকে ফরাসি নিরাপত্তাবাহিনী আমাদের রেখে চলে গেল।

আমরা হাসপাতালে থেকে গেলাম এবং প্রায় ষোল ঘণ্টা হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কাটালাম। তাঁরা রাতদিন আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করে যাচ্ছেন। অপারেশনের অনেক প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি তাদের নেই। অনেক প্রয়োজনীয় ইনজেকশনের অভাব। অভাব প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের। অক্সিজেনের পাইপ অক্সিজেনশূন্য হয়ে ঝুলছে। পানি ও বিদ্যুতের অভাবে মোমবাতির আলোতে তাঁরা চিকিৎসা করছেন। আবার অনেক আধুনিক যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের অভাবে তা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে সার্বদের সার্বক্ষণিক গোলার আঘাতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। আমরা টেলিফোনে জাতিসংঘের অফিসে যোগাযোগ করে জানতে চাইলাম অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করা যাবে কি-না? অফিস থেকে অপারগতা প্রকাশ করা হলো যে, আমরা ট্রাকযোগে এসব পৌঁছানোর চেষ্টা করলে সার্বদের গোলাবর্ষণ থেকে তা রেহাই পাবে না। তাই আপনাদের সহযোগিতা করতে পারছি না। তাছাড়া আমাদের কাছে শুধুমাত্র তেরটি ট্রাক রয়েছে; সেগুলোও খাদ্যসামগ্রীতে ভর্তি। সুতরাং একটি ট্রাকও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে পারি না।

আমরা বসনিয়ার মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললাম যে, আপনারা একটি মালবাহি ট্রাকের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি-না। তাঁরা তাতে সম্মতি জানালো এবং ট্রাকের ব্যবস্থা করলেন। আমরা বসনীয় মুসলমানদের সহযোগিতায় সাদা রঙ দিয়ে ট্রাকটিকে সাদা করে ফেললাম এবং সবদিকে জাতিসংঘের মনোগ্রাম লাগিয়ে দিলাম। এরপর হাসপাতালের একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটা তালিকা তৈরি করে রওয়ানা হলাম অফিসের দিকে। অতঃপর

নিজে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্ট রোডে সার্বদের ঘাটি অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম সেখানে। এভাবে জাতিসংঘের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও ঔষুধপত্র সাপ্লাই করলাম। সার্বরা আমার ব্যাপারে কোনও অভিযোগ করলো না। পরের দিন জাতিসংঘ অফিসে বসে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম যে, আমার কাছে তো জাতিসংঘের শুধু সাংবাদিকতার কাগজপত্র ছিল। কিন্তু ড্রাইভার বনে গেলাম কীভাবে? আসলে সার্বদের ভারি গোলাবর্ষণ ও হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সুস্থ সবল দেহে হাসপাতালে পৌঁছাই ছিল আমার জন্য অলৌকিক ব্যাপার! যদি আমি তাদের বিদেশি সাংবাদিকতার কাগজপত্র দেখাতাম, তাহলে তারা আমাকে ফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দিতো। কেননা এ বিংশ শতকে গৃহযুদ্ধে যত সাংবাদিক নিহত হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে সার্বদের গুলিতে।

আমরা আমেরিকান কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় তৃতীয় দিনও তাদের জন্য ঔষুধ-পত্র সাপ্লাই করি এবং প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন জাগরেব শহর থেকে সংগ্রহ করি।

আমি অনুভব করলাম, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাই আমি সেখানে তিনদিনের পরিবর্তে তিন সপ্তাহ অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলাম। তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকে আমি একদিন যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি নিচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার দিকে এক ঝাঁকগুলি ছুটে এলো। একটি গুলি হাতের বাহুতে আরেকটি পায়ের গোড়ালিতে এসে বিদ্ধ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বসনীয় মুসলিম ডাক্তার আমার চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এলেন। এরপর পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য আমাকে যেতে হলো মিউনিখ। সেখানে এক মার্কিনী হাসপাতালে চিকিৎসার নিমিত্ত আমাকে দেড় থেকে দুই মাস অবস্থান করতে হলো। ডাক্তার আমার ক্ষতস্থান দেখে বললো, যদি ভালোভাবে চিকিৎসা নেন, তাহলে দু' বছরের মাথায় আপনি চলাফেরা করতে পারবেন। কিন্তু আমি তাঁর কথায় কান না দিয়ে বসনিয়ায় আমার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়ই পুনরায় হাসপাতালে চলে এলাম এবং এক মাসের ভেতরই চলাফেরা করবার মতো সুস্থ হয়ে উঠলাম। জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি বসনিয়ার জন্য চিকিৎসা-সামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রয়োজনীয় ঔষুধ সংগ্রহ হয়ে গেলে সেগুলো নিয়ে রওয়ানা হই বসনিয়ার উদ্দেশে। এখানে এসে আমাকে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, যা আমার হৃদয়-মনে এক ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলে আমাকে সহ্য করতে হয় অস্বাভাবিক মর্মজ্বালা, যা আমার জীবনের মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দেয়।

আমি একদিন জানতে পারলাম বসনীয়দের একটি ছোট্ট শহর সার্বরা অবরোধ করে রেখেছে। আমি সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্রোট এবং বসনীয় ফৌজ আমার সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করলো। তারা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, আপনি অত্যন্ত বিপদসংকুল পথে পা বাড়াচ্ছেন। কারণ, সবদিকে সার্ব বাহিনী ওঁৎ পেতে বসে আছে। আপনাকে দেখামাত্র তারা ফায়ারিং শুরু করবে। সুতরাং আপনার এ সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। কেননা, সেখানে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু তাদের এত বারণ সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকলাম। রাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। অবশেষে একসময় রাত নেমে এলো। চারদিকে অন্ধকারে ছেয়ে যেতেই মোটর নিয়ে ড্রাইভারসহ বের হয়ে পড়লাম। যা আশংকা করা হয়েছিল, সার্ব সৈন্যরা আমাদের ওপর গোলাবৃষ্টি শুরু করলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদের অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে নিলেন। যে-মোটরটিতে চড়ে আমরা গিয়েছিলাম, সেটার ইঞ্জিন, টায়ার ইত্যাদি কোনও কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না সার্বদের গোলাবর্ষণে। আরেকটি মোটর নিয়ে অন্যপথ ধরে আমরা চললাম আমাদের গন্তব্যস্থলে।

সেই ভয়ানক ও নারকীয় যুদ্ধে বিধ্বস্ত চারজন মহিলাকে দেখতে পেলাম। তারা একজন অপরজনের গায়ে ভয় করে আমাদের দিকে হেঁটে আসছিল। ইতোমধ্যে সার্বসৈন্যরা আরেক দফা আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ করলো। মহিলা চারজনের সর্বাঙ্গ হিজাবে ঢাকা থাকায় আমরা আন্দাজ করলাম তারা মুসলিম। আবার অনেক সার্ব মহিলা সর্বশরীর আবরণে ঢেকে মুসলমানদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে। তাই পরক্ষণেই আমার সন্দেহ হলো যে, তারা আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য আসছে কিনা। কিন্তু আরও কিছুদূর এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম, একজনের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।

আমি মোটর থেকে নামলাম। আমার সঙ্গে ড্রাইভারও নামলো। মহিলা কয়জন সীমাহীন কষ্টে কাতরাচ্ছে আর আহাজারি করছে। আমরা তাদের একদম কাছে গেলাম। তাদের মধ্যে দু'জনকে বার-তের বছরের বালিকা বলে মনে হলো। একজনের শরীর থেকে তখনও অঝোরে রক্ত ঝরছে। মোটরে ওঠালাম তাদের। বালিকাটির মা অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ড্রাইভার আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এ লোক ডাক্তার, সুতরাং ভয়ের কারণ নেই। ভাবলাম তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন। কারণ, ক্রমান্বয়ে তার অবস্থার অবনতি ঘটছে। 'ফাস্ট-এইড' সম্পর্কে আমার আইডিয়া ছিল, যা এ মুহূর্তে বিশেষ কাজে লাগলো। বালিকাটির দিকে তাকাতেই সীমাহীন অনুশোচনা ও ব্যথায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বালিকাটির মা বললেন, সার্বরা আমার মেয়ের সঙ্গে সীমাহীন পাশবিক আচরণ করেছে। এরপর থেকেই

সে বেহুশপ্রায়। ভদ্র মহিলা আরও বললেন, সার্বরা আমাদের মুসলমান বসতির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সব পুরুষ ও শিশুদের তাদের আত্মীয়-স্বজনের সামনে এক এক করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এরপর তারা মহিলা ও যুবতীদের ইজ্জত লুটে নেয়। এ দুই মেয়ের বয়স মাত্র বার ও চৌদ্দ বছর। আমার সামনে তাদের ওপর পঁচিশ জনেরও অধিক সার্বসৈন্য পাশবিক নির্যাতন চালায়। এতেও তারা শান্ত হয়নি। তারা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং কয়দিন পর রেখে যায়।

এরপর আমরা রাতের আঁধারে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করি। এদিকে উভয়ের অবস্থা খুবই আশংকাজনক। তা সত্ত্বেও আমরা অনেক কষ্টের পর কোনওভাবে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

ঘটনাটি শোনার পর আমি নিশ্চল পাথর বনে গেলাম। শুধু কান্নাই ছিল আমার ক'দিনের সম্বল। এমনভাবে কেঁদেছিলাম সে-ক'দিন, মনে হয়েছিল, আমার মেয়ের সঙ্গেই এ আচরণ করা হয়েছে। আমি বলতে পারবো না, সেদিন আমার কেন এমনটি হয়েছিল। লোপ পেয়েছিল আমার হিতাহিত জ্ঞান। এরপর আমি অনুভব করলাম, এ বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে উদ্ধারের জন্য আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। তারা মুসলমান বলে নয়, বরং তারা মানুষ এজন্য। কারণ আমাকে শৈশব থেকেই মানুষকে ভালোবাসার দীক্ষা দেয়া হয়েছিল। মুসলমানরাও আমাকে তাই শিক্ষা দিয়েছে। বিশেষ করে বসনিয়ায় অবস্থানের অভিজ্ঞতা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমি খৃস্টান হয়ে ভাবছি, সার্বরা খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও এমন বর্বর ও হিংস্র হলো কী করে?

যাহোক বসনিয়ার এক মহিলা হাসপাতালে তাদের ভর্তি করে দিলাম। হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলাম, সার্ব কর্তৃক এমনি পাশবিক নির্যাতনের শিকার বহু অল্পবয়স্কা কিশোরী-তরুণী এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

অনেক মুসলিম সাংবাদিকও সেখানে রিপোর্টিং-এর জন্য গিয়েছিলেন। সউদি মিডিয়ার সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। আমার বক্তব্য শুনে বৈরুতের ইমামসাহেব বললেন, আপনি মুসলমান হচ্ছেন না কেন? আপনার দিল তো মুসলমান হয়ে গেছেন। আপনি ইসলামগ্রহণ করে নিন, দেখবেন ইসলাম সম্পর্কে অনেক অনেক প্রশ্নের জবাব এমনিতেই মিলে যাবে। সেদিন থেকে তাঁর কথাটি আমার বার বার মনে হতো।

বসনিয়া অবস্থানকালে একটি মুসলিম পরিবারকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। সে পরিবারের প্রধানব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন । তাঁর ফুসফুসের একাংশ অকেজো হয়ে পড়েছিল। যে হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, সে হাসপাতালের সঙ্গে আমার বারবার যোগাযোগ হয়েছিল। এদিকে আমি কুরআন মজিদ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলাম, যাতে

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে উত্তম পন্থায় সঠিকভাবে অবগত হতে সক্ষম হই। পবিত্র কুরআন মজিদ অধ্যয়ন দ্বারা কয়েক দিনেই আমার সকল প্রশ্নের চিত্তপ্রশান্তিমূলক উত্তর মিলে যায়, যে-সম্পর্কে আমি বছরের পর বছর পেরেশান ছিলাম এবং আমাকে ইঞ্জিল (বাইবেল) এবং ইঞ্জিলের পন্ডিতরা হতাশ করে দিয়েছিল।

বসনিয়া থেকে ফিরে তৃতীয় দিবসে সেই পরিবারটির খোঁজ-খবর নেবার জন্য হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলাম, রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করবার জন্য পার্শ্ববর্তী এক মসজিদে গিয়েছিলেন। আমি সেই বসনীয় মুসলমানটির হাতটি টেনে নিয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললাম, আপনাদের ধর্ম ইসলামে সকল কিছুর সমাধান রয়েছে এবং এটাই আসল ধর্ম, যে-ধর্মে সমগ্র মানবতার মুক্তি নিহিত। কথাগুলো উচ্চারণ করবার সময় আমার ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা দিতে এবং তখনই ঘরে ফিরে নামাযে দাঁড়াতে সঙ্কল্প করি।

হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরার দ্বিতীয় দিন সেই মুসলমান ব্যক্তিটির মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ আমাকে শুনতে হলো। সংবাদ পেয়ে আমি ছুটে গেলাম হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছে দেখলাম, আমার আগেই সেই মার্কিন শহরে অবস্থিত বহু মুসলমান তাঁর দাফন-কাফনের জন্য পৌঁছে গেছে। তারা কেউ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ছিল না, বরং ভারত, পাকিস্তান, সউদি, কুয়েতসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের নাগরিক ছিল, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, একান্ত আপনজনের মৃত্যুতে যেন তারা সকলে শোকাভিভূত। সকলেই আপনজনের মত মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এটা ছিল আমার জন্য অভিজ্ঞতার আরেক ধাপ।

যখন আমার বসনীয় বন্ধু মরহুম ওসমানকে গোসল দেয়া হচ্ছিল, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। কালেমা তৈয়ব ও শাহাদত পড়ে আমার ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা করলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

ইসলামগ্রহণ করবার পর শুধু বসনিয়া নয়, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবার এক দুর্দমনীয় স্পৃহা আমার মনে জেগে উঠলো। কারণ ইসলামী-ভ্রাতৃত্ব কোনও গোত্র বা দেশে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলামী-ভ্রাতৃত্ব সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত।*

---

* রিয়াদ থেকে প্রকাশিত 'আদ-দাওয়া' রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরি এবং 'দৈনিক ইনকিলাব', ঢাকা ২৩/১০/১৯৯৭ থেকে ৩০/১০/১৯৯৭ তারিখে প্রকাশিত।

মুহাম্মদ আলী ক্লে

বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী ক্লে-এর ইসলামগ্রহণের পূর্বের নাম ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে। তিনি আমেরিকার লাউঞ্চিভিলের কেনটাকি শহরের এক নিগ্রো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পৈতৃক ধর্ম খৃস্টান-পরিবেশে লালিত-পালিত হন। তিনি বাল্যাবধি সাদা চামড়ার খৃস্টানদের দ্বারা কালো নিগ্রোদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার, অবহেলা ও ঘৃণা লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। মুসলমানসমাজের গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম-অধিকার, অন্যায়ের বিরোধিতা, সংযম ও পবিত্র জীবনযাপন তাঁকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। তিনি বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক নিগ্রোনেতা এলিজা মুহাম্মদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর হাতে ১৯৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন। মুসলিম পরিচয়ে তিনি অত্যন্ত গর্বিত। তিনি বলেন, "অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি ইসলামগ্রহণ করেছি। ইসলামের আদর্শ ও গুণাবলী বিশেষ করে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, সততা, সরলতা, সভ্যতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে আমি ইসলামগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।" তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে মুষ্টিযোদ্ধা হওয়া থেকে শুরু করে ইসলামগ্রহণ পর্যন্ত সকল ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও ইসলামগ্রহণের ঘটনা সংক্ষেপে তাঁর কথায় তুলে ধরা হলো :

মুহাম্মদ আলী ক্লে

আমার এ পেশা (মুষ্টিযুদ্ধ) শুরু হয়েছিল আমার সাইকেল চুরিকে কেন্দ্র করে। তখন আমার বয়স মাত্র বারবছর। আমার নতুন সাইকেলটি ছিল জীবনের সর্বস্ব। প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক বড়দোকানে সাইকেলটি রেখে আমি বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাড়ি ফিরতে হবে। বৃষ্টি হচ্ছিল। দেখি, আমার সাইকেলটি নেই। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি কাঁদছিলাম। এক আগন্তুক কাঁদবার কারণ শুনে বললেন, "খোকা, তুমি নিচে বেসমেন্টে যাও; সেখানে জিমনিসিয়ামে জো মার্টিন নামে এক পুলিশ অফিসার আছে। তিনি ছেলেদের বক্সিং শেখান। তাঁকে তোমার সাইকেলের ঘটনা বলো। তিনি হয়ত ওটা পাবার উপায় করে দিতে পারবেন।"

অতঃপর মি. মার্টিনকে জানালে তিনি সকল টহল পুলিশকে জানিয়ে দেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত সাইকেলটি পাওয়া যায়নি।

সেখানে দেখলাম, ছেলেরা বক্সিং শিখছে। মি. মার্টিনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে বক্সিং শেখা যায়? তিনি বললেন, "সপ্তাহে ছয় দিন সন্ধ্যার পর এখানে চলে এসো; আমি তোমাকে বক্সিং শেখাবো।"

একদিন টেলিভিশনে মি. মার্টিনকে বক্সিং খেলতে দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম আগামিকাল থেকেই বক্সিং শিখতে যাবো। মাত্র দু'সপ্তাহ বক্সিং শিখে আমি টেলিভিশনে নামবার সুযোগ পাই। আমি ছিলাম এ্যামেচার বা শখের বক্সার। তাতেই জয়ী হয়ে কতই না আনন্দ পেয়েছি। দেশের মধ্যে এ্যামেচার হিসেবে স্থান পেলাম এবং সোনার গ্লাবস পুরস্কার লাভ করলাম। ১৯৬০ সালে রোম-অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করায় আমার পরিবারের সবাই মনে করলো, আমি পেশাদার হিসেবে নাম করতে পারবো।

আমার আব্বা ছিলেন একজন চিত্রকর। তিনি চেয়েছিলেন, আমিও চিত্রকর হই। কিছু কিছু আঁকতেও শিখেছিলাম। বাল্যকালে নিজের আঁকা চিত্র দেখে নিজেই উপভোগ করতাম। আমরা একটা ছোট একতলা বাড়িতে বড় হয়েছিলাম। তাতে পাঁচটি কক্ষ ছিল। আমি ও আমার ভাই রুডফল একই কক্ষে থাকতাম। আমরা খুব ধনী না হলেও মোটামুটি ভালোভাবেই আমাদের সংসার চলতো। স্কুল ছুটির পর পরিবারকে সাহায্য করবার জন্য আমাদের কোনও কাজ করতে হতো না। আমাদের খাবারের মান ভালো ছিল। খেতামও প্রচুর। আমার আব্বা অনেক সময় নিজেই রান্না করতেন। সবজির 'সুপ' ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। আমি এখনও এটা খুব পছন্দ করি।

ভালো খাদ্যগ্রহণের ফলে আমি একজন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ছেলে হিসেবে গড়ে উঠি। আমি যথেষ্ট উদ্যম, তেজ ও শক্তি পেয়েছি একজন মুষ্টিযোদ্ধা হবার জন্য। বাল্যকালে আমার একটা মোটরগাড়ির খুব শখ ছিল : কিন্তু একটা স্কুটারের বেশি করতে পারিনি। তবে যখন টাকা হলো, প্রথমেই একটা ক্যাডিলাক গাড়ি কিনলাম।

বাল্যকালে আমার বড় মাথা দেখে আম্মা বলতেন, "বড় হয়ে তুই একজন আইনজ্ঞ বা ডাক্তার হলে ভালো হবে; তাহলে তোর মাথার মধ্যে যা আছে, সব কাজে লাগাতে পারবি।" আব্বা বলতেন, "আমার ছেলে আমার মতই সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হবে। সে জানবেনা ঘাবড়ানো কাকে বলে।" আমরা পরস্পর আলাপ করতে খুব ভালোবাসতাম।

আঠার বছর বয়সে স্কুলত্যাগ করি। তখন আব্বা-আম্মা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, বক্সিং আমার সর্বস্ব। কখনও মনে করতাম, আমার একটা ডিগ্রি থাকলে ভালো হতো। অবশ্য এজন্য আমি হীনমন্য ছিলাম না। ডিগ্রিধারী বহু লোকের সঙ্গে মিশেছি— যারা প্রকৃতই বোকা। যাদের কোনও বিচারশক্তি বা সাধারণ জ্ঞানও নেই। আমি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে যেমন নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে পারি, তেমনি রাস্তার একটা মাতালের সঙ্গেও কথা বলতে পারি।

বাল্যে দেখেছি, একটা নিগ্রো ছেলে বস-এর সামনের আসনে বসতে পারতোনা। যেকোনও হোটেলে বা রেঁস্তোরায় সে এক পেয়ালা কফি খেতে পারতোনা বা সে কোনও হলে সিনেমাও দেখতে পারতোনা। একটি ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে; আমি রোমের অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ করে সবেমাত্র দেশে ফিরেছি। একদিন স্বর্ণপদকটি পরে আনন্দিত মনে রাস্তায় হাঁটছিলাম। আমার গর্ব ছিল, বহু জাতিকে পরাজিত করে আমেরিকার জন্য সম্মান বয়ে এনেছি। আমি ভাবলাম, এখন আমি নিশ্চয়ই যেকোনও হোটেলে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খেতে পারবো। আমাদের ছোটশহর লুইডিসের এক হোটেলে ঢুকলাম। তৎক্ষণাৎ কাউন্টারের এক মহিলা আমাকে দেখে বললো, "আমি দুঃখিত, আমরা তোমাকে কিছুই পরিবেশন করতে পারবো না, কারণ এখানে নিগ্রোদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।"

আমি বললাম, "আমার নাম ক্যাসিয়াস ক্লে। আমি এখানেই জন্মেছি, মানুষ হয়েছি এবং রোম অলিম্পিক থেকে আমেরিকার জন্য এ স্বর্ণপদক জয়লাভ করে এনেছি। মেমসাহেব, তুমি কি বলতে চাও, আমি সেই স্বর্ণপদক পরে নিজের

শহরের ক্যাফেতেও একটু বসতে পারবো না বা এক পেয়ালা কফি পান করতে পারবো না?"

মেমসাহেব বললো, "তুমি কে, সে তোয়াক্কা আমরা করি না, শুধু এটুকু জানি, তোমাকে এখানে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা।"

ব্যাপারটা আমাকে এত আঘাত হানে যে, বেশ কিছুদিন আমি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করি। আমি জানতাম, কোনও রাশিয়ান বা কিউবান বা জার্মান-যারা আমেরিকার প্রকাশ্য শত্রু, আমি তাদের দেশের একজন হলে আমাকে এভাবে অপমানিত হতে হতো না।

এ ঘটনার পর প্রতিজ্ঞা করলাম, নিজেকে আর ক্যাসিয়াস ক্লে বলবো না। কারণ এ নাম ক্রীতদাসের প্রভুরা দিয়েছে। আমি একজন মুক্ত স্বাধীন মানুষ। আমার পূর্বপুরুষদের (আফ্রিকার) ধর্ম দীন ইসলামে দীক্ষা নিয়ে মুহাম্মদ আলী নামগ্রহণ করলাম। আমি জানি, প্রত্যেক মুসলিমদেশেই আমার বাড়ি আছে, যেহেতু আমি মুসলমান। তুরস্ক, মিশর, পাকিস্তান, আরব, আলজিরিয়া ও আরও কত মুসলিমদেশ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। তারা আমাকে তাদেরই এক ভাই ভাবে।

এলিজা মুহাম্মদের অনুসারীদের অনেকেই চরমপন্থী বলে। আমি তাদের বলি, একটা দৃষ্টান্ত দেখাও, কোথায় আমাদের কে, কোনদিন জোরজবরদস্তি করেছে? আমাদের কাছ থেকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, একটা সাধারণ ছুরি পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে দেয়া হয়না, কি করে আমরা চরমপন্থী হলাম?

বলা হয়, আমি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করি; কিন্তু আমার এমন সময় নেই যে, আমি কোনও মানুষকে ঘৃণা করবো। বরং আমিই ঘৃণার পাত্র, আমার বিশ্বাসের কারণে। তবে শ্বেতাঙ্গরা আমাদের লোকদের প্রতি যে ব্যবহার করে, তার জন্য তাদের ঘৃণা করি, আমাদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেবার জন্য ঘৃণা করি, বিনাবিচারে আমাদের লোকদের হত্যা করবার জন্য ঘৃণা করি।

আমি কোনও ধর্মই ঘৃণা করি না; কারণ প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে তার নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করবার। আমি খৃস্টানধর্মে পালিত হয়েছি, প্রত্যেক রোববার গির্জায় গিয়েছি। মন্ত্র শুনেছি। মহিলাদের চিৎকার করতে, তাদের পকেটবই ওড়াতে ও লাফালাফি করতে দেখেছি; কিন্তু কিছুই আমাদের বোধগম্য হয়নি।

ইসলামগ্রহণের পর আমি অমূল্য সম্পদ লাভ করেছি। আমি মদ্যপান ও নেশাত্যাগ করেছি। অন্যান্য গর্হিত কাজ বর্জন করেছি। অশ্লীল ছবি দেখা বন্ধ করেছি। নাইটক্লাব ছেড়েছি।

মুল্যবান কিছু পেতে হলে, কিছু হারাতে হয়। আমি অনেক বন্ধু হারিয়েছি; কিন্তু এমন অনেককে পেয়েছি, যাঁরা আমার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন। আমিও তাঁদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। ইসলামের আশ্রয় যদি না পেতাম, তা হলে আমি মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হতে পারতাম না এবং এ-পর্যন্ত সুখ্যাতি বজায় রাখতে পারতাম না। অন্যান্য বিজয়ীর মত আমিও নানাপ্রকার প্রলোভনের বশিভূত হতাম।

বৃটেনে হেনরি কুপারের সঙ্গে লড়াইয়ের আগে আমি বলতাম, আমি মহান, আমি সুন্দর, আমি সম্রাট, আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবেনা। আমার এ ধরণের উক্তি করবার উদ্দেশ্য ছিল খ্যাতিলাভ, অধিক অর্থপ্রাপ্তি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিকরা। মুষ্টিযুদ্ধটাই আমার জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার কারণে আমার মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা জন্মেছিল যে, আমি মুষ্টিযুদ্ধে কোনও আঘাত না খেয়েই জিততে পারতাম। আমিও কাউকে মারাত্মক আঘাত করে খেলতাম না। সামান্য কিছু আঘাত যা দিয়ে থাকি, তা কেবল দর্শকদের খুশি করবার জন্য। হেনরি কুপারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আমি তাঁকে এমনভাবে আঘাত করতে পারি না, যাতে তাঁর সন্তান ও স্ত্রীর অন্তরে ভীষণ ব্যথা লাগে এবং যার ফলে তাঁদের ভবিষ্যত জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হেনরি ছিল বৃটেনের চ্যাম্পিয়ান। আঘাত না করবার প্রধান কারণ, এটা আমার পবিত্র ধর্ম ইসলামের শিক্ষা। তা'ছাড়া রক্ত বহাতে আমি ঘৃণা করি। মুষ্টিযুদ্ধকে আমি একটা স্পোর্টরূপে গ্রহণ করেছি। আগের যুগের বর্বর মনোবৃত্তি নিয়ে আমি লড়াই করি না।

আমার বক্সিং দেখে অনেকেই মনে করেন, আমি অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে পারি; কিন্তু তা না করে কেবল খেলা করি। যেরূপ হয়েছিল চুভালু ও প্যাটারসনের সঙ্গে লড়াইয়ে। আমার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য আমি বিশ্বজয়ী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধার গৌরব অর্জন করি, আর তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে।

মুষ্টিযুদ্ধে আমি লাখ লাখ ডলার উপার্জন করেছি। আমার কাছে অর্থের কোনও মূল্য নেই। আমি চাইনি, আমার আব্বা-আম্মা আগের ছোটবাড়িতেই বাস করুন। তাদের জন্য আমি একটা সুসজ্জিত বড়বাড়ি কিনে দিয়েছি। আমি সবসময়ই চিন্তা করি, আমেরিকার নিগ্রোদের কথা। তারা সবাই দরিদ্র, ক্ষুধার্ত; তারা পৃথিবীতে নরকবাস করছে। তারা জানে না, তারা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় ধাবিত হচ্ছে। এলিজা মুহাম্মদের ধ্যান-ধারণা এবং তার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমি নিগ্রোদের দেখেছি, একে

অপরের গলা কাটতে, মারামারি করতে, চুরি করতে। কোনও একতা ও ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল না। এলিজার শিক্ষার ফলে এখন তারা ভদ্র হয়েছে, কাপড় পরা শিখেছে। তাদের মেয়েরা লম্বা কাপড় পরা অভ্যাস করেছে। সবচে বড় কথা— তারা একত্রে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া শিখেছে। আমি আমার বাকি জীবন এলিজার অনুসারীরূপে ইসলামের প্রচার কাজে কাটাতে চাই। ইহজগতে থাকবার মত আর আমার বয়স নেই। এখন ইসলামের জন্য আমার সবকিছু উৎসর্গ করতে চাই। এ জন্য সবার দুআ কামনা করি।

সউদি আরবের 'ওকাজ' পত্রিকার জুমাবারের পাতা 'আল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়া' থেকে জানা যায়, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 'মুহাম্মদ আলী ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সাক্ষাতকারের দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ২০৭টি মসজিদ, ৪৫টি ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তা ছাড়া ১,৭৩৪ ব্যক্তিকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত শিকাগো শহরে 'ইকরা ইসলামী একাডেমি' ও 'মসজিদ আল-ফাতির' প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসজিদটিতে একসঙ্গে তিন হাজার মুসল্লি জামায়াতে নামায আদায় করতে পারেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ম্যাসাচুসেটসের মাউন্ট ইভা কলেজ থেকে মুহাম্মদ আলীকে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজে অগ্রণীর ভূমিকা রাখবার জন্য সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বলেন, "বক্সিংয়ের জন্য নয়, বরং মানবিক কল্যাণে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য মি. আলীকে এ সম্মান দেয়া হয়েছে।" এ সম্মান লাভে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় মি. আলী বলেন, "অতীতে আমাকে বাদশাহ্, গ্রেটেস্ট, চ্যাম্পিয়ান ইত্যাদি নানা উপাধি দেয়া হয়েছে। আমি এখন নিজেকে 'ডক্টর' বলেও দাবি করতে পারি।" কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট পল ডানফি জানান যে, "আলীর জন্য এ ডিগ্রিটি বহুপূর্বেই প্রাপ্য ছিল।" এ-সময় উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকরা দাঁড়িয়ে মি. আলীকে বিপুলভাবে সংর্ধনা জানান।

মি. আলীকে "নিজ পরিবার ও সন্তানদের মাঝে কতটুকু ইসলামী ভাবাদর্শ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।" এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমার সবক'টি সন্তান ও ভগ্নি পুরোপুরি ইসলামের অনুসারী। তাঁরা দীনীশিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ পাবন্দ। আমার পাঁচ সন্তান। মারইয়ম, রাশিদা, খালিদা, মুহাম্মদ ও হানি। আল্লাহর ফজলে এরা সকলেই

ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনকারী। এদের জন্য আমার সম্পদের সামান্য কিছু রেখে বাদবাকি সবই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছি— এজন্য যে, এ একটি মাত্র সম্বল পরকালে গিয়ে পাবো; আর এটাই কেবল আমাকে আল্লাহর প্রিয় করতে পারবে।"

তাঁকে প্রশ্ন করা হয় : আপনার বিরাট সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হন না?

উত্তর : পৃথিবীর সকল মানুষ ও আমেরিকার জনগণ আমাকে শুধু ইসলামের একজন খাদেম ও দীনের দায়ী হিসেবে গ্রহণ করুক— এটাই আমি চাই। নেতৃত্ব ও সিংহাসন আমি চাই না। যে খ্যাতি ও মর্যাদা আমি অতীতে পেয়েছি, তা নেতাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হবার জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখান করি। আমি একনিষ্ঠভাবে শুধু ইসলামের জন্য আমার সর্বশক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যম নিয়ে কাজ করতে চাই। কেননা ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন, এ ছাড়া মুক্তির আর কোনও পথ খোলা নেই।

বিশ্বের অসহায়, দুঃখী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। এর প্রতিদান আল্লাহ অবশ্যই দেবেন। আল্লাহর আদেশ মেনে চললে পরকালে বেহেস্তে স্থান লাভ করা সম্ভব হবে।

বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে আমার অনুরোধ : আপনারা ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার ও কালেমার দাওয়াতের কাজ পুরাদমে চালিয়ে যান। তিরিশটি বছর আমি মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ে ছিলাম। এখন আমার একমাত্র চাওয়া-পাওয়া এবং সাধ ও সাধনা কেবল ইসলামপ্রচার এবং মহাসত্যের প্রতি মানুষকে দাওয়াত প্রদান।*

---

* কেন মুসলমান হলাম? মাও: আবুল বাশার জিহাদী, মার্কাজে ইশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ৮০-৮৫।

মুহাম্মদ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব

আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব ১৮৪৬ ঈসায়ী সালে কলম্বিয়ার হাডসন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিউইয়র্কে লেখাপড়া এবং ছোটগল্প ও প্রবন্ধলেখকরূপে সুনাম অর্জন করেন। তিনি 'জোসেফ গেজেট' ও 'মসৌরি রিপাবলিকান' নামক দুটো পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৭ ঈসায়ী সালে তিনি ফিলিপাইনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তখন থেকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে থাকেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি সমগ্রমুসলিম-বিশ্ব পরিভ্রমণ এবং ইসলামপ্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯১৬ ঈসায়ী সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমৃত্যু তিনি 'ইসলামিক প্রপাগান্ডা মিশন'-এর পরিচালক ছিলেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

M. Alexander Russell Webb

আমার জন্ম আমেরিকায়। এ-দেশের অধিবাসিরা নামমাত্র খৃস্টান। বাল্যকালে গির্জার গোঁড়া ধর্মযাজকদের তত্ত্বাবধানে আমি লালিতপালিত হই। তা সত্ত্বেও কেন ইসলামগ্রহণ করলাম, সেটা বলবো। আমি ইসলামগ্রহণ করেছি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের পর, আমি সম্যক বুঝেছি, ইসলাম মানব-আত্মার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাবার জন্য

সর্বোৎকৃষ্ট ও একমাত্র পথ। কোনওরূপ বল প্রয়োগের ফলে আমি ধর্মান্তরিত হইনি।

আমার বয়স যখন ২০ বছর, তখন প্রকৃতপক্ষে আমার নিজের অভিভাবক ছিলাম আমি নিজেই। গির্জার কার্যকলাপ আমার কাছে ভালো না লাগায় আমি গির্জা ছাড়ি। আমার মন অনুসন্ধিৎসু ছিল। আমি প্রত্যেক বিষয়ের কারণ জানতে চাইতাম এবং কোনও সাধারণ লোক বা পাদরি খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে কোনওপ্রকার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারতো না। তারা বলতো, এটা একটা রহস্যময় বিষয় কিংবা বোধশক্তির বাইরে।

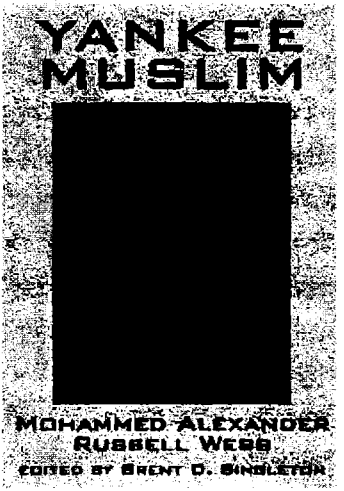

এরপর আমি প্রাচ্য-ধর্মগুলো জানবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হই। আমি মিল, রুক, ক্যান্ট, হেগেল, হাকসলিসহ অনেক পণ্ডিত লেখকের জীবনের মৌল উপাদান ও পরমাণু বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি; কিন্তু কেউ আমাকে 'আত্মা' সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি হবে— সেকথা বলতে পারেননি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, আমার ইসলামগ্রহণ অন্ধবিশ্বাস বা বিপথে চলবার উদ্দীপনা অথবা আবেগের তাড়নায় হয়নি। আমার ইসলামগ্রহণের মূলে রয়েছে— আমার আন্তরিক অধ্যবসায়, পক্ষপাতহীন পর্যালোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফল।

আমার প্রকৃত বিশ্বাসের নির্যাস হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ এবং তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা নামায। নামায বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম ও উদার বদান্য শিক্ষা দেয়। নামাযের জন্য মানুষের মনের, দেহের, কর্মের ও কথার পবিত্রতা এবং পূর্ণরূপে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। আমার মতে মানুষের জানা সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই শ্রেষ্ঠতম এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা— যা মানুষের জন্য অপূর্ব নিয়ামত।*

---

* 'Islam : Our Choice, মি. ই. এ. বাওয়ানি, আশা বাওয়ানি, ওয়াক্‌ফ্ এস্টেট, করাচি, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫-২৬; দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২৬-৯-১৯৮২।

মরিয়ম জামিলা মারকিউস

মার্গারেট মারকিউসের জন্ম ইহুদিপরিবারে। তিনি ১৯৬১ সালে ইসলামগ্রহণ করেন। তার আগে তিনি নিজের ধর্মের সঙ্গে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম-মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা ও অধ্যয়ন করেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের সঙ্গে পত্রালাপ হয় তাঁর। ইসলামগ্রহণের পর তিনি নিরলসভাবে সত্যিকার ইসলাম তুলে ধরবার জন্য লেখনি চালিয়ে যেতে থাকেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ ও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ইসলামগ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থ (ইসলাম এন্ড মডার্নিজম)-এ বিস্তারিত লিখেছেন :

মরিয়ম জামিলা

দশ বছর বয়সে ইসলামের প্রতি আমার প্রথম অনুরাগ জন্মে। তখন আমি ইহুদিদের রবিবাসরীয় স্কুলের ছাত্রী। আরব ইহুদিদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক জানবার জন্য তখন থেকে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইহুদি কিতাব থেকে জেনেছি হযরত ইব্রাহিম (আ) আরব ও ইহুদিদের পিতা। শত শত বছরধরে মধ্য ইউরোপের খৃস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ট ইহুদিরা মুসলমানশাসিত স্পেনে যেমনভাবে সাদর অভ্যর্থনা ও মর্যাদা লাভ করে সেসবও আমাদের পড়ানো হয়। হিব্রু-সাংস্কৃতিক সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেবার পেছনে আরব ইসলামী-সভ্যতার মহানুভবতা কাজ করেছে। ইহুদিদের ইতিহাস পড়বার প্রতি আমার গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রবিবাসরীয় স্কুলে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। বাড়িতেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবেশ উন্নত ছিল না। আমার বড়বোন রবিবাসরীয় স্কুলের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে। কারণ মা প্রতিদিন তাকে বিছানা থেকে টেনে ওঠাতেন। আর সেজন্য প্রতিদিন সে ঝগড়া-বিবাদ ও কান্নাকাটি না করে স্কুলের

দিকে পা বাড়াতো না। মা-বাবা এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়েন এবং স্কুলে যাবার ব্যাপারটা তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে ফিলেক্স এডলার প্রতিষ্ঠিত 'ইথিক্যান কালচারাল মুভমেন্ট' নামক সংস্থায় যোগদান করে জানতে পারি— একটিমাত্র ধর্মই বিশ্বের জন্য উপযোগী। কিছুদিনের জন্য আমি নিউইয়র্কের 'বাহাই' দলে যোগদান করি। প্রথমত ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভেবে ও মানবজাতির একত্ব প্রচারের কারণেই 'বাহাই' এর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে। কিন্তু যখন দেখলাম, এ আদর্শ বাস্তবায়নে এরা দারুণভাবে ব্যর্থ, তখন এক বছর পর আমি বিরক্ত হয়ে পড়ি এবং তাদের প্রতি আমার মোহ কেটে যায়। আঠারো বছর বয়সে আমি এক ইহুদি যুব-সংগঠন 'মিজরাট হিতজিয়া'-এর সদস্য হই। কিন্তু কয়েক মাস পর যখন ইহুদিদের সত্যিকার চেহারার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন হতাশ হয়ে সেই যুব-সংগঠন পরিত্যাগ করি। বিশ বছর বয়সে আমি যখন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তখন আমার পাঠ্যসূচিতে একটি নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল 'ইহুদি ধর্ম ও ইসলাম'। আমাদের হিব্রু ভাষার প্রধান অধ্যাপক রাব্বি আব্রাহাম ইসয়াক কাতুস ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, ইসলামের উৎপত্তি ইহুদিধর্ম থেকে। তিনি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে সেগুলোকে ইহুদি সূত্রের বলে প্রমাণের চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, ছাত্রদের কাছে ইসলামের ওপর ইহুদিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আমি লক্ষ্য করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল ইহুদি নেতাই আরব-ফিলিস্তিনিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন ও অধিকারের প্রতি নির্বিকার। তাদের আচরণ দেখে আমি অন্তরের দিক থেকে আর নিজেকে ইহুদি ভাবতে পারলাম না। অধ্যাপক কাতুস বলতেন, মৃত্যুর পর আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে হিসেব দিতে হবে। কর্মফল অনুসারে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে, একথা যারা বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করে, তারাই দীর্ঘ কল্যাণের জন্য জাগতিক সাময়িক সুখবিসর্জন ও ত্যাগস্বীকার করতে পারে। তাঁর বক্তব্য শোনার পর আমি ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'তালমদ'-এর সঙ্গে প্রাচীন বাইবেল এবং কুরআন ও হাদিসের তুলনা করতে থাকি। ইহুদিধর্মের অসংগতি লক্ষ্য করে আমি মুসলমান হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আমার পরিবার আমাকে যুক্তি দিয়ে ইসলামের বাইরে রাখবার ব্যবস্থা করে। আমাকে হুশিয়ার করা হয়, ইসলাম আমার জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করবে, কেননা ইসলাম ইহুদি ও খৃস্টানধর্মের ন্যায় উদার নয়। আমাকে বলা হয়, ইসলাম আমাকে আমার পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে দেবে। এ চাপ

মোকাবেলা করবার মতো তখন আমার ঈমানের বুনিয়াদ ছিলনা। মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং স্নাতক ডিগ্রি নেবার আগেই আমাকে কলেজ ছাড়তে হয়। এরপর দু'বছর আমাকে বেসরকারি চিকিৎসাধীনে বাড়িতে থাকতে হয়। আমার অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে। আমার পরিবার বেপরোয়া হয়ে আমাকে ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে আটকে রাখে। কারণ আমি শপথ নিয়েছিলাম, কোনওক্রমে সুস্থ হলেই আমি ইসলামগ্রহণ করবো। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার অনুমতি পেয়েই নিউইয়র্ক শহরের মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। সৌভাগ্যবশত অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে পরিচিত হই, যারা ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। এ সময় বিশ্বের মুসলিম নেতৃবর্গের সঙ্গে ব্যাপক পত্রালাপ ও যোগাযোগ করি এবং তাঁদের লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়তে থাকি। আলজেরিয়ার আলেমসমাজের নেতা শেখ ইব্রাহিম, ওয়াশিংটন ডিসির ইসলামিক কেন্দ্রের পরিচালক ড. এফ হোপল্লা, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ আল বাহাই, প্যারিসের ড. হামিদুল্লাহ, জেনেভা ইসলামী-কেন্দ্রের পরিচালক ড. সৈয়দ রমযান এবং পাকিস্তানের মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করি। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামগ্রহণ করি। এর আগে আমি লক্ষ্য করেছি, তথাকথিত আধুনিকতার আন্দোলন সমসাময়িক বিশ্বের ঈমানের পরিপূর্ণতার ওপর হুমকি সৃষ্টি করেছে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ঈমানের ধারণার ওপর মানবরচিত দর্শন ও সংস্কারের গোজামিল দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা— এটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল। আধুনিকতাবাদীরা বিজয়ী হলে কোনওকিছু আর খাঁটি থাকবে না। আমার সমগ্র কিশোরজীবনে আমি সংস্কারপ্রাপ্ত ইহুদিধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা, মুনাফিক ও অন্তর্ধারায় শূন্যতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মুসলমানদের মধ্যেও আমি এরূপ অবস্থা দেখে নিরাশ হয়েছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলমানদের কিছু পণ্ডিত ও নেতা একই ধরণের পাপ করছেন; যে পাপের জন্য আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইহুদিদের সীমাহীন লানত দিয়েছেন। আমি থেমে গেলাম। অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুতাপ এবং কার্যপ্রণালী পরিবর্তন না করলে ইহুদিদের ন্যায় আমাকেও আল্লাহ্ বিপর্যয় দিয়ে ধ্বংস করবেন। আমি শপথ নিলাম, আল্লাহ্র পথে জিহাদ চালিয়ে যাবো।*

---

* 'ইসলাম এন্ড মডার্নিজম' গ্রন্থ থেকে।

নূহ হামিদ কিলার

বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নূহ হামিদ কিলার ১৯৫৪ ঈসায়ী সালে আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাদেশিক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। রোমান ক্যাথলিক হিসেবে এক রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবারে তিনি বেড়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন তাঁর মনে দোলা দিতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৭ ঈসায়ী সালে মিসরের কায়রোতে গিয়ে তিনি ইসলাগ্রহণ করেন। খৃস্টধর্ম ছেড়ে ইসলামগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "১৯৬৩ ঈসায়ী সালের দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল অনুযায়ী চার্চের নির্ধারিত কোনও মাপকাঠি ছিল না। এ-কারণেই ক্যাথলিক-চার্চের উপাসনা ও প্রথাসমূহেও বরাবর পরিবর্তন চলে আসছিল। গির্জায় পাদরিরা চার্চীয় নিয়ম-কানুনে নমনীয়তার পক্ষপাতি ছিল। তা সত্ত্বেও তারা সাধারণ ক্যাথলিক-সমাজকে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছিল। আল্লাহপ্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ ইঞ্জিল ইরানি থেকে ল্যাটিন, ল্যাটিন থেকে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে তার অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী শব্দাবলীর স্থানে বিভিন্ন ভাষার মানুষ নিজের সুবিধামতো শব্দ বসিয়েছে। এমনকি এ পবিত্র গ্রন্থটিকে গুয়েটার ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের অনুরূপ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এ-পরিবর্তনের আরও একটি কারণ ছিল, তাদের আকিদা-বিশ্বাসের জটিলতা। যেমন : ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস, যার কোনও ব্যাখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কোনওদিন দিতে সক্ষম হয়নি। কোনও সাধারণ খৃস্টান তো নয়ই, বরং কোনও পাদরিও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মতে, স্রষ্টা জান্নাতে অবস্থান করে জগতের রাজত্ব পরিচালনা করছেন। পৃথিবীতে আছেন আল্লাহর পুত্র ঈসা মসীহ— যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানবতা রক্ষা করেছেন। আর ফেরেস্তা হযরত জিব্রাইল (আ) যিনি একটি শুভ্র পাখিরূপে বিচরণ করছেন।

আমার এখনও মনে আছে, আমি যখন মারাত্মক কোনও বিপদের সম্মুখীন হতাম, তখন আমার দ্বারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হতো না যে, তিন সত্তার কাকে আমি সাহায্যের জন্য ডাকবো? সবশেষে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতাম যে,

তিনজনের ওপর আল্লাহ্‌রই প্রাধান্য থাকা উচিত। যতদিন আমি খৃস্টান ছিলাম, এ তিন সত্তার সমান ক্ষমতার চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসেনি। কেননা এ সমতা আমার ক্যাথলিক বিশ্বাসের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতো। খৃস্টবাদ সম্পর্কে আমার এ অবিশ্বস্ততার আরও একটি কারণ ছিল, তাদের স্টক্‌স বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া। বাইবেল নিয়ে আমি যখনই পড়াশোনা করেছি, এর পারস্পরিক সাংঘর্সিক বিষয়গুলো আমাকে হতাশা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। পরে খৃস্টবাদের অন্য গ্রুপ প্রোটেস্ট্যানদের নিয়ে যখন পড়াশোনা করলাম, তখন বুঝলাম যে, তাদের এ অসম্পূর্ণতা কোনওভাবেই পূর্ণ করা সম্ভব নয়। একেক গ্রুপ নিজেদের সুবিধামত আকিদা-বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে আর অন্যান্য গ্রুপকে বাদ দিয়েছে। ক্যাথলিকসে শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীত বাকি সবকিছু বাদ দেয়া হয়েছে। মোটকথা, বাইবেলের কোথাও পুরো জীবনের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। আর যেটুকু আছে, তার একটা আর একটার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন খৃস্টবাদ নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করি, তখন আমার বুঝে আসেনা যে, নিউ টেস্টামেন্ট এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট মূল গ্রন্থের সত্যাসত্যকেই সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমি জ্যাকস জারমিয়াসের লেখা 'দি প্রবলেম অব হিস্টরিক্যাল থিসিস' পড়েছি। জারমিয়াস এ শতাব্দের নিউ টেস্টামেন্টের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। তিনি পবিত্র ইঞ্জিলের মূল ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিত রুডলিফ রোলেটরের এ মতবাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নিউ টেস্টমেন্টের ওপর ভিত্তি করে হযরত ঈসা (আ)-এর কোনও গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য জীবনী লেখা সম্ভব নয়। খৃস্টবাদে বিশ্বাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যখন এ চরম সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন বিরোধী পক্ষের জবাব দেবার জন্য খৃস্টানদের কাছে অন্য কোনও দলিল-প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে কি? বাইবেলে ঐশীবাণীকে কল্পকাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাহিনীগুলো ঐশীবাণীর ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। কোনও মানুষের পক্ষে বাইবেলের কল্পকাহিনী থেকে ঐশীবাণীকে পৃথক করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে আমি আর্থার শওপান হার এবং ফ্র্যাডরেকের 'নাতাশা' পড়েছি। কিন্তু কোনওটিই খৃস্টবাদের ওপর আমার আস্থাহীনতা দূর করতে পারেনি। আমি ইমাম গাযযালি (র)-এর একটি গ্রন্থ পড়েছি— যা পাঠে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আই. জে. আর বেরিজ কর্তৃক অনুদিত কুরআন শরিফও আমি পড়েছি। যদিও অনুবাদটি ছিল একজন খৃস্টানের, তথাপি তার প্রতিটি ছত্রে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন আল্লাহর কালাম হবার প্রমাণ মেলে এবং কুরআনের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

এতে আল্লাহকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে এবং মানুষকে নিছক বান্দা হিসেবে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সুন্দর ও সাবলীল ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে।

এক সময় আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য আমি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। এক বছর পর আমি আরবি ভাষায় পুরোপুরি দক্ষতা অর্জনের জন্য কায়রো যাই। মিসরে আমার এমনকিছু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, যার দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। পবিত্র কুরআনের প্রতি সেখানকার মুসলমানদের যে অগাধ বিশ্বাস দেখেছি, খৃস্টান-জগতের কোথাও আমি তা দেখিনি। একদা প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে নীলনদের তীরে এক চিলতে কাপড়ে জনৈক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলাম। নামাযে সে এতই মনোযোগী ছিল এবং স্বীয় প্রভুর সঙ্গে তার মনোনিবেশ এতই গভীর ছিল যে, মনে হচ্ছিল, সে এ জগতে নেই। একজন মানুষ উপাসনায় এত গভীর মনোযোগী হতে পারে, তা ইতোপূর্বে আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছিল যে, মানুষ স্বীয় প্রভুর সঙ্গে এত গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। স্রষ্টার প্রতি এভাবে মনোনিবেশ করতে আমি কোনও পাদরিকে দেখিনি। কোনও ধর্মে সাধারণ মানুষের ওপর এত বেশি প্রভাব ফেলতে কখনও দেখিনি, যা কায়রোতে অবস্থানকালীন ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে দেখেছি। খৃস্টবাদে অনেক ভালো বিষয়াদিও রয়েছে; কিন্তু এর সকল ভালোর ওপর অস্পষ্টতা ও বৈপরিত্য প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অথচ এ পবিত্র কুরআন মজিদের কোনও একটি স্থানেও এরূপ দেখা যায় না। কুরআনের প্রতিটি কথা স্পষ্ট। এর প্রতিটি বিধি-বিধান যুক্তিতর্ক ও প্রমাণভিত্তিক। পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর আলোচনা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। খৃস্টানরা মুহাম্মদ (স) এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেভাবে কটূক্তি করে, সে হিসেবে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কোনও কটূক্তি তো দূরের কথা, ইসলামে তাদের সত্যধর্মের অনুসারী বলা হয়েছে।

একদিন কায়রোতে একবন্ধু আমাকে যখন ইসলামগ্রহণের কথা বললো, তখন তার কথা আমার মনে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হলো। অবশেষে ১৯৭৭ সালে ইসলামগ্রহণ করে আমি ধন্য হই। তখন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের ওপর আমি একাধিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছি। আজীবন আমি ইসলামী জীবনযাপন এবং ইসলামপ্রচারে সর্বশক্তি ও সামর্থ কাজে লাগাতে চাই।"*

---

* মাসিক আল-ফারুক, করাচি ও দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৩০/১১/২০০০ ও ৭/১২/২০০০ তারিখে প্রকাশিত।

তুকলুক তিমুর

খুবই আশ্চর্যজনক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা। কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক যদি এর উল্লেখ করতেন, তবে অমুসলমানরা বলতে পারতেন, ইসলামের মহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশে এটা একটা কল্পিত গল্প। কিন্তু কাহিনীটির বিবরণদানকারী একজন অমুসলিম ইতিহাসবিদ। নাম তাঁর টমাস আর্নল্ড। একজন অমুসলমান ইসলামের মহিমা সম্প্রচারের জন্য কোনও বানোয়াট গল্পের অবতারণা করবেন এরূপ ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক। চেঙ্গিস খাঁ আল্লাহর গজব বলে মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে আবার চুখতাই ছিলেন বেশি ইসলামবিদ্বেষী। গল্পটি তাঁরই প্রপৌত্র তুকলুক তিমুরের ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে।

তুকলুক তিমুর তখন কাশগড়ের যুবরাজ। সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী। তিনি শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর শিকারের জন্য বিরাট এক এলাকা ঘেরাও করা হয়েছে। এ ঘেরাওকরা জায়গায় কা..র প্রবেশের সাধ্য নেই। কিন্তু অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে দেশপর্যটনরত বোখারার জামালুদ্দিন নামে এক দরবেশ নিজের অজান্তে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করেন। নজরে আসামাত্র বাদশাহী সেপাইশাস্ত্রী দলবলসহ দরবেশকে গ্রেফতার করে হাত-পা বেঁধে যুবরাজের কাছে নিয়ে যায়। তাঁকে দেখে যুবরাজ গর্জে ওঠেন। প্রশ্ন করেন, রাজকীয় শিকারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করবার দুঃসাহস তারা কোথা থেকে পেল? উত্তরে দরবেশ জানান, মুসাফির তাই এলাকাটি যে বাদশাহ নামদারের শিকারের জন্য ঘেরাওকরা হয়েছে, তা তাদের জানা ছিলনা। কথা শুনে বাদশাহ তাদের নিবাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এবার জামালউদ্দিন উত্তরে জানান যে, তারা পারস্যবাসী। একথা শুনে বাদশাহ বলেন, পারস্যবাসিরা কুকুর থেকেও অধম। প্রত্যুত্তরে দরবেশও বাদশাহকে শোনান যে, আলোকবর্তিকা স্বরূপ ঈমান দ্বারা যদি তাদের অন্তর আলোকিত না থাকতো, তবে তারা সত্যিই কুকুরের চেয়েও অধম বলে বিবেচিত হতো। দরবেশের কথা শুনে বাদশাহ স্তম্ভিত হয়ে যান। দরবেশকে একান্তে নিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা

করেন, ঈমান কি জিনিস? দরবেশ বাদশাহর কাছে ইসলামী বিধি-বিধান এমন প্রাঞ্জল এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন আর অবিশ্বাসের কুফল ও পরিণামের এমন নিখুঁত এবং জাজ্বল্যমান চিত্র তুলে ধরেন যে, ক্ষণিক-পূর্বে পাষাণহৃদয় বাদশাহ তাঁর ঈমানী তেজের আভায় মোমের মত গলে যান এবং নিজের ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা বুঝতে পেরে ইসলামগ্রহণের জন্য মনে-প্রাণে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু দরবেশকে তিনি বলেন, যদি তিনি সেই মুহূর্তে ইসলামগ্রহণ করেন এবং তা জানাজানি হযে যায়, তবে তিনি রাজসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে রাজ্যের সকলের ইসলামগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবার সুযোগ তিনি হারাবেন। তাই পিতৃপুরুষের সিংহাসন করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জামালউদ্দিনকে ধৈর্য-ধারণ করতে বলেন। তুকলুক তিমুর সিংহাসনে আরোহণের পর ছিন্ন-ভিন্ন চুখতাই সাম্রাজ্য আবার একত্রিভূত করেন। ইতোমধ্যে জামালউদ্দিন দেশে ফিরে গিয়ে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত জামালউদ্দিন পুত্র রশিদ উদ্দিনকে ডেকে নিয়ে বলেন, "কালক্রমে তুকলুক তিমুর একজন পরম পরাক্রান্ত শালী বাদশাহ হবেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভয় পেওনা বা ভুল করো না।"

চুখতাই সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কিছু দিন পর রশিদ উদ্দিন তাঁর মরহুম পিতার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা পূরণের জন্য সম্রাটের বাসস্থানের দিকে রওনা হন। কিন্তু সম্রাটের সাক্ষাত লাভ করা সোজা কথা নয়। শত চেষ্টা করেও তিনি সম্রাটের সাক্ষাত লাভে ব্যর্থ হন। পরে তিনি এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। একদিন ভোরে তিনি সম্রাটের তাবুর কাছে গিয়ে আযান দিতে থাকেন। আযানের শব্দে সম্রাটের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। তিনি রাগান্বিত হয়ে নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারীকে গ্রেফতার করে আনবার জন্য আদেশ দেন। ধৃত হয়ে সম্রাটের কাছে নেয়া হলে রশিদ উদ্দিন সম্রাটকে তাঁর পিতা জামালউদ্দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তুকলুক খাও তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হননি। তিনি বলেন, সিংহাসন আরোহণের পর থেকেই জামালউদ্দিনের কাছে দেয়া ওয়াদার কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর বা অন্য কারুর সাক্ষাত পাননি। তিনি তখন কালেমা পড়ে মুসলমান হন। তারপর তাঁর ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং আমির তুলিক নামক জনৈক তুর্কি সভাসদকে ইসলামগ্রহণের আহবান জানান। প্রত্যুত্তরে আমির তুলিক অশ্রুভেজা নয়নে সম্রাটকে জানান যে, তিন বছর পূর্বে কাশ্গিরের জনৈক আবেদের কাছে তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন।

বাদশাহ নামদারের ভয়ে তিনি তাঁর ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। তখন তুকলুক তিমুর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন এবং পরে তাঁর পাশে উপবেশন করান।

একে একে সব মুঘল বাদশাহর ইসলাম কবুল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। তাঁদের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খাঁ মুসলিমজাহানের ধ্বংসের যে তান্ডবলীলা চালিয়েছিলেন, পৃথিবীতে এখনও তা নজীরবিহীন হয়ে রয়েছে। চেঙ্গিস খাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনুল আছিব সে-ধ্বংসলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বহুদিন যাবৎ আমি মনে করেছি, এ ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। এখনও আমি তা বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করছি। এমন কে আছে যে, ইসলামের বিনাশ বা মুসলমানদের ধ্বংস উপলক্ষে শোকগাঁথা রচনা করে তৃপ্তি বোধ করবে। হ্যাঁ, যদি আমার মাতা আমাকে প্রসব না করতো বা এ-ধ্বংসযজ্ঞের অনেক পূর্বেই আমি কালগ্রাসে পতিত হয়ে মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতাম, তাই ভালো হতো; কিন্তু আবার এ কথাও ভাবি যে, না-লিখলেই বা কি লাভ হবে? না বলবার কারণে তো সে-ক্ষত নিরাময় হবার নয়। তাই সে-ভয়াবহ দুর্যোগ যা নাকি ইতোপূর্বে কোনও দিবস বা রজনি প্রত্যক্ষ করেনি বা ভবিষ্যতে আর করবেনা, তার বর্ণনা দেবার জন্য মনস্থির করলাম। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করবার পর থেকে জাতিসমূহ বিশেষ করে মুসলমানরা এরকম বিপর্যয়ের মধ্যে ইতোপূর্বে কখনও পতিত হয়নি। মানবজাতি সৃষ্টির পর ইতিহাসে যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ আছে, তা হলো নেবুচাঁদ নজার কর্তৃক বনি ইসরাঈলদের উৎখাত এবং জেরুসালেমের ধ্বংস; কিন্তু তা মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। নেবুচাঁদ নজার মাত্র এক জেরুসালেম ধ্বংস করেছিল। কিন্তু মোঙ্গলবাহিনী ধূলিসাত করেছে অগণিত নগর, বহু জনপদ— যাদের প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ছিল জেরুসালেমের লোকসংখ্যার চাইতে অনেকগুণ বেশি। কেবল হেরাত শহরের বাসিন্দা ছিল এক লাখের ওপর। মোঙ্গল হামলার সময় যে ৪০ জন লোক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, বিধ্বস্ত শহর আক্রমণকারীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পর, তারা গুহা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে শহরের জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে। একমাত্র তারাই জীবিত রয়েছে। বোখারা সমরখন্দের যা নাকি ছিল ইসলামী জ্ঞানগরিমার পাদপীঠ, সমস্ত সভ্য দুনিয়ার গৌরবের বিষয়, তা মোঙ্গল আক্রমণের প্রচন্ডতা, তাদের হিংস্রতা এবং বর্বরতাঁর

দরুণ শশ্মানে পরিণত হয়। একদা ইমাম বোখারি যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, যে খুতবা নাকি দূর দূরান্তের দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে অনুধাবন করবার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন সে-মিম্বারে দাঁড়িয়ে মোঙ্গল দলপতি শহরবাসিদের তাঁর বাহিনীর ঘোড়ার জন্য দানা সংগ্রহের হুকুম দেন। বর্বর মোঙ্গলবাহিনী মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের পাতা ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে তাদের খাদ্য প্রস্তুত করে।

এরকম বর্বর এবং ইসলামের ঘোরতর দুষমনরা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের ধর্মের মহিমা উপলব্ধি করে মোহিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রতি অনুরাগ তাদের সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর ইসলামবিরোধীদের সঙ্গে এককভাবে লড়তে উদ্বুদ্ধ করে। হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-কে হত্যা করতে গিয়ে তাঁর একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। চরম শত্রুকে পরম মিত্রে পরিণত করবার ইসলামের এ এক অদ্ভূত অনবদ্য বৈশিষ্ট্য।

মানুষ বিবেকবান। মানুষের মধ্যে বিবেকের লেশমাত্র হলেও আছে। মানবেতর প্রাণী বিবেকহীন; মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে এটাই প্রভেদ। আর ইসলামের ভিত্তি হলো বিবেক। তাই বিবেকবান মানুষ ইসলামের বিরোধিতা করতে পারে না। মোহবিষ্ট অবস্থায় মানুষ মোহের বশে ইসলামের প্রতি বৈরিতা পোষণ করতে পারে বটে, কিন্তু বিবেক একবার জাগ্রহ হলে সে-বিরোধিতা উবে যায়। বিবেক না থাকলে, মানুষ জানোয়ারেরও অধম বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান বিবেকেরই নামান্তর। তাই দরবেশ জামালউদ্দিন ঠিকই বলেছেন, "যাদের অন্তর ঈমানরূপ সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ নয়, তারা কুকুরেরও অধম বলে বিবেচিত।"*

* কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মীযান' এর সৌজন্যে।

সভেলি কোভালেংকো ফাতেমা

ইউক্রেনের সভেলি কোভালেংকো ১৯৯৫ ঈসায়ী সালের এপ্রিলে মস্কোর ইরানি দূতাবাসে ইসলামগ্রহণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর নামানুসারে নাম রাখা হয়েছে ফাতেমা।

সংবাদসংস্থা ইরনার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে কোভালেংকো ওরফে ফাতেমা বলেন, ধর্মবিশ্বাস নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলামের ওপর গভীর মনোযোগসহ ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। এর মাধ্যমে মানবীয় প্রবৃত্তি ও পরিবেশের সঙ্গে ইসলামের চমৎকার সামঞ্জস্য দেখে ইসলাম তাঁর কাছে একটি স্বাভাবিক ধর্ম বলে মনে হয়েছে। তিনি খৃস্ট ও অন্যান্য ধর্মের ওপরও অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু সেসব ধর্মকে তাঁর নিকট সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটবর্তী মনে হয়নি এবং সেগুলো জীবনদর্শনেরও কাছাকাছি নয়।

একটি ধর্মহীন কমিউনিস্টসমাজে জন্মলাভ করে কিভাবে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, এ মর্মে একটি প্রশ্নের জবাবে ফাতেমা বলেন, তিনি যেখানে বসবাস করতেন, সেখানে তাঁর কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁরা তাঁকে ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ইসলামের নীতি, আদর্শ ও শিক্ষা এবং মুসলমানদের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও সমাজব্যবস্থায় তিনি মুগ্ধ হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছেন।

ফাতেমা বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত সত্য ধর্ম উপলব্ধি করতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি রোযা করেছি এবং রুশভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমি ইসলামের শালীন হিজাব পরিধান করি এবং হিজাব পছন্দ করি। আমি সত্যের সন্ধান লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করি। সত্য সঠিক পথে যেন চলতে পারি- এ জন্য সবার দুআ কামনা করি।*

---

* 'রুশ মহিলার ইসলামগ্রহণ' : ইরানি 'নিউজ লেটার' পত্রিকার সৌজন্যে। এপ্রিল, ১৯৯৫ (ভলিউম-৭, সংখ্যা-৪)

সুলাইমান তাকিউচি

সুলাইমান তাকিউচি (Suleiman Takeuchi) জাপানের একজন মানবতত্ত্ববিশারদ ছিলেন (১৯৫৭-৫৮)। তিনি ১৯৫৯ সালে ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ইসলামগ্রহণের কাহিনী নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

মহান আল্লাহর অসীম রহমতে আমি ইসলামগ্রহণ করেছি। ইসলামে একক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। মানবজীবনের সবসমস্যার বাস্তব সমাধান ইসলামে বিদ্যমান। মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংসারত্যাগী ইবাদতের স্থান ইসলামে নেই। মুসলমানদের জন্য জামায়াতে নামায পড়া শ্রেয় এবং সমাজের খিদমত করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানবজীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের সমন্বয় ইসলামে পাওয়া যায়।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বে কোনও জাতীয়, গোত্রীয় বা জাতি-তত্ত্বীয় বিভেদ নেই। ইসলাম সমগ্রদুনিয়ার মুসলমানদের 'ভাই' হিসেবে একত্রিত করেছে। ইসলাম কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক নির্বাচিত উচ্চপর্যায়ের লোকের জন্য নয়— ইসলাম সাধারণ মানুষের ধর্ম। ইসলাম পাকিস্তানি, জাপানি, ভারতীয়, চিনদেশীয় তথা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। এক কথায়— ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম। সরল জীবনযাপন ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম। ইসলামের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন চৌদ্দ শ বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম তথা জন্মগত ধর্ম, তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের কাছে প্রয়োজনবোধে একে নমনীয় করবারও প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানবসভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে ইসলাম অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

'মুক্তির পথ সমাজের মধ্য দিয়ে'— এটাই ইসলামের নীতি। কিন্তু তাই বলে ইসলাম আমাদের সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে বলে না। বৌদ্ধ ও খৃস্টানধর্ম সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জানি, উভয় ধর্ম এ-কথাই শিক্ষা দেয়, 'পার্থিব বন্ধন ছিন্ন কর, মানবসমাজ ত্যাগ করে— তবেই মুক্তি।' কিছুসংখ্যক বর্ণবৌদ্ধ রয়েছেন যারা সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির তৈরি করেন; যেখানে যেতে

মানুষের বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। জাপানিদের ধর্মে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে— সেখানে সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে 'ঈশ্বর'কে স্থান দেয়া হয়েছে। লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জনস্থানে খৃস্টান সন্ন্যাসীদেরও আশ্রম আছে। তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থেকে ধর্মীয় জীবনযাপন করেন। তাঁরা ধর্মকে চলমান জীবন থেকে পৃথক করে ফেলেছেন, পক্ষান্তরে ইসলাম হাটে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে 'মসজিদ' তৈরি করবার নির্দেশ দেয়। ইসলাম জামায়াতে নামায পড়তে বলে, সেই সঙ্গে সামাজিক কর্তব্য পালন করবারও নির্দেশ দিয়েছে। এ উভয় কাজকেই ইসলাম 'ইবাদত' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরূপ অপূর্ব চমৎকার ব্যবস্থা কেবল ইসলামেই আছে।

শক্তি (Spirit) এবং পদার্থ (Matter) নিয়েই মানুষের জীবন। মহান আল্লাহ আমাদের আত্মা (Soul) এবং শরীর দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ণ মানবজীবনের জন্য আমাদের আত্মা এবং শরীর দু'টাকেই সংযুক্ত রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনকে পৃথক করবার জন্য কোনও রেখা টানা উচিত হবে না। ইসলাম শক্তি ও পদার্থ উভয়কে মেনে চলে এবং এদের স্ব স্ব স্থানে রেখে এ দু'য়ের সমন্বয়ে সমগ্র মানবজীবনের জন্য সুন্দর দর্শন গড়ে তুলেছে।

আমি একজন নওমুসলিম। দু'বছর হলো আমি ইসলামগ্রহণ করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি— আকিদা-বিশ্বাস এবং কাজে-কর্মে সর্বত্র ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়াই ইসলামের প্রধান শিক্ষা। আজ জাপান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। আধুনিক কারিগরী বিপ্লব উপহার দিয়েছে অত্যাধুনিক পার্থিব জীবনব্যবস্থা-যা জাপানিসমাজের রূপ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। তাই কঠোর পরিশ্রমই আমাদের একমাত্র সম্পদ। জীবিকানির্বাহের জন্য প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা সংগ্রাম করি শুধুমাত্র আমাদের পার্থিব লাভের জন্য। জাপানের লোকেরা জানেনা 'আত্মা' কি বস্তু। এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার ফুরসৎ তাদের নেই। তাদের ধর্ম সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই; নেই কোনও পারলৌকিক চিন্তা। জড়বাদী ইউরোপের পদচিহ্ন শুধু তারা অনুসরণ করে চলেছে। তাই দিন দিন তারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দরিদ্র হচ্ছে। তাদের আছে কেবল ভালো খাদ্য ও পোশাকযুক্ত শরীর— যা দুরাত্মা এবং অসুখী আত্মার ধারক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জাপানিরা যেদিন ইসলামগ্রহণ করবেন, সেদিন দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি লাভ করবেন। *

---

* 'Islam : Our Choice : পৃষ্ঠা. ৯৬-৯৭।

ড. হামিদ মার্কাস

বিজ্ঞানী, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক ড. হামিদ মার্কাস বার্লিনের Morlemilsch Review পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তিনি তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে বলেন : ছোট শিশু যেমন তার চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে জানতে চায়, তদ্রূপ আমার অন্তরেও ইসলামের সর্বদিক সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমি জার্মানির যে শহরে বাস করতাম, সেখানকার লাইব্রেরিতে ১৭৫০ ঈসায়ী সালের এক কপি পুরানো অনূদিত কুরআন পেয়ে গেলাম। আল-কুরআনের এ অনূদিত সংস্করণ থেকেই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। ইসলামের শিক্ষাগুলো আমার অন্তরে গভীরভাবে বিন্যস্ত এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। সে-সময়কার ইসলামী দেশগুলোতে ঘটে যাওয়া প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক বিপ্লব আমার মনে দাগ কেটেছিল।

পরবর্তীতে বার্লিনে আমি মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বার্লিন মসজিদের নির্মাতা এবং প্রথম 'জার্মান মুসলিম মিশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যে উৎসাহব্যঞ্জক ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, তা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইসলামের এ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কয়েক বছরের সক্রিয় সহযোগিতা ও ঐকান্তিকতার ফলে আমি ইসলামগ্রহণ করে ধন্য হই।

ইসলাম আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এমনকিছু চূড়ান্ত বিচক্ষণাত্মক সুযুক্তিসম্পন্ন মতামতের সংযোগ ঘটিয়েছে যার সম্পর্কে মানুষ কখনও চিন্তাও করেনি। আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামের বিশ্বাস অত্যন্ত পূত, পবিত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও গোঁড়ামি বা দ্বন্দ্ব নেই। স্বভাবতই ইসলামের এ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত একজন গবেষকের জন্য অসামান্য, দুর্লভ ও অত্যন্ত উপকারী।

বিগত কয়েক বছর ধরে আমি ইসলামকে বারবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি এবং প্রতিবারই গভীরভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছি। ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটি স্বর্ণ-সংযোগ রচনা করেছে। ইসলাম পক্ষপাতহীন, সহিষ্ণু ও উদার ধর্ম। উৎস যাই হোক না কেন 'ভালো' কিছুকে ইসলাম সবসময় মর্যাদা দেয়। ইসলামের এসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমি ইসলামগ্রহণ করেছি।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম, ৩০/১০/২০০০।

ইবরাহিম খলিল আহমদ ফিলিপস

১৯১৯ ঈসায়ী সালে মিসরের এক খৃস্টানপরিবারে ইবরাহিম খলিল আহমদ ফিলিপস জন্মগ্রহণ করেন। খৃস্টান মাতা-পিতার সন্তান হেতু তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিপালন সবকিছুই শুরু হয় মিসরের এক খৃস্টান মিশনারি স্কুলে। মাতাপিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাদের সন্তান খৃস্টধর্মের একজন মহাপণ্ডিত হবে। ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করবে; ফলে পরপারে গিয়েও তাদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে। মাতাপিতার উৎসাহ ও নিজের পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে নিজধর্মের পথে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য মিশন স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ফিলিপস ভর্তি হন মিসরের কলেজ অব থিওলজিতে। ১৯৫৯ সালে উক্ত কলেজ থেকে তিনি মাস্টার্স (এম.এ.) ডিগ্রিসহ খৃস্টানধর্ম ও মিশনারির বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। অল্পদিনের মধ্যেই মিসরে অবস্থিত আমেরিকান খৃস্টান মিশনারি সংস্থা পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ধর্মপ্রচারকাজের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে।

ফিলিপসের জ্ঞান, মেধা ও বিচক্ষণতা খৃস্টানজগতকে আশাতীত মুগ্ধ করে। ফলে ফিলিপসের ওপর এক বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়। তা হলো ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন গভীরভাবে চর্চা করতে হবে। আর গভীরচর্চার মাধ্যমে আল-কুরআনের প্রকৃত অর্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটাতে হবে; অর্থাৎ বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন করে মূল বক্তব্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবাহিত করতে হবে। যাতে বিশ্বের মুসলমানদের কুরআনের দোহাই দিয়ে প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী চিন্তা-চেতনা, চরিত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিশ্চিহ্ন করা যায়।

ফিলিপস কুরআন নিয়ে এ নেতিবাচক গবেষণা শুরু করেন ১৯৫৫ ঈসায়ী সালে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কুরআনের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম লড়াই চলতে

থাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সুধামাখা ও মোহনীয় সত্যবাণীর চড়াই-উতরাই অতিক্রমকালে সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিলের এক হৃদয়গ্রাসী দ্বন্দ্বের যাতনা তাঁর হৃদয়-সাগরে প্রচন্ড উর্মি জাগিয়ে তোলে। চিন্তার অথৈ সাগরের অন্তরে অসীম যন্ত্রণাসহকারে তিনি সাঁতার কাটতে থাকেন। কিন্তু অন্তরের দহন আদৌ প্রশমিত হয় না। বরং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ভেবে কূলকিনারা পান না। অবশেষে সীমাহীন চিন্তার-সাগরে তিনি হঠাৎ কূল পেয়ে যান। এ সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর নযরে পড়ে সূরা জিনের কয়েকটি আয়াত। তাতে বলা হয়েছে, "হে নবী, আপনি বলে দিন, জিনদের একটি দল মনোযোগের সঙ্গে (আল-কুরআন) শ্রবণ করেছে। অতঃপর নিজেদের এলাকাতে গিয়ে তাদের জাতির কাছে বলেছে, আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শ্রবণ করেছি— যা সত্য, সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর আমরা আর কখনও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবোনা। আমাদের রবের মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম অতি উচ্চ ও মহান। তিনি কাউকে স্ত্রী বা সন্তানরূপেগ্রহণ করেননি। আর আমাদের মাঝে যারা নির্বোধ ও মুর্খ তাঁরাই আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু অসত্য কথাবার্তা বলে।" (সূরা জিন : ১-৪ আয়াত)।

আয়াতসমূহের মর্মবাণী ফিলিপসের সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে সৃষ্টি করলো এক প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়। ঝড়ের প্রচন্ড ঝাপটায় তাঁর হৃদয়ের বিদ্বেষ ও অন্ধত্বের কালিমা ঘুচে যায়। নিজ বিবেকের পর্দায় তিনি দেখতে পান মহাসত্যের নির্মল জ্যোতি— যা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে; আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের অমিয় সুধা পান করবার জন্য। ১৯৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর হিদায়েত আর মহাসত্যের উজ্জ্বল আলো ফিলিপসের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করে। সুরা জিনের মাত্র কয়েকটি আয়াত সেদিন তাঁর চিন্তার রাজ্যে মহাবিপ্লব ঘটিয়েছিল। সত্য ও মিথ্যার আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাঁর হৃদয়ে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিবেকের অসহ্য দংশনে কাতর হয়ে তিনি ভাবতে থাকেন, মানবজাতি সৃষ্টির সেরা এবং আল-কুরআনের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও সত্য অস্বীকার করে মিথ্যার কুহকে পড়ে আল-কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে। অথচ জিন জাতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআন থেকে হিদায়েত লাভ করে ধন্য করেছে তাদের জীবন। পক্ষান্তরে, গোমরাহির পথ অবলম্বন করে ভাগ্যবিড়ম্বিত হচ্ছে আমাদের ন্যায় নির্বোধ অথচ সৃষ্টিরসেরা মানুষগুলো। আমি কি জিনদের চেয়ে অধম? এমনি ধরনের নানা প্রশ্ন নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। তিনি

ভাবতে থাকেন, ঈমানবিহীন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা মূর্খতা ও অন্ধত্বের নামান্তর। পরকালের চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তোলে। আল-কুরআনের প্রতি গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর সকল অহমিকা ও গোমরাহির অন্ধত্ব বিদূরীত করে এবং তাঁর মনের প্রতিহিংসা ও দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কালবিলম্ব না করে তিনি শান্তির অমিয় সুধা পানের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পড়ে ইসলামের শান্তির ফোয়ারায় অবগাহন করেন। তিনি তেজদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তাঁর ইসলামগ্রহণের সু-সংবাদ। তিনি ঘোষণা করেন, এখন থেকে তাঁর নাম হবে ফিলিপস-এর বদলে খলিল আহমদ।

আল-কুরআন এর বিরুদ্ধাচরণ করতে এসে তিনি কুরআনের অমিয় সুধা পান করে নিজের ইহকাল ও পরকালকে ধন্য ও আলোকিত করে তুললেন। তিনি অন্তরে গভীর প্রশান্তি লাভ করলেন। তাঁর অন্তরে প্রত্যয় জন্মে যে, আল্লাহ পাকের রহমতে তিনি অবশ্যই সত্যপথ পেয়েছেন। তখন থেকে মহব্বতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল-কুরআন আমল করবার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন।*

* আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত 'আল ইসলাহ' এবং কলকাতার ২৭/বি, লেলিন সরণী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মীযান (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) এর সৌজন্যে।

নেসরিন

মিসরীয় এক অভিনেত্রী নেসরিন। বয়স তিরিশের কোঠার শেষদিকে। একদা থাকতেন উদ্দাম জীবন নিয়ে বেপরোয়া। পরে তিনি হয়ে উঠলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বিসর্জন দিলেন খ্যাতি আর সৌভাগ্য। তিনি হলেন সেই অগণিত মিসরীয়ের একজন, যারা ইসলামের মাহাত্ম্য নতুন করে উদঘাটন ও উপলব্ধি করেছেন। আঁকড়ে ধরেছেন কঠোরভাবে ইসলামী শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থা।

হঠাৎ করেই বদলে গেছে এমন অনেকে। বদলে যাওয়া এ অভিনেত্রী, গায়িকা আর ব্যালে-নর্তকীদের এমন একটি দল এখন পরিধান করছেন ইসলামী লেবাস এবং সময় অতিবাহিত করছেন নামায পড়ে আর কুরআন তেলাওয়াত করে।

নানদের মত কটিদেশ পর্যন্ত শুভ্র গাত্রাবরণ পরিধান করে নেসরিন বলেন : আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, আমার দিন কাটতো সুখ-শান্তিবিহীন। আজ বলতে গেলে আমার তেমন সময় নেই। কত যে আধ্যাত্মিক জিনিস রয়েছে মনোনিবেশ করবার মতো। আমি আমার মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছি। নেসরিন বলেন, মাস কয়েক আগে ইসলামী পোশাক পরবার যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন, সেটা কোনও খেয়ালিপনা ছিল না। ইসলামী হিজাব সত্যিকারে অতীব প্রয়োজনীয়। লোলুপদৃষ্টির পুরুষদের লালসা-কামনার হাত থেকে রক্ষার জন্য এটা বর্মবিশেষ।

আমি আমার বাকি জীবন শান্তির ধর্ম ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চাই। আল্লাহ পাক আমাকে যেন সে-তৌফিক এনায়েত করেন। আমি যেন ইসলামের সহজ সরল পথে চলতে পারি, এ-জন্য বিশ্বের মুসলিম ভাইবোনদের দুআ কামনা করি। রহমানুর রাহিম আমাকে ক্ষমা করুন। আমিন।

মুসলিম ভাই ও ভগ্নিদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আমার জন্য দুআ করবেন— আমি যেন আমার বাকি জীবন দীন ইসলামের সহজ ও সরল পথে উৎসর্গ করে পরকালে নাজাত লাভ করতে পারি।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ০৭/০৬/১৯৯৩।

ফাতিমা পাসবান

জাপানের মাসায়ূ এখন ফাতেমা নাম ধারণ করেছেন। তাঁর পূর্বনাম মিসেস মাসায়ূ বা মাসুচি। এখনকার নাম ফাতেমা পাসবান। তিনি জাপানের টোকিওর বিদেশ গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও ইরান পরিচিতি বিভাগে পড়ালেখা করেন। তিনি এমন এক সমাজে বড় হন, যেখানে নৈতিকতা, সামাজিক ও চারিত্রিক পরিমন্ডলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচন্ড প্রভাব ছিল। সেখানে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা বলতে কোনও কিছু ছিল না। এ পরিস্থিতিতেই তিনি নিজের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনার সন্ধান লাভ করেন। নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন ধর্ম ও নৈতিক মানদন্ড নিয়ে গবেষণার পর পবিত্র ইসলামকে নাস্তিকতা ও চরিত্রহীনতার অন্ধকূপ থেকে নাজাতের একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে খুঁজে পান। ইসলামকে মনেপ্রাণে বরণ করে নেন এবং কোম নগরীতে আয়াতুল্লাহ গোলপায়গানির কাছে উপস্থিত হয়ে পবিত্র ইসলামগ্রহণ ও 'ফাতিমা' নাম ধারণ করেন।

এখানে তাঁর একটি সাক্ষাতকার পেশ করা হলো, যেটি জাপানে তাঁর স্বামী মুহাম্মদ পাসবানের দফতরে (টোকিও থেকে প্রকামিত পার্স ম্যাগাজিনের দফতরে) গ্রহণ করা হয়। ফাতিমা পাসবান বলেন :

যখন হাইস্কুলে লেখাপড়া করতাম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি তীব্র আগ্রহ পোষণ করতাম। এসব দেশ সম্পর্কে যেসব ছবি দেখতাম, তাতে আমার আগ্রহের মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর মধ্যে বিশেষ স্থাপত্যশিল্প ও মনোমুগ্ধকর অলংকরণে তৈরি মসজিদগুলোর ছবিই আমাকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে। ফলে ক্রমান্বয়ে ধর্ম ও মাজহাব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা দূর করবার জন্য আমার মন প্রস্তুত করে নিলাম। এসব স্থাপত্য-নিদর্শন প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের বস্তু ছিল— যার সঙ্গে একদিন বাস্তবের সাক্ষাত পাই।

হাইস্কুল জীবনের শেষভাগে আমার এক শিক্ষক আমার কাঙ্ক্ষিত পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। এ-পর্যায়ে তিনি পারস্য সাহিত্যের প্রতি ইংগিত করেন। তিনি বলেন, ভাষা ও বিদেশ-গবেষণা অনুষদে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজি বিষয়ই গ্রহণ করে। তদস্থলে তোমার ব্যক্তিগত আগ্রহ যদি থাকে, তাহলে ফার্সি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করো এবং এরই সূত্র ধরে তোমার গবেষণাকার্য চালিয়ে যাও। তাঁর এ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা একদিকে আমাকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের মাথাব্যাথা থেকে মুক্তি দেয়, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে যে অনুসন্ধিৎসা মনের মধ্যে লালন করছিলাম, সে-ব্যাপারেও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে সক্ষম হই। হাইস্কুলের পড়া শেষ করবার পর আমার বাবা জাপানের যেকোনও একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দেন। কারণ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা।

আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। স্কুলজীবন থেকে আমার লালিত স্বপ্ন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষায় অংশ নিয়ে টোকিওর বিদেশ-গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও ইরান পরিচিতি বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ পেলাম। সেইসূত্রে ফার্সি সাহিত্যে লেখাপড়া শুরু করলাম। অধ্যয়নকালে আমি নির্ধারিত সময়ের আগেই ফার্সি ভাষায় কথোপকথন আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলাম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষদিকে একজন ইরানির সঙ্গে আমার এক শিক্ষকের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চলছিল। তাঁরা অধিকাংশ সময় একসঙ্গেই কাটাতেন। আমিও আমার শিক্ষকের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। এ পরিচিতির ফলে পরস্পরের মধ্যে চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় ঘটে। তিনি আলাপচারিতায় মানবজীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলেন। বিষয়টি অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারটি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। কারণ আমরা অর্থাৎ জাপানিরা ধর্ম সম্পর্কে বিশেষত ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবগত নই। নিয়মিত যোগাযোগ ও কথাবার্তা বিশেষত তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া ইসলাম সম্পর্কিত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে এসব বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহ আরও অনেক বেড়ে যায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সেসবের লক্ষ্যসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

দীর্ঘদিন গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনিত হই যে, পবিত্র ইসলামই হচ্ছে সর্বশেষ ধর্ম ও মানবতার মুক্তির জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা।

যখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি সাহিত্যে লেখাপড়া শুরু করেছি, দিনের পর দিন আমি লেখাপড়ার প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়েছি। যেসব ইরানি শিক্ষক ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন তারা আমাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছেন যাতে ফার্সি ভাষা ভালোভাবে শিখতে পারি। ফার্সি ভাষা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে শেখার পর আমার একান্ত আগ্রহ ছিল ইরান সম্পর্কে যা কিছু পড়েছি বা শিক্ষকের মুখ থেকে শুনেছি তা স্বচক্ষে দেখতে সুযোগ নেবার। পড়াশোনা শেষ করবার পর যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ দু'বছর আমাকে সাহায্য করেছেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমাকে সদুপদেশ দিয়েছেন, পারস্পরিক সমঝোতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা দু'জন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো।

এরপর ইরান আসি এবং ধর্মীয় নগরী কোমের অন্যতম ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল ওজমা গোলপায়গানির খিদমতে উপস্থিত হয়ে পবিত্র ইসলামগ্রহণ করি। তখন থেকে আমি ফাতিমা নাম ধারণ করেছি এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

তেহরানে আমার বাসস্থান ছিল শহরের মধ্যবর্তী স্থানে। খুব সহজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ ছিল। তাতে ইরানের মুসলিম জনগণকে ভালোভাবে চেনার সুযোগ ঘটে। "শোনীদাম কেই বূয়াদ মানান্দে দীদান"— শোনা কিভাবে দেখবার সমান হতে পারে? আসলে আপনাদের সংস্কৃতির এ প্রবাদটি খুব চমৎকার। ইরানে থেকে ইরানি জনগণকে আমার শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে চিনতে পেরেছি। ইরানে না আসা পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল ইরানি বলতে অধিকাংশ হচ্ছে টেলিফোনের জালকার্ড বিক্রেতা এবং বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত লোক— যাদের নমুনা আমি জাপানে দেখতাম। বিশেষত ইরানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের অপপ্রচার খুবই বিষাক্ত ছিল। কিন্তু ইরানে আসবার পর যে ভিন্নধর্মী বাস্তবতার মুখোমুখি হই, যা আমাদের দেখিয়েছে শুধু তা নয়। আমি আরও দেখেছি যে, কিছু লোক যারা জাপানে ইরানি পরিচয়ে নানা বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত, ইরানের ভেতরে তাদের কোনও স্থান নেই। এরা ইরানে প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দিত।

ইরান ও জাপানের সংস্কৃতির মাঝে যে ভিন্ন যোগসূত্র রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের সম্মানবোধ এবং পারিবারিক ব্যবস্থার সুরক্ষা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকের দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের বিশেষত আমেরিকার ব্যাপক প্রচারণা এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে অপসংস্কৃতির হামলা হচ্ছে, তাতে জাপানিরা বিশেষ করে যুবসমাজ প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। জাপানের জনসাধারণের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এ সত্যটি উপলব্ধি করা যাবে। ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়াতে আমাকে আমার পিতা ভালো চোখে দেখেননি। কিন্তু জাপানের লোকদের আচরণ যেহেতু এমন পর্যায়ের যে, কেউ কারুর ব্যাপার নিয়ে হস্তক্ষেপ করে না, প্রত্যেকে নিজের মত পথ বাছাই করবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেজন্য ইসলামগ্রহণের বেলায় আমিও তেমন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হইনি। পারিবারিক ও সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারেও সমস্যা নেই। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তসমূহ পারস্পরিক সম্মতি, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার মধ্যেই সম্পাদিত হয়। কোনও ব্যাপারে যদি আমার স্বামীর অভিজ্ঞতা আমার চাইতে বেশি হয়, তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত করি। ছেলের নামকরণের ব্যাপারে শাশুড়ির মতামতের ভিত্তিতেই কাজ করেছি। তিনিই তার নাম ঠিক করেছেন।

ইরানে আসবার পর ইরানি খাবার এবং এখানকার নিয়মনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা সমস্যা মনে হয়েছিল। পরবর্তীতে সময়ের ব্যবধানে এর সঙ্গে খাপখাইয়ে গেছি। আমার স্বামী বাল্যবস্থায় তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মা বেঁচে ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গেই তিনি বসবাস করতেন। তিনি কয়েকটি শব্দ ছাড়া ফার্সি ভাষা জানতেন না। এজন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলবার এবং কথাবার্তা বোঝার জন্য কিছুটা আজারবাইজানি তুর্কিভাষা শিখতে হয়েছিল। তিনি এক বছরের কিছু বেশি সময় আমার সঙ্গে বসবাস করেন। এরপর ইন্তেকাল করেন। ইরানে আসবার পর মেহমান আসলে প্রথম প্রথম বেশ গলদঘর্ম হয়ে যেতাম। কারণ ইরানের আতিথেয়তার নিয়ম-নীতি বর্তমান জাপানের আতিথেয়তার নিয়ম-নীতির চাইতে ভিন্নতর। তবে পরে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অধিকাংশ সময় দুপুরে বা রাতে খাবারের সময় মেহমান থাকতো। আমি নিজেই খাবার রান্না করতাম। আমি প্রায় আড়াই বছর ইরানে বসবাস করেছি। জীবনে অনেক কিছু শিখেছি। ইরানিরা খুবই অতিথিপরায়ণ, বিশেষ করে

জাপানিদের ভালোবাসে। ইরানের এসব ভালো দিক ছাড়াও যে জিনিসটি কখনও ভুলবার নয়, তা হচ্ছে হযরত ইমাম খোমেনি (রহ)-এর মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। কারণ তিনি মানবসমাজের এক মহান ব্যক্তিত্ব। যদিও ইরানে অবস্থানকালে ইরানের বই বা লেখা পড়ে তাঁকে চিনতে পারিনি; তথাপি তাঁর একটি বই জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছি, অবশ্য এখনও মুদ্রিত হয়নি। বর্তমানে টোকিওতে ইরানির দূতাবাসের কনস্যুলেট সেকশনে কর্মরত রয়েছি। আমার স্বামী মুহাম্মদ পাসবানসহ ইরান সফরকারির জাপানি টুরিস্টদের জন্য জাপানি ভাষায় একটি গাইডবই লেখার কাজে ব্যস্ত আছি। পাশাপাশি আমার ৩ বছর বয়স্ক ছেলেটিকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এখন যেহেতু মুসলমান হয়েছি, ধর্মীয় বিধি-বিধান ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পালন করে থাকি। অন্যদের একাজে উৎসাহিত করাটাও দায়িত্ব বলে মনে করি। অবশ্য কাজটি তেমন সহজ নয়। কারণ জাপানিদের জীবনের শুরু থেকেই ধর্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

আশা করি, আল্লাহ্ পাক আমাকে এ-কাজে সাহায্য করবেন, তওফিকও দেবেন। আমি তাঁর কাছে পবিত্র ইসলাম ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার এবং ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত লোকদের কাছে এ দীনের সৌন্দর্য পৌঁছে দেবার তৌওফিক কামনা করছি।

পরিশেষে আমাকে এ সাক্ষাতকারের সুযোগ করে দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।*

* বাংলাদেশস্থ ইরানি দূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'নিউজ লেটার' ৬/৬/১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬ সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন হোসাইন মুসলেমি।

মুহাম্মদ আমান হবম

মুহাম্মদ আমান হবম (Muhammad Aman Hobohm) একজন জার্মান কূটনীতিক, সমাজকর্মী ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি কেন ইসলামগ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য-জগতের অনেক সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে ইসলামগ্রহণের প্রবণতা কেন অধিক দেখা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন :

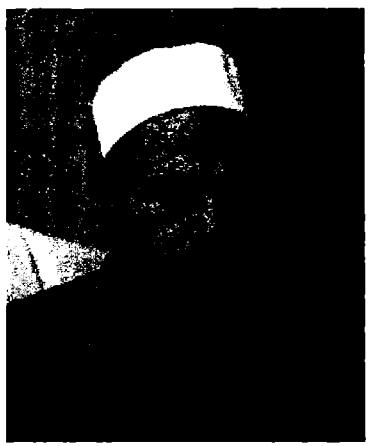

আমান হবম

এর অনেক কারণ রয়েছে; তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ— সত্য চিরকালই নিজস্ব শক্তিসম্পন্ন। ইসলামের মূল নীতিসমূহ এমন যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবতাভিত্তিক ও হৃদয়গ্রাহী যে, সত্যসন্ধানী মন ইসলামের প্রতি অভিভূত না হয়ে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ইসলামের মূলনীতি। প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ-বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে। এটা সর্বোত্তম ধারণা, যা মানুষকে কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান মর্যাদাসম্পন্ন। এক আল্লাহ সবার স্রষ্টা, প্রভু ও পালনকর্তা, আর সকল মানুষ তাঁর দাস। এখানে নেই কোনও ভেদাভেদ, নেই কোনও পার্থক্য। জার্মানদের ধারণা: স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসই সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস। এতে রয়েছে সাহস, নিরাপত্তা ও ভীতিহীনতা। দৃঢ় বিশ্বাসী বা ঈমানদার ব্যক্তি যেকোনও ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারেন।

অতঃপর ধরা যাক, মৃত্যুর কথা। ইসলামে বলা হয়, প্রাণবন্ত সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর পর শুরু হবে পরকালীন অনন্ত জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। কেউ চিরকাল পৃথিবীতে থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে

সকল শক্তি, সামর্থ ও সাধনা দ্বারা উত্তম পরকালীন জীবন গড়ে তুলতে হবে। পরকালের বিচারের চিন্তা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহর বিচার থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। একথা স্মরণ রাখলে মানুষের অন্তর অন্যায় করতে সায় দিতে পারে না। দুনিয়ার আইন অমান্য করবার জন্য পুলিশ বা বিচারকের প্রদত্ত শাস্তি অপেক্ষা পরকালের শাস্তি অনেক কঠিন ও ভয়াবহ। পরকালে ভালো কাজের পুরস্কার রয়েছে— অনন্ত সুখের স্থান বেহেস্ত। তেমনি অন্যায়কারীদের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে দোজখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে।

বিধর্মীদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করবার আর একটি গুণ সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য। ইসলামের দৈনন্দিন প্রার্থনার নিয়ম— দৈনিক পাঁচবার নামায নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় এবং প্রতিবছর একমাস রোযা আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয়। নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মসংযম এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা মানুষকে সৎ ও মহৎ করে তোলে।

ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে : ইসলাম একটি আদর্শ মতবাদ বা জীবনব্যবস্থা। কোনও প্রকার বাহ্যিক চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মানুষের অন্তরে নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রগাঢ় করে। মুসলমান বিশ্বাস করে যে, সে যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তাকে দেখছেন। এ বিশ্বাস তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সে স্বভাবতই সৎপথে বা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। ইসলাম মানুষের হৃদয়ে শান্তি দান করে, পাশ্চাত্য সমাজে যার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয।

আমান হবম বলেন, আমি বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি এবং অনেক মতবাদ পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, একমাত্র ইসলামই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও নাতসিজমের প্রতিও কিছু কিছু লোকের আকর্ষণ দেখা যায়; কিন্তু ইসলামের মত সততাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান কোথাও দেখা যায় না। এজন্য জ্ঞানবান ও সৎ ব্যক্তিরা ইসলামগ্রহণ করেন।

ইসলাম কেবল তত্ত্বীয় বিশ্বাস নয়, এর ব্যবহারিক প্রয়োগই আসল। ইসলাম শুধু গতানুগতিক কতিপয় কাজ নয়; আল্লাহর বিধিবিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।*

---

* Islam : Our Choice; পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

ডা. রেবেকা ওয়েড

ডা. রেবেকা ওয়েড অস্ট্রেলিয়ার এক খৃস্টান ধর্মগুরুর মেয়ে। পাদরি পিতার সঙ্গে উপশহরের বাড়িতে থাকতেন। আশৈশব সেখানেই লালিতপালিত হয়েছেন খৃস্টান পরিবেশে। পশ্চিমা জীবনাচারের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে নানা রকম পার্টি, নাইট ক্লাব ছিল তাঁর অবাধ বিচরণক্ষেত্র। হল্লা করে সুরাপান করেছেন। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রী যখন ছিলেন, তখন সবরকম পশ্চিমা সামাজিক কর্মকাণ্ডেই অংশ নিতেন তিনি। এভাবেই গতানুগতিক জীবনের পথে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিলেন ডা. রেবেকা। তবে এ সময়ই তাঁর অন্তর্জগতে সূচিত হচ্ছিল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। গতানুগতিক চিন্তা ছাপিয়ে তাঁর অন্তরলোকে বেজে উঠেছে তখন নতুন এক সুর। সে-সুরের সম্মোহনী শক্তি তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে এক আলোকিত গন্তব্যের পানে। ক্রমশ আঁধারের যবনিকা উন্মোচিত হচ্ছিল; সত্য ও কল্যাণের স্নিগ্ধ আলোয় হেসে উঠছিল তাঁর অন্তরলোক। "ইসলামগ্রহণের পূর্বে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় পাঁচ বছর। এটা হঠাৎ আলোয় ঝলকানির কোনও ঘটনা ছিল না"— জানিয়েছেন ডা. রেবেকা। বর্তমানে তিনি ডা. রাজিয়া আলী।

সত্যের তৃষ্ণা জেগেছিল তাঁর মনে। পূর্ব-পুরুষের ধর্মবিশ্বাস সে-তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছিল না। ডা. রোবেকার ভাষায় : "এটা এসেছিল আমার নিজের সত্যানুসন্ধান এবং খৃস্টানধর্মের মর্ম উপলব্ধি থেকে।"

পাদরিকন্যা হিসেবে ডা. রেবেকা প্রথমত খৃস্টানধর্মের মধ্যে থেকেই তাঁর অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি অন্বেষণে তৎপর হন। সকল খৃস্টান দল-উপদলের মধ্যেই তিনি খুঁজতে থাকেন তাঁর আত্মার তৃপ্তি। কিন্তু বার বার তাঁকে নিরাশ হতে হয়। বিশেষ করে দু'টি সমস্যা তাঁকে বেশি চিন্তিত করে তোলে। তাঁর নিজের ভাষায়, "খৃস্টানধর্ম নিয়ে আমার দু'টি প্রধান সমস্যা ছিল ত্রিত্ববাদ আর অপরটি আমি লক্ষ্য করেছিলাম, দৈনন্দিন জীবন কিভাবে যাপন করা হবে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব।"

"স্রষ্টা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ছিল এরকম যে, তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং পরম সত্তা। আমি উপলব্ধি করতাম যে, মানুষের ওপর স্রষ্টাত্ব আরোপ হলো স্রষ্টা থেকে বিচ্যুতি।"

তাঁর চিন্তা-চেতনার এ স্বচ্ছতা এবং স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি তাঁকে সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্পর্শে আসেন, তখন ইসলাম সম্পর্কে জানবার সুযোগ পান তিনি। ফলে ইসলাম সম্পর্কে খৃস্টানজগতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত খারাপ ধারণার অসারতা বুঝতে পারেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, ইতোপূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ইসলামী জীবনাচারের অনেক কিছুই তিনি বোঝা স্বরূপ মনে করতেন— যেগুলো থেকে পরবর্তীতে তিনি দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।

"আমি ভাবতাম যে, দিনের মধ্যে পাঁচবার প্রার্থনা করা একটি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবজীবনে এটাকে আমি সার্বক্ষণিক প্রয়োজন হিসেবে পেয়েছি— এটা হলো ৫ মিনিটের জন্য। দৈনন্দিন কার্যাবলীর তুলনায় জীবন বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটারই অন্বেষণ করি"— জানিয়েছেন তিনি।

"ওড়না পরা, হাতের কবজি থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করাটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল। লোকে এটাকে প্রতিবন্ধকতা ভাবতে পারে। এটাতে অভ্যস্ত হতে দু'বছর লেগেছে; কিন্তু ইসলাম প্রায় সব ব্যাপারেই উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেয় আর এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার কৃত প্রত্যেকটি কাজ— আমার খাবার ধরণ, কথাবলা, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন— সবই আমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।"

ডা. রাজিয়া আলী বলেন যে, নারীদের খৎনা এবং গাড়ি চালাবায় নিষেধাজ্ঞা হলো আঞ্চলিক-প্রথা এবং ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইসলামে নারীদের যে অবস্থান সে-সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ধারণা রাখেন। তিনি বলেন "ইসলাম নারীকে অনেক কদর করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদের পুরুষের সমান জ্ঞান করে। এখন আমি নিজেকে মুক্ত নারী ভাবি।"

হিদায়াত পরম করুণাময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। এটা দিয়ে তিনি তাদেরই ধন্য করেন, যারা এজন্য আগ্রহী হয়। যাদের হৃদয়ে থাকে সত্যকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা; সত্য একদিন ঠিকই তাদের নাগালে এসে যায়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার দিকে যাবার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন, যে তার দিকে মনোনিবেশ করে।*

---

* দৈনিক সংগ্রাম, ২৪/০৭/২০০০ ইং।

আমিনা

জেদ্দার একটি স্থানে প্রতি সপ্তাহে কুরআনক্লাস হয়ে থাকে। ইংরেজিতে পারদর্শী আরবরা ক্লাস নিয়ে থাকেন। তাঁরা প্রথমে কুরআনের কিছু আয়াত তরজমা সহকারে তেলাওয়াত করেন। তারপর তেলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের তাফসির করে থাকেন। তাফসির প্রদানকালে তাঁরা ইবনে কাসিরসহ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের দেয়া ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়ে থাকেন।

জেদ্দায় অবস্থানকালে আমি নিয়মিত ওই কুরআনক্লাসে অংশগ্রহণ করতাম এবং মনদিয়ে তাঁদের কথা শোনার চেষ্টা করতাম। একদিন আমি ক্লাসে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম— একজন মার্কিন মহিলা ক্লাস নিতে এসেছেন। আমার তখন মনে হলো, হয়তোবা ঐ মহিলা আরববংশোদ্ভূত হবেন এবং তাঁর বাসায় আরবি ও ইংরেজি উভয়েরই চর্চা রয়েছে। তবে ঐ মহিলার যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করে তাহলো ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি কোনওরকম জড়তা ছাড়াই সবার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন।

ক্লাসশেষে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আমার অবশ্য তখন একটু ভয় ভয় লাগছিল এ কারণে যে, ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা মহিলার এত জানাশোনা, তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ শুরু করবো কিভাবে?

যাই হোক, আলাপ যখন শুরু হয়ে গেল, তখন আমি জানতে পারলাম ভদ্র-মহিলা আরব বংশোদ্ভূত নন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আরবি শিখেছেন যাতে করে সরাসরি আল্লাহর কালাম পড়তে এবং বুঝতে পারেন। সাধারণত ইসলাম কবুল করবার পরই নওমুসলিমরা আরবি শিখে থাকেন, কিন্তু আমিনা ঠিক তাঁর উল্টো। তিনি ইসলাম কবুল করবার অনেক আগেই আরবি শেখেন।

আমিনার পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ এবং তিনি সবসময়ই সবকিছু যৌক্তিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতেন। আমিনার চিন্তা-চেতনার ওপর তাই পিতার প্রভাব ছিল বেশি। তিনি তাঁকে নিয়ে

মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরিতেও যেতেন। অন্যদিকে তাঁর মা ছিলেন একজন ধর্মানুরাগী মহিলা। তিনি নিয়মিত চার্চে যেতেন এবং আমিনাকেও চার্চে যেতে উৎসাহিত করতেন।

পিতার প্রভাব ও মায়ের ধর্মানুরাগের কারণে আমিনা অল্প বয়সেই বেশ চিন্তাশীল হয়ে ওঠেন। চার্চে গিয়ে তিনি পাদরিদের কাছে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতেন।

এভাবে কিছুদিন চলবার পর আমিনা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন এবং চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এ সময় তাঁর মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আমিনার মা কোনওরকম প্রশ্ন ছাড়াই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। আর তাঁর পিতা কোনওরকম বিশ্বাস ছাড়াই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেন। ফলে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমিনার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল।

আমিনার এখনকার চেহারা দেখলে অবশ্য একটা চিন্তাই করা যায় না যে, এক সময়ে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ে ভুগতেন অথবা তিনি অমুসলিম ছিলেন। কারণ এখন তাঁর চেহারায় রয়েছে এমন এক শান্ত, সৌম্য ও পবিত্র ভাব যে, দেখলে আপনা থেকেই শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। এরূপ বিনয়ী মহিলা আমি এর আগে দেখিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করবার পর আমিনার সঙ্গে একজন আরবের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরপরই তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিরিয়ায় চলে যান। সিরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সে-সময় তিনি আশেপাশে যাকেই পেতেন, তাঁকেই আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। এ-জন্য অবশ্য তাঁকে স্বামীর বকাঝকাও শুনতে হয়েছে।

তিনি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, তখন জানতেন যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। একই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য একেকটি ধর্ম হচ্ছে একেকটি পথ। যে যার পছন্দমত ধর্ম পালন করতে পারেন, তাতে কোনও বাধা নেই। আর ধর্ম যে পালন করতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতাও মানুষের ওপর নেই।

এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানবার জন্য ইংরেজি বইপত্র পড়া শুরু করেন। কিন্তু দেখতে পান যে, ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজিতে তেমন ভালো বইপত্র নেই। তখন তিনি সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন যে, ইসলাম ভালোভাবে বুঝতে হলে তাঁকে আরবি শিখতে হবে।

আরবি শেখার জন্য তিনবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর আমিনা ডিকসনারি ও তাফসির গ্রন্থের সাহায্যে কুরআন শরিফ পড়া শুরু করেন। কুরআন শরিফ পড়া শুরু করবার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি এক স্বর্গীয় জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছেন।

ধীরে ধীরে তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন যে, সত্যই তিনি যদি অস্তিত্বশীল হন, তাহলে তিনি যেন তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

অব্যাহত কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে এক সময় তাঁর কাছে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো আসমানি কিতাব। আর আল্লাহ্ শুধু যে আছেন তাই নয় মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন যে, তিনি যেন তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামগ্রহণ করা স্বাভাবিক হলেও আমিনার ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমিনা ওয়াকিফহাল ছিলেন বলে ইসলামগ্রহণে কিছুটা দ্বিধা করছিলেন। তাঁর মনে এ ভয় কাজ করছিল যে, ইসলামগ্রহণ করবার পর তিনি হয়তো ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতে পারবেন না। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতাঁর প্রশিক্ষণ তাঁর নেই।

ইসলামী বিধান অনুসারে জীবনযাপন অনুশীলনের জন্য তিনি নিয়মিত নামায আদায়, রোযা রাখা এবং যাকাত দেয়া শুরু করেন। এভাবে কিছুদিন চলবার পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইসলামগ্রহণ না করে এসব আচারঅনুষ্ঠান পালনের কোনও অর্থই হয় না। কারণ কুরআন শরিফে এটা স্পষ্ট বলা আছে যে, ইসলাম হচ্ছে তাঁর মনোনীত দীন। যারা ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম পালন করবে তারা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

আমিনা জানান, তিনি যখন ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন তাঁকে বলা হয়, ইসলামগ্রহণের আগে তাঁকে একজন পাদরির সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। আলোচনায় তিনি যদি পাদরিকে পরাজিত করতে পারেন, তাহলে তিনি ইসলামগ্রহণ করতে পারবেন।

পাদরির সঙ্গে আলোচনায় বসবার আগে তিনি দু'দিন এক নাগাড়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং পাদরির সাম্ভাব্য প্রশ্নসমূহের উত্তর কুরআনের আলোকে ঠিক করে নেন। তিনি জানতেন যে, ধর্মীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ছাড়াও পাদরি

তাঁকে বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাতে কসুর করবেন না।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁর স্বামী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও পরিচিতদের সামনে পাদরির সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং পাদরির প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন।

ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করবার দীর্ঘ ১২ বছর পর অবশেষে প্রকাশ্যে কালেমা উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন।

ইসলামগ্রহণ করবার পর হঠাৎ করে তাঁর সামনে জ্ঞানের সকল দরজা খুলে যায় এবং তাঁর ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর ঈমানের বলে বলিয়ান আমিনা তাঁর জীবনধারা পুরো পাল্টে ফেলেন। জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আমিনা এ পরিবর্তনকে আল্লাহর নিয়ামত বলেই গণ্য করেন। সেই থেকে আমিনা ইসলাম সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করেন।

সে সময় আরবিতে লিখিত তাঁর বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় এটির ইংরেজি সংস্করণ বের করবার জন্য আমিনার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

আমিনা 'দার আল-কিবলাহ'য় শিক্ষকতা বেছে নেন। 'দায় আল-কিবলা' হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে মুসলমান হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এ-ছাড়া আমিনা হাফেজিয়া মাদরাসার ছাত্রদের তাজবিদ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার কাজও করে থাকেন।

ইসলাম সম্পর্কে জানবার ব্যাপারে আমিনার আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমেনি। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁর জ্ঞান আহরণের সাধনা অব্যাহত থাকে।*

---

* ওয়ালিউল হক ও মিসেস এন, হাশিম : দৈনিক সংগ্রাম, ১/৮/১৯৯২।

হেরিতকোর ফাতিমা

বিশ্বের সর্বাধিক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহার থেকে ডিগ্রি লাভ ও তার চত্বরেই ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য এ দু'টি বিষয় আজ আমার জীবনে সম্মানের বড় প্রতীক।

ক্ষুদ্র একজন মহিলার জন্য ইসলামের মত সুন্দর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারাই বড় পাওয়া। ইসলামগ্রহণের কথা আমি সবমহলে, অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করে থাকি।

এভাবে নওমুসলিম ফাতিমা ওরফে হেরিতকোর আল-আজহার চত্বরে ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা দেবার পর তাঁর আলোচনা শুরু করেন।

ফাতিমা ইসলামগ্রহণের কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বলেন, আমার স্বামী মুহাম্মদ আল-ওকাদ থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সানন্দে ইসলামগ্রহণ করি। ইসলাম আমাকে এমন একটি সুশৃংখল জীবনের সন্ধান দিয়েছে, যেখানে নেই কোনও ভ্রান্তি ও প্রবঞ্চণার অবকাশ। পাশাপাশি আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, ইসলামের শিক্ষা জীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত।

ইসলামগ্রহণের পর আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে— যা আমি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করছি। বড় আনন্দদায়ক বিষয় হলো আমার জীবন-সঙ্গী একজন মুসলমান।

ফাতিমা বলেন, আমার স্বামীর সঙ্গে আর্মস্টারডামে সাক্ষাত হয়। সেখানে আমরা উভয়েই পরবর্তী সাক্ষাত কায়রোতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

কায়রোতে সাক্ষাতকালীন সময়ে আমার স্বামী মুহাম্মদ ওকাদ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। তার আলোচনার পর আমি আল-আজহার প্রাঙ্গণে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার পিতার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি মত দিলেন। এরপর আমি ইসলামের ঐশ্বর্যে অবগাহন করলাম।

ফাতিমা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, এটা সবারই জানা যে, ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা আত্মাকে দেয় শান্তি, অন্তর রাখে সুস্থির এবং সমাজকে দেয় নিরাপদ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা।

ফাতিমার স্বামী মুহাম্মদ আল-ওকাদ বলেন, তাঁর স্ত্রী ইসলামগ্রহণ করায় সে খুব ভাগ্যবান।

ইসলামের পরশে তাঁদের জীবন যেন ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে, সেজন্য তাঁরা উভয়েই দুআ চান এবং ইটালিতে যে সমস্ত নওমুসলিম পরিবার রয়েছে, তাদের জীবনও যেন ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

ফাতিমা নিজে ইটালিয়ান। তাঁদের পাঁচ সন্তান। সপরিবার তাঁরা ইটালিতে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন।*

* সিদ্দীক আহমদ, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ঢাকা, ২য় বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

ডা. আলী সেলমাঁ বেঁয়োস্ত

আলী সেলমাঁ ফ্রান্সের এক খৃস্টান (ক্যাথলিক) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেডিসিনে ডক্টরেট এবং একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে গির্জার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এর প্রধান কারণ ছিল : যাজকতন্ত্র, ভোগ-লালসা ও শারীরিক অপবিত্রতা। তাঁর ইসলামগ্রহণের মূলে ছিল 'আল-কুরআন'। ইসলামগ্রহণের পূর্বে তিনি পাশ্চাত্যের ভাবধারায় কুরআনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিমগ্ন হন। জনৈক মুসলমান জনাব মালিক বিন-নবি তাঁকে ইসলামের বিষয় সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করেন। শেষপর্যন্ত তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন :

ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশের মূল ভিত্তি হলো 'আল-কুরআন'। মুসলমান হবার পূর্বে একজন পশ্চিমা সমালোচক বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি কুরআন পড়তে শুরু করি। এজন্য আমি মালিক বিন নবির চমৎকার লেখা 'লি ফেনমেনা কুরআনিক (Le phenamena Coranique) নামক গ্রন্থটির কাছে বহুলাংশে ঋণী। উক্ত গ্রন্থটিই 'আল-কুরআন'কে ঐশী গ্রন্থরূপে স্বীকার করতে বাধ্য করে। গ্রন্থটিতে এমন অনেকগুলো বাক্য রয়েছে, যা তের শত বছর পূর্বে কুরআনে নাযিল হয়েছে; অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে-সমস্ত অজানা তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সে-সব তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে, তা পড়ে আশ্চর্য হই। আল-কুরআনকে সত্য আল্লাহর কিতাব বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কালেমা তৈয়ব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে ইসলামগ্রহণ করি।

অতঃপর ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের মসজিদে মুফ্‌তি সাহেবের হাতে ইসলাম কবুল করে আমার ইসলামী নাম আলী সেলমাঁ রেজিস্ট্রিভুক্ত করি।

আমার খৃস্টানধর্ম ত্যাগ করবার আরেকটি কারণ হলো— শারীরিক পবিত্রতা সম্বন্ধে তাদের কোনও ধ্যানধারণা নেই।

তাছাড়া ত্রিত্ববাদ ও যিশুখৃস্টের ঈশ্বরত্বে আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলাম। ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমা তৈয়বা ও আল-কুরআনের 'সূরা এখলাস' আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।*

---

* Islam : Our Choice; পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬।

প্রফেসর আসমা আন সুফিয়ান

সুইস প্রফেসর আন সুফিয়ান কিছুদিন আগে কায়রো সফরে এসেছিলেন। তিনি নরওয়ের বংশোদ্ভূত এবং ইস্কান্ডানাভিয়া অঞ্চলের বৃহত্তম দক্ষিণ সুইডেনের Lund বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর। পনের বছর পূর্বে তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বর্তমান নাম আসমা। তিনি নরওয়ের প্রথম দিককার মুসলিম মহিলাদের অন্যতম। ইসলামগ্রহণের তিন বছর পর মূলতাযিম নামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে বিয়ে করেন। বর্তমানে তিনি তিন সন্তানের জননী। বর্ণবাদ প্রতিরোধ কমিটি, সুইডেনের তিনি একজন সদস্য। এছাড়াও তিনি সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডসহ পাঁচটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত ইস্কান্ডানাভিয়া অঞ্চলের সম্মিলিত নারী সংগঠনের সভানেত্রী। সাপ্তাহিক 'দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড'-এর পক্ষ থেকে নিচের সাক্ষাতকারটি তাঁর কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : কখন এবং কীভাবে আপনি ইসলামগ্রহণ করেন?

উত্তর : আমি যখন আমার দেশ নরওয়েতে ধর্মীয় ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়ন করি, তখন হাসানুল বান্না ও সাইয়্যেদ কুতুবের কিছু ইংরেজি বই পড়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, বিশেষ করে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ, তখন আমি রাজনীতিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতাম। আর তখন থেকেই বেশি বেশি ইসলামী বই পড়তে শুরু করি এবং মুসলমানদের সঙ্গে এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমাদের কাছের এক মসজিদের পাকিস্তানি ইমামসাহেবের কাছে যাই এবং তাঁর সঙ্গেও এ ব্যাপারে পরামর্শ ও আলোচনা করি। এর তিন বছর পর মুলতাযিম নামের ফিলিস্তিনি যুবককে বিয়ে করি। "জর্দান ও মালয়েশিয়ায় ইসলামিক আন্দোলনের লালন ও এর রাজনৈতিক রূপ" শিরোনামে ডক্টরেট থিসিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করি। ডক্টরেট লাভের পর আমি সুইডেন ও ইস্কান্ডানাভিয়া অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হই। বর্তমান যুগে ইসলামিক ধারণা সম্পর্কিত বেশ কিছু বই আমি রচনা করেছি। তবে দুঃখজনক

ব্যাপার হলো, আমার পিতামাতা এখনও ইসলামগ্রহণ করেননি। কিন্তু তবু আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

প্রশ্ন : কত সালে 'ইসলামিক মহিলা ঐক্য ফোরাম' প্রতিষ্ঠা করা হয়? এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : 'মুসলিম মহিলা উচ্চতর ঐক্য পরিষদ' কর্তৃক সুদানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৯৯৬ ঈসায়ী সালে যখন আমাকে দাওয়াত করা হয়, যার সহসভানেত্রী মনোনীত হয়েছিলেন ড. সাদ আল-ফাতেহ, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের এখানে ইসলামিক মহিলা সংস্থাসমূহের ঐক্য হতে পারবে না কেন? অথচ আমাদের অঞ্চলের প্রত্যেকটি শহরে একাধিক সংস্থা রয়েছে। তাই ঐক্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে একটি সম্মেলন আহবান করি। আমাকে ঐক্য পরিষদের সভানেত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর ছোট ছোট বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন থেকে ভিন্নতর তিনটি লক্ষ্য আমরা স্থির করি।

(১) ইস্কান্ডানাভিয়া অঞ্চলের রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনা পর্যালোচনা করি, তাদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয় এবং আমরা কি চাই বা আমাদের কি চিন্তা ও তৎপরতা, অন্যদিকে আমাদের ব্যাপারে তাদেরও ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি কি, তা জানা যায়। আর সেই আলোকেই যেন আমরা সমাজে মিশে যেতে পারি এবং বাধাহীনভাবে কাজ করতে পারি।

(২) প্রচার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিন ও রেডিও-টিভির মাধ্যমে ইসলামের যে বিরোধিতা করা হয় এর উপযুক্ত প্রতিউত্তর দিয়ে ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে ও আকর্ষণীয়রূপে প্রচার করা হয়— যাতে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের কারণে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণার অবসান ঘটে।

(৩) কুরআন-হাদিসের আইন প্রতিষ্ঠা করা। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমরা মুসলমানদের মাঝে অনেক পার্থক্য ও মতভেদ লক্ষ্য করছি। যেমন রাজনীতি নিয়ে, তেমনি ধর্ম নিয়ে। ফলে প্রত্যেক আরব ও মুসলিম দেশের ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন রাজনীতি। আর এটাই শত্রুদের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিয়েছে ইসলামের প্রতি অপবাদ দেয়াসহ যাবতীয় বিরোধিতার।

প্রশ্ন : ইস্কান্দানাভিয়া অঞ্চলের মুসলমানদের প্রধান সমস্যা কি?

উত্তর : আমাদের এখানে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অজ্ঞতা। বৃটেনে দেখুন, সেখানে অধিকাংশ মুসলমান হয়ত অধ্যয়নের জন্য অথবা গবেষণার জন্য কিংবা উচ্চতর ডিগ্রির জন্য এসে থাকে। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইসলামিক জ্ঞান তাদের থাকে— যার প্রভাব তাদের চালচলনে, আচার-ব্যবহারে ও কালচার-কৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়; যা অন্য মুসলমানদের জন্য মডেল বা অনুসরণযোগ্য। পক্ষান্তরে, সুইডেনসহ ইস্কান্ডানাভিয়া অঞ্চলের দেশগুলোতে

মুসলমানরা কেবল চাকরি অথবা পর্যটনের জন্যই আসে। ফলে এর প্রভাব তাদের চালচলনে পরিলক্ষিত হয়, যা থেকে শিক্ষার বা গ্রহণ করবার কিছু নেই। তাছাড়া সুইসসমাজ থেকেও মুসলমানদের জন্য প্রতিকূলতা বিরাজমান। একজন হিজাব-পরিহিতা মহিলার সুইসসমাজে চাকরি পাওয়া বিরাট কষ্টসাধ্য ব্যাপার; চাকরি যদি পেয়েই যায়, তবে তাকে চারজন পুরুষের সমান পরিশ্রম করতে হয়। মুসলমান দেশগুলোতে কিছু একটা হলে বা বিরল কোনও ফতওয়া প্রকাশিত হলে পশ্চিমা-সমাজে আমাদের প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তারা বলে, তোমরা এমন কেন?

প্রশ্ন : সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কেমন?

উত্তর : সুইডেনে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫%, ১৯৯৭ পর্যন্ত মোট তিন লাখ। ডেনমার্কে শতকরা ১% মোট ৭০ হাজার। ফিনল্যান্ডে প্রায় ৩০ হাজার এবং আইসল্যান্ডে এরচেয়ে কম, তবে মোট ১৫০০ থেকে ১৬০০ প্রায়।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ-কথা বলা যাবে কি, পশ্চিমা দেশে ইসলামের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ্! সেখানে দিন দিন ইসলামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। যেমন ধরুন, বসতির দিক থেকে সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহর (মালসুতে) আমাদের সংস্থার অবস্থান। সেখানে আমরা প্রতিমাসে ন্যূনতম একজন পুরুষ অথবা মহিলা নওমুসলিমকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ঠিক এ অবস্থা সুইডেনের অন্যান্য মুসলিম সংস্থাগুলোর। গত পনের বছরে সেখানে সুইস বংশোদ্ভূত নওমুসলিমের সংখ্যা পাঁচ হাজার। নরওয়েতে সেখানকার বংশোদ্ভূত নওমুসলিমের সংখ্যা হাজার থেকে দু হাজারের মত।

প্রশ্ন : সাধারণত পশ্চিমারা ইসলামকে কোন দৃষ্টিতে দেখে?

উত্তর : অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পশ্চিমা সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা গোঁড়ামি ও হঠকারিতা। আর এর মূল কারণ অবাধ স্বাধীনতার লালন। যেহেতু সেখানে প্রত্যেক নর-নারীকে কাজ করে খেতে হয়, সেহেতু সবাইকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। ফলে তাদের সন্তানাদি আদর, ভালোবাসা ও শাসন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অবাধ্যতা, হৃদয়হীনতা ও কঠোরতা জন্ম নেয়। সুতরাং বর্তমান পশ্চিমারা সামাজিক ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে এইডস রোগির মত মৃত্যুর পথযাত্রী। সর্বোপরি সেখানকার মানুষের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি নেই। আর এটাই হচ্ছে তাদের বড় সমস্যা।*

---

* এ. কে. এম. আশরাফুল হক, 'দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড', ৭ জুলাই, ১৯৯৭। দৈনিক ইনকিলাব, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

ডা. আব্দুর রহমান হিউজ

ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি জ্ঞানী-গুণীরা চিরকালই আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় দলে দলে লোক ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। ইসলামের আলো সেখানকার জাহেলি সমাজে দ্রুত ব্যাপ্তিলাভ করছে। আজ সে-সব দেশে যারা ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা জেনেশুনেই এবং সম্পূর্ণ মানসিক শান্তির লক্ষ্যে ইসলামগ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিংশ শতাব্দের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁরা চান ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ ও সার্বিক মুক্তি।

সম্প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যারা ইসলামগ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে অন্যতম আয়ারল্যান্ডের ডাক্তার আব্দুর রহমান হিউজ। তিনি ইসলামের আদর্শ সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তেগ্রহণ করেছেন। তিনি ইসলামকে সঠিকভাবে জেনেশুনেই আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক। তাঁর সাক্ষাতকারটি "আল-খায়রিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : এ-সাক্ষাতকারের প্রথমেই আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করবো যে, আপনার অন্তরে কিভাবে ইসলাম প্রবেশ করলো সে-সম্পর্কে কিছু বলবেন।

ডা. হিউজ : আমার নাম আব্দুর রহমান হিউজ। আমি এক খৃস্টান পরিবারের সদস্য এবং ডাক্তারি হচ্ছে আমার বর্তমান পেশা। প্রায় চার বছর হলো আমি ইসলামগ্রহণ করেছি। আমার ইসলামগ্রহণের ঘটনাপ্রবাহ অনেক বড় ও লম্বা।

এক. আরবি ভাষা এবং বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করবার আমার খুব আগ্রহ ছিল। বিশেষভাবে ইসলাম সম্পর্কে আমার জানাশোনা এবং পড়াশোনা করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কেননা খৃস্টানধর্ম আমাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। আমি খৃস্টান ধর্মকে খন্ডিত ধর্ম হিসেবেই পেয়েছি।

দুই. ইসলামের প্রতি আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হই যখন কায়রো ভ্রমণ করি। সেখানে মসজিদসমূহ দেখি। দেশে ফিরে আসবার পর ইসলাম সম্পর্কিত বেশ

কিছু বইপত্র পড়া শুরু করি। তখন আমি বুঝতে পারি যে, ইসলামই হচ্ছে সার্বিক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

যদিও খৃস্টানধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের শেষনবীর আগে আবির্ভূত, তবুও আমি ইসলামকে দেখলাম সঠিকভাবে যে, এটা খৃস্টানধর্মের চেয়ে অগ্রগামী এবং বেশি আকর্ষণীয়। আমার ইসলামগ্রহণ হচ্ছে খৃস্টানধর্ম থেকে একধাপ উত্তরণ। আমার ইসলামগ্রহণের প্রধান কারণ হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন এবং ইসলামের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

প্রশ্ন : আপনি ইসলামকে কেমন দেখলেন এবং আপনি কি এতে প্রশান্তি বোধ করছেন?

ডা. হিউজ : ইসলামগ্রহণের পর আমি প্রকৃত শান্তি এবং মানসিক স্বস্তি পেয়েছি এবং আমার সম্পূর্ণ জীবনটাই তার প্রকৃতির বা ফিতরাতের দিকে ফিরে গেছে। আমার জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে।

প্রশ্ন : মসজিদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি এবং মসজিদে যেসব মুসলিম ভাইয়েরা থাকেন, তাদের সঙ্গেইবা আপনার সম্পর্ক কেমন?

ডা. হিউজ : মসজিদে যেসব মুসলিম ভাইয়েরা থাকেন বা যাতায়াত করেন, তাদের আমি নিজ পরিবারের মত মনে করি এবং আমার পরিবারের চেয়েও উত্তম মনে করি। আমার দু'টি পরিবার। একটি হচ্ছে আমার নিজস্ব ঘর, অপরটি হচ্ছে মুসলিম-জামায়াত মসজিদের মধ্যে। আমি অনেক সময় সফর থেকে আসলে প্রথমেই মসজিদে যাই, অতঃপর বাসায়।

প্রশ্ন : আপনার ইসলামগ্রহণের ঘোষণার পর আপনি কি নিজপরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজ থেকে কোনওরকমের সমস্যায় পড়েছিলেন?

ডা. হিউজ : স্বভাবতই আমার পরিবারের সঙ্গে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। আমার পিতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলেননি। এখন অবশ্য আমাদের মাঝে বোঝাপড়া এবং মিলমিশ হয়ে গেছে।

আমার সমাজ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আমার সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তির মত আচরণ করেছিল; কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সে-অবস্থা চলে গেছে।

প্রশ্ন : ইসলামগ্রহণ করবার পর আপনি কি অনুভব করেন যে, আপনি কিছু হারিয়েছেন?

ডা. হিউজ : আলহামদুলিল্লাহ। আমি কিছুই হারাইনি। আমার জীবন আগের তুলনায় অনেক ভালো, যদিও আমার কিছু সহকর্মী এবং বন্ধু আমাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মনোবলের কাছে তাঁরা নতি স্বীকার করেছেন।*

---

* রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'রাজশাহী বার্তা', ১৪/৪/১৯৭৮।

মাহমুদ গার্নার এরিকসন

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাকের এবং সালাম তাঁর প্রিয় রসুলের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তাঁর কোনও শরিক নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক ও রাসুল।

সুইডেনের অধিবাসি গার্নার এরিকসন (Gurner Erikson) বলেন : প্রায় ৫ বছর আগে আমার এক বন্ধু পবিত্র কুরআন শরিফ পাঠ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি বন্ধুটির আগেই সুইডিশ ভাষায় অনূদিত একখণ্ড কুরআন শরিফ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসি এবং পড়তে থাকি। লাইব্রেরির কোনও বই পনের দিনের বেশি রাখা যায় না; তাই কয়েকবার করে কুরআন শরিফটি আমাকে ইসু করিয়ে নিতে হয়।

যতই কুরআন পাঠ করতে থাকি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এটা পরমসত্য। ফলে, ১৯৫০ সালের নভেম্বরে ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আমি ইসলামগ্রহণ করি।

ইসলামগ্রহণের দু'বছর পর আমি একদিন স্টকহমের প্রধান লাইব্রেরিতে যাই এবং ইসলাম সম্পর্কিত কোনও বই পুস্তক আছে কিনা সন্ধান করি। সৌভাগ্যক্রমে বেশকিছু বই পেয়ে যাই। সেগুলো ইসু করিয়ে নিয়ে পড়তে থাকি। এ-সব বইয়ের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর কুরআন শরিফের তাফসিরও ছিল। বইগুলো পড়ে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়তে থাকে। আরও বই পড়তে থাকি।

১৯৫২ সালে আমি সুইডেনে একটি মুসলিমসংঘের সংস্পর্শে আসি এবং তাদের সঙ্গে সর্বপ্রথম স্টকহমে ঈদের নামাযে শরিক হবার সৌভাগ্য লাভ করি। অতঃপর ১৩৭২ হিজরিতে ইদুল ফিতরের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমি ইংল্যান্ডে যাই। প্রথম দিনই আমি লন্ডনের ওকিং মসজিদে গিয়ে সেখানকার আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তাঁরা আমাকে উপদেশ দেন সামনের ঈদুল ফিতরের ঈদের

জামায়াতে জনসমক্ষে ইসলামগ্রহণের বিষয় ঘোষণা দেয়া উচিত। আমি তাই করি।

কুরআন পাক অবতীর্ণ হবার পূর্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ইসলামের শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী পড়ে, ইসলাম যে প্রকৃতই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম সে-বিষয়ে আমার সব সন্দেহ কেটে যায়।

ইসলামে এসে আমি পেরেছি— আল্লাহর মনোনীত একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্মে শরিক হতে। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। ইসলামের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে : বিশ্বের বুকে আল্লাহ্ পাক যত নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই বিশ্বাস ও মান্য করতে হবে। আল-কুরআন শুধু আরববাসির জন্য নয়, বিশ্ববাসি সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ্র শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে আল-কুরআনের পূর্বে নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থসমূহে শেষনবীর আগমন সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যত বাণী রয়েছে, তাতে আরবের দুলাল মুহাম্মদ (স) এর প্রতিই স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে বলেছেন, "তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করেছি।"*

* Islam : Our Choice; পৃষ্ঠা ১১২-১১৩।

মুহাম্মদ আসাদ

মুহাম্মদ আসাদ অস্ট্রিয়ার একজন রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইসলামগ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল লিওপোল্ড উইস (Leopold Wiss)।

মুহাম্মদ আসাদ

অস্ট্রিয়ার লিভো (Livow) শহরে ১৯০০ ঈসায়ী সালে এক ইহুদিপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে পোলান্ডে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনি বাইশ বছর বয়সে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি ফ্রেনফোর্টো জৈচু পত্রিকার বৈদেশিক সাংবাদিক হিসেবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে ২৬ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণের পর তিনি সমগ্র মুসলিমবিশ্ব সফর করেন। ১৯৩২ সালে তিনি ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রতিনিধি এবং ইসলামী পুনর্গঠন বোর্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর রচিত Islam at the Cross Roads, Road to Mecca, Principles of State and Govt. in Islam প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়া তিনি কুরআন মজিদ অনুবাদ করেছেন।

ইসলামগ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে আফ্রিকা ও এশিয়া সফর করবার জন্য আমার দেশ অস্ট্রিয়া ছেড়ে রওনা হই। তখন থেকে শুরু করে আমার প্রায় সবটা সময় কাটে মুসলিম প্রাচ্যদেশসমূহে। যেসব জাতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল, গোড়ার দিকে তাদের সম্পর্কে আমার মনোযোগ ছিল নিছক বাইরের লোকের মতো। আমি আমার সামনে দেখতে পেলাম, ইউরোপীয় থেকে আলাদা ধরণের এক সমাজবিধান ও জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং গোড়া থেকে ইউরোপের ব্যস্ত-সমস্ত যান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত-স্নিগ্ধ তথা অধিকতর মানবোচিত জীবনবিধানের প্রতি আমার মনে জাগলো একটা সহানুভূতির ভাব। এ অনুভূতি আমার ক্রমে ক্রমে এ

বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে এবং আমি মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠি।

ইসলামের শিক্ষা কতটা মজবুত আর কতটা বাস্তব, এ সত্য আমি যতবেশি করে উপলব্ধি করতে থাকি, ততই আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা তীব্র হতে থাকে। কেন মুসলমানরা তাদের বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগে বিরত থাকে? লিবিয়ার মরুভূমি থেকে আরব সাগরের মধ্যবর্তী প্রায় সবগুলো দেশের চিন্তাশীল মুসলমানদের সঙ্গে আমি এ-সমস্যার আলোচনা করেছি। ক্রমেই সমস্যাটি আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠলো এবং আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

একদিন ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগান সীমান্তের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক প্রাদেশিক গভর্নর কথায় কথায় আমাকে বলেন, "কিন্তু আপনি যে মুসলিম, তা কেবল আপনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর কথাটি আমার অন্তর বিদ্ধ করলো এবং আমি নীরব থাকলাম।"

১৯২৬ সালে যখন আমি আবার ইউরোপে ফিরে এলাম, তখন আমার মনে হলো, আমার মনোভাবের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হতে পারে ইসলামগ্রহণ করা। তখনই আমি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করি। ইসলামগ্রহণকালে আমার নামকরণ করা হয় মুহাম্মদ আসাদ।

আমার কাছে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের ন্যায়। এর প্রতিটি অঙ্গ অপূর্ব সুন্দরভাবে সাজানো, একে অন্যের পরিপূরক। এতে কোনও কিছু অতিরিক্ত বা কোনও কিছুর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা, অনুশীলন ও আকিদা ঠিক নিজ নিজ স্থানে অতীব প্রয়োজনীয়— এ সত্য আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমি ইসলামকে জানবার জন্য আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ও রাসুলের হাদিস কিছু কিছু পড়েছি। ইসলামের ভাষা ও ইতিহাস এবং ইসলামের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছুই পড়েছি ও জানবার চেষ্টা করেছি। আমি হিজাজ ও নজদে বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঁচ বছরের অধিক সময় কাটিয়েছি। বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে হিজাজ বিখ্যাত। এখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের ভুলত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দর্শন সমগ্র মানবজাতির জন্য এক বিস্ময়কর চালিকাশক্তি (Driving Force)-যা জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র পরীক্ষিত। বর্তমানে আমি ইসলামী শক্তির পুনর্জাগরণের কাজে সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে ইচ্ছুক। দুনিয়ার বুকে একমাত্র ইসলামই শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে— এ বিষয়ে আমি পূর্ণ আশাবাদী।*

* Islam : Our Choice.

ড. আব্দুল করিম জার্মানুস

আমি বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় আমার দেশ হাঙ্গেরি রণাঙ্গনে পরিণত হয়। সুতরাং আমিও আমার স্বদেশ প্রতিরক্ষার জন্য সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করি। বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি। এখানে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস অধ্যয়নকালে আরবের ইতিহাস আমার চোখে পড়ে। বিশেষ করে নবীজীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। পিতা জন্মের পূর্বে ও মাতা শিশুকালেই পরলোকগমন করেন। প্রথমে তাঁর দাদা, পরে তাঁর চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন। তাঁর আপন পরিবার-পরিজন ও স্বগোত্রের লোকেরা তাঁর শত্রু ছিল। স্বদেশবাসিরা তাঁর এত বেশি বিরোধিতা করেছে যে, শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বীয় জন্মভূমি অর্থাৎ মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে হিজরত করতে হয়েছে। অতঃপর মদিনাতেও তাঁকে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে দেয়া হয়নি। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর উপর্যুপরি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা ছিলেন আরব উপদ্বীপের অসহায়, দুর্বল ও নির্বাসিত লোক। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রদর্শিত দীন ইসলাম কেবল আরবেই বিস্তার লাভ করেনি, বরং সমকালীন যে দু বৃহৎ শক্তির মুদ্রা গোটা বিশ্বে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ কায়সর ও কেসরাকে তাঁরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। এ থেকেই এ বিস্ময়কর দাওয়াত ও তাঁর মহান আহবায়কের মোহনীয় ব্যক্তিত্ব আমার স্নায়ু, মন, মগজ এবং চিন্তা-কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অতএব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-

করিম জার্মানুস

জীবন সমাপ্ত করবার পরেও আমার মনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ দীন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে আরও জানবার আগ্রহ দেখা দেয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করবার পর তুর্কিভাষা শেখার উদ্দেশ্যে আমি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এখানে আমি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় বিশিষ্টতা লাভ করি। অতঃপর বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমি অনুভব করি যে, তুর্কিভাষা শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং এ বিস্ময়কর দাওয়াতের মূল উৎস অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন করবার সিদ্ধান্ত নেই। সমকালীন দু'টি ইংরেজি অনুবাদ আর অন্যটি হচ্ছে রাণী ভিক্টোরিয়াকৃত অনুবাদ। কিন্তু অধ্যয়নকালে উভয় অনুবাদই প্রাণহীন নির্জীব মনে হয়। মনে হলো যে, কুরআনের ঐশী বাণীর অলংকার, আরবি ভাষা ও শব্দালংকার এতে অনুপস্থিত।

সুতরাং আরবি অভিধান ও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে আরবি ভাষা শিখে নিয়ে পবিত্র কুরআনের আত্মা ও ঈমান বিকাশী মর্মবাণী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও অভিধানের সাহায্যে বিখ্যাত আরবি তাফসির বায়যাবির কিয়দাংশ অধ্যয়ন করি। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাস, আরবি সাহিত্য ও প্রচুর হাদিস সংকলন পড়ে ফেলি। তখন বুঝতে বাকি রইলো না যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ একান্তই সত্য। এতে কোনওপথেই বাতিলের প্রবেশের অবকাশ নেই।

আর বাস্তবিকই এটা এক মহাপ্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রশংসারযোগ্য এক মহান সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং মানুষের জীবনের দিশারী ও কল্যাণময় জীবন-বিধান।

প্রাচ্যের দেশসমূহ ভ্রমণ ও ইসলামগ্রহণ

এরপর দীন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মতামত ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত হবার উদ্দেশ্যে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করি। অতঃপর প্রাচ্যের দেশসমূহ ভ্রমণে বের হই। এ উপলক্ষে আমি চারবার তুরস্কে যাই। তখন ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার জন্য তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে আমি তিন বছর অধ্যাপনা কর্মে নিয়োজিত থাকি। এ সময় আমি সারা হিন্দুস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সফর করি। অবশেষে আমি সেই সত্যের আলো লাভে সক্ষম হই, যার জন্য

আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। যার রশ্মি নবীজীবনের ইতিহাস অধ্যয়নকালে আমার হৃদয়কে আলোকিত করে। বিখ্যাত মুসলিমনেতা ডাক্তার মোখতার আহমদ আনসারির আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লির জামে মসজিদে হাজার হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে আমি ইসলামকবুল করি। আমার ইসলামী নাম রাখা হয়েছে 'আব্দুল করিম জার্মানুস'। দিনটি ছিল পবিত্র জুম্মাবার। সেদিন জুমার খুতবায় ইমামসাহেব আমার ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

কাবার পথে

ইসলাম কবুল করবার পর আমার হৃদয়-মন আরব-বিশ্ব তথা মিসর ও হিজাজ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিন বছরের অনবরত চেষ্টার ফলে শেষপর্যন্ত আমার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ করে। ইসকানিরিয়া বন্দরে মিসরি কুলিদের আরবি ভাষার কথাবার্তা আমার কানে খুবই মধুর লাগে। হজ্বের মৌসুম পর্যন্ত আমি কায়রোতেই অবস্থান করি। এরপর পবিত্র হিজাজ ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করি।

শায়খুল আজহারের সঙ্গে সাক্ষাত

মিসরে অবস্থানকালে একদিন আমি শায়খুল আজহারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। আধুনিক যুগের রেওয়াজ অনুসারে তাঁর সেক্রেটারি আমার হাতে একটি চিরকুট দিলে, তাতে আমি আমার নাম, ঠিকানা ও মোলাকাতের উদ্দেশ্য লিখে দেই। সে-চিরকুটটি তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। শায়খুল আজহারের সঙ্গে সাক্ষাতকালে আমি মহানবী (স) এ হাদিসটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "তোমরা পদে পদে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের আচরণ অবলম্বন করবে। এমনকি তাঁরা যদি জালের খাদেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরা তাই করবে।" আপনারা ঈসায়ীদের আচরণ-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি অবলম্বন করছেন। আপনাদের কোনও মুসলমান ভাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলে আপনারা তাকে অপেক্ষা করান। তার নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন, অতঃপর ইচ্ছা হলে দেখা করতে দেন, অন্যথায় আপনাদের লোক কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে তাকে হতাশ করে বিদায় করে দেয়। অথচ মহানবী (স) ও তাঁর পুণ্যবান সাহাবারা (রা) মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। দেশ-বিদেশ থেকে দূরের-কাছের কোনও বন্ধু দীনের মাসয়ালা জানতে আসলে স্বয়ং মহানবী (স) তাকে সাদর সম্ভাষন করতেন। আপনিও তো সেই নবীরই উত্তরাধিকারী এবং তাঁর আদর্শের সংরক্ষক। কেন আপনি সেই

মহানবী (স)-এর সুন্নত আমল করবার পরিবর্তে ঈসায়ীদের আচার-আচরণ অবলম্বন করছেন? শায়খুল আজহারের কাছে আমার এ প্রশ্নের জবাব নীরবতা অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ অতি নগণ্য ব্যক্তি মিসরের বিভিন্ন উলামা ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছে এবং সেখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকায়ও একধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছে। এগুলোতে ইসলাম ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমার অন্তরের অনুভূতি ও আবেগ অভিব্যক্ত হয়েছে।

হজ্ব সমাপন

হজ্বের মৌসুমে আমি পবিত্র হিজাজ ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করি। সেখানে পৌঁছে মহানবী (স)-এর জন্মভূমিকে ঠিক তেমন দেখতে পাই, যেমন ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পড়েছি। খেজুরের বাগান, পশমের তৈরি তাবু ও উটের প্রাচুর্য। এ দৃশ্য আমার কাছে খুবই মনোরম লাগে। মাতোয়ারা হয়ে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করেছি। প্রিয় হাবিবের রওযা মোবারকে গিয়ে হাজিরা দিয়েছি। হিজাজ ভূমিতে অবস্থানকালে সউদি রাজবংশের স্থপতি আব্দুল আজিজ আস সউদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি। সমকালীনদের মধ্যে বীরত্ব, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং সদ্ব্যবহারের দৃষ্টিতে তিনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ওপর এক দীর্ঘ নিবন্ধও রচনা করেছি। রচনাটি হিজাজ থেকে প্রকাশিত আরবি পত্রিকা 'সওতুল হিজাজ' এ প্রকাশিত হয়েছে।

'আল্লাহু আকবর' রচনা

চার বছর বিদেশভ্রমণের পর অর্থাৎ তিন বছর হিন্দুস্তানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং দেশভ্রমণান্তে এক বছর পবিত্র আরবভূমিতে অবস্থান করে স্বদেশে ফিরে এসে বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। দেশে ফিরে 'আল্লাহ্ আকবর' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। এটা একটা ভ্রমণকাহিনী। এতে মিসর ও হিজাজ ভূমির ভ্রমণ-কাহিনী, বিভিন্ন ঘটনাবলী ও হজ্বের করনীয় বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে আমি ইসলামের ইতিহাসও বর্ণনা করেছি এবং জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের নির্বাচিত আরবি কবিতার পদ্যানুবাদও সংযোজিত করেছি। অতএব এ-গ্রন্থ আরবি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রন্থটি আমি হাঙ্গেরীয় ভাষায় রচনা করেছি। অতঃপর এটি জার্মান, ইটালিয়ানসহ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।*

---

* লুৎফর রহমান ফারুকী, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৭/৪/১৯৯৮।

আহমদ দিদাত

এক সময় যিনি ছিলেন খৃস্টান ধর্মযাজক, খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং লোকদের খৃস্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত করা ছিল যার একসময়ের সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা, তিনি এখন তাঁর জীবনের শেষভাগ বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের খিদমতে। ইসলামই এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, ইসলামই এখন তাঁর সাধনা।

আমাদের আলোচিত এ ব্যক্তিটির নাম আহমদ দিদাত। তাঁর পূর্বপুরুষ এক সময় ছিলেন ভারতের অধিবাসী। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অনাবাদী এলাকা আবাদ করবার প্রয়োজনে বহিরাগতদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছিল প্রচুর। সেই বহিরাগত যদি খৃস্টানধর্মের অনুসারী বা খৃস্টধর্মগ্রহণকারী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার দ্বার ছিল অধিক পরিমাণে প্রশস্ত। আহমদ দিদাতের পূর্বপুরুষ এই সুবিধাদি লাভের আশায় ভারতভূমি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন বনজঙ্গলে আকীর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকায়।

বংশের মুরুব্বীরা আহমদকে খৃস্টধর্মের পন্ডিত ও ধর্মীয় কাজের পুরোধা হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের আশা পূরণ করে আহমদ বেড়ে ওঠেন যাজকরূপে, শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তা-ভাবনায় সম্পূর্ণভাবে তিনি হতে থাকেন খৃস্টানধর্ম প্রচারক। তাঁর তখন একটাই মনোবাসনা, কী করে খৃস্টধর্মকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া যায় বাতাসের মতো। কি করে ত্রিত্ববাদে দীক্ষিত করা যায় দুনিয়ার অগণিত অখৃস্টান মানুষকে। এমনি ধরনের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তিনি যখন ময়দানে নামলেন, নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝেও এগিয়ে যেতে থাকলেন প্রতিনিয়ত; তখন মুসলমান পন্ডিত তথা আলেমসমাজের সঙ্গে তাঁর খুব তাড়াতাড়ি মোকাবিলা করবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নিজজ্ঞানে প্রগাঢ় আস্থা থাকায় তিনি বিষয়টিকে মোটেই ধর্তব্য বলে বিবেচনা করলেন না।

কিন্তু তাঁর এ আস্থাতে চিড় ধরলো অচিরেই। খৃস্টধর্মের অসারতা প্রমাণ করে লেখা একটি বই তাঁর হস্তগত হলো। তিনি খুব হেলার সঙ্গে বইটি হাতে নিলেন। বইটির নাম 'ইজহারে হক' (সত্যের প্রকাশ)। বইটির লেখক মাওলানা

রহমতুল্লাহ কিরানভী। ভারতবর্ষের এক আলেম এ রহমতুল্লাহ। তিনি ছিলেন এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)-এর সমসমায়িক ও একই পথের পথিক। শায়খ এমদাদুল্লাহ (র)-এর ভারতবর্ষ থেকে হিজরতের মুহূর্তে তিনিও ছিলেন তাঁর সহযাত্রী।

বইটি তিনি বারবার উপেক্ষা করেন, কিন্তু পড়তে গিয়ে চমকে গেলেন দিদাত। খৃস্টধর্মের ওপর আরোপিত অভিযোগ খন্ডন করা তাঁর কাছে দুঃসাধ্য বোধ হতে লাগলো। তিনি মনোযোগের সঙ্গে বইটি পড়তে লাগলেন আর এ অকাট্য দলিল স্বীকার করে নিতে থাকলেন অবচেতন মনে। নিজ জ্ঞানের অহমিকা তাঁর খান খান হয়ে যেতে লাগলো। খৃস্টধর্ম প্রচারের স্বপ্ন তাঁর ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। ক্রমেই ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হতে থাকলো তাঁর অন্তরে। তিনি বুঝলেন, এক মরীচিকার কুহেলিকায় বিভ্রান্ত হয়ে উদ্ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। তিনি যেটিকে সত্য ভেবেছেন, তাতো সত্য নয়।

বিভ্রান্তির সকল পর্দা তাঁর সামনে থেকে সরে গেল। তিনি ইসলামের সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলেন। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন কালেমায়ে তাইয়্যিবা।

নতুন ব্যক্তি এখন নতুন কাজ নিয়ে মাঠে নামলেন। বাতিলের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে এখন তিনি ইসলামের সেবক। ইসলামের দাওয়াত-কর্মী। তিনি বুঝলেন, যেপ্রচেষ্টা ও প্রয়াস তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামের বিরুদ্ধে, এখন তাঁর চেয়ে অধিক শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করা আবশ্যক ইসলামের পক্ষে। তিনি যে সকল লোকের মাঝে খৃস্টধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন, এখন তাদের মাঝে তার অসারতা ও ইসলামের সত্যতা তুলে ধরতে হবে বলিষ্ঠভাবে। আর সেই সঙ্গে খৃস্ট-ধর্মযাজকদের মাঝে ইসলামের আওয়াজ তুলে ধরতে হবে এমনভাবে যেন তাদের মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় ও দিদাতের ন্যায় তাদেরও অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, সত্য পর্যবেক্ষণে উৎসাহী ও উদ্যমী হয় তারা। অতএব তাদের সঙ্গে সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা ও প্রয়োজনে বিতর্কের জন্যও প্রস্তুতি নেন তিনি। আর তাই আজ খৃস্টান ধর্মীয় জগতে আহমদ দিদাত এক মহাত্রাস। তাঁর উপস্থিতি গোটা খৃস্টজগতের জন্য এখন মূর্তিমান হৃদকম্প।

আহমদ দিদাত বিশ্বাস করেন, শুধু কথার মধ্যেই এ প্রচারকার্য সীমিত নয়, লেখনিও অনেকক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তিনি লেখার জগতেও উল্লেখযোগ্য অংশ নিচ্ছেন। ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদের ওপর আহমদ দিদাতের লেখা বক্তৃতা ও বিতর্কে এক সংগ্রামী আপোসহীন অভিব্যক্তি প্রকাশ

ক্যাথলিক পাদরি ঈসা

বুলগেরিয়ার একজন উচ্চ পর্যায়ের খৃস্টান ধর্মযাজক ছিলেন ঈসা। সম্প্রতি গোপনে তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন। সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন ছাত্রকে বুঝিয়ে আরও দু'জনকে ইসলামে দীক্ষিত করে সাফল্যের আরেক ধাপ এগিয়েছেন তিনি। ঈসা ছিলেন একজন ক্যাথলিক। ভ্যাটিকানে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রচুর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই ক্যাথলিকরা তাঁকে সাজর ও বুমাক সম্প্রদায়কে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। ওদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ।

মুসলিমবিশ্বের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পত্রিকার সৌজন্যে পাদরি ঈসার ইসলামগ্রহণ সংক্রান্ত সংবাদ জ্ঞাত হয়ে আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক 'আল-মুসলিমুন'-এর প্রতিনিধি সোফিয়ার কোনও একটি স্থানে তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হন। তখন তিনি ইসলামগ্রহণ সংক্রান্ত সবিস্তার বর্ণনা দেন এবং এ-যাবত তা গোপন রাখবার কারণগুলোও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তাঁর ইসলাম সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় একটি ক্যাথলিক গির্জায় অধ্যয়নকালে। তিনি যখন অবগত হলেন যে, গির্জার সমৃদ্ধ লাইব্রেরির বিপুল গ্রন্থ সমাহারে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনা সম্বলিত একটি পুস্তকও রাখা হয়নি; তখন তাঁর অনুসন্ধিৎসার চেতনা জেগে ওঠে। আর এটাই তাঁকে ইসলাম সম্বন্ধে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তিনি প্রবৃত্ত হন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পর্যালোচনা; বিশেষত তিনটি ধর্ম নিয়ে। বাইবেল ও ইঞ্জিল ছিল তাঁর পুরোটাই মুখস্ত; এমনকি এ-দুটোতে যেসব মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলোর অলীকতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পূর্ণ অবহিত। তাই পবিত্র কুরআনের আলোচনা ও খৃস্টানদের কথিত ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর হলেন তিনি। এ পর্যায়ে এসেই সময় আর প্রলম্বিত হয়নি। তিনি ইসলামের স্নিগ্ধ হিদায়েতে নিজেকে ধন্য করে তোলেন। অতঃপর একটি গোপন স্থানে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করতে ও ধর্মান্তর কাজে

লিপ্ত মিশনারিদের তৎপরতা এবং গতিবিধি সম্পর্কে তাদের অবগত করতে থাকেন, যেন তাঁরা সজাগ হতে পারে তাঁর সহায়তায়। কিন্তু এ-ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে ওরা তাঁর জীবননাশ করতে পারে, এ ভয়ে তিনি কখনও মসজিদে যাবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। তিনি বলেন, তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে তিনি ইসলাম পেশ করে চলেছেন এবং ইতোমধ্যে সোফিয়া ভার্সিটির পূর্বোক্ত দু'জন ছাত্রকে ইসলামে আনতে সফলও হয়েছেন।

মুহাম্মদ ঈসা ইঙ্গিত দেন যে, বুলগেরীয় জনগণের বড় অংশই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট; প্রকৃতপক্ষে একসময় তারা মুসলমানই ছিল। ইসলামত্যাগে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। তিনি 'আলমে-ইসলামী'র দাওয়াতকর্মীদের বুলগেরিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহবান জানান। তাছাড়া মুসলমানদের বৈষয়িক সমস্যাসমূহ নিরসনকল্পেও তাদের মাঝে দীনী শিক্ষা প্রচারে এগিয়ে আসবার জন্যও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বুলগেরিয়ার প্রধান মুফতি ড. নাদিম জানদিফ সেখানে একটি উচ্চপর্যায়ের আরবি ভাষা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি কমিউনিস্টদের বন্ধ করে দেয়া প্রসিদ্ধ 'নওয়াব' মাদরাসাটির অভাব পূরণ করবে। এ মাদরাসার ভূমিকার কারণেই কমিউনিস্টরা সেদেশের বহুসংখ্যক উলামাকে আপন মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল। মুফতি ড. নাদিম-এর প্রতিষ্ঠিত নতুন এ ইনস্টিটিউটটির শিক্ষাকোর্স চার বছরের এবং শিক্ষকসংখ্যা পনের। চারজনই আরব। প্রথমবারেই এখানে ৬০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। একটি ফতোয়া বিভাগও চালু হয়।*

* মুসলিম জাহান, ১ম বর্ষ, ২২তম সংখ্যা এবং 'কেন মুসলমান হলাম?'

আবদুর রহিম মরটিনি

প্রত্যেক মানুষের রয়েছে একটা অনুসন্ধিৎসু মন। এ মানবহৃদয়ের মধ্যে এমন অনেক মন বা হৃদয় আছে, যাদের মধ্যে থাকে সত্য জানবার অদম্য স্পৃহা। এসব মন যেখানে সত্য পায়, সেই সত্যকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে এবং অনেক হৃদয় তা গ্রহণও করে। উষর মরুতে বারিবর্ষণ হলে মরুবায়ু যেমন পুলকিত হয়, তেমনি সত্যানুসন্ধানী হৃদয় সত্য পেয়ে আনন্দিত হয়।

আব্দুর রহিম মরটিনি এমনি এক সত্যানুসন্ধানী হৃদয়ের অধিকারী। তিনি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ফিলিপাইনের অধিবাসি। এসেছেন সউদি আরবে। ছিলেন খৃস্টান পাদরি। এখন ইসলামের একজন মুবাল্লিগ। সউদি গেজেটের বিশেষ প্রতিনিধিকে তিনি এক সাক্ষাতকার দেন। সাক্ষাতকারটি এখানে তুলে ধরা হলো সাক্ষাতকারগ্রহণকারীর ভাষায় :

আব্দুর রহিম মরটিনি প্রথমেই আমাকে মুগ্ধ করলেন তাঁর মধুর ব্যবহার দিয়ে। আমি তাঁর কাছে বসলাম, আলাপ শুরু করলাম এবং তাঁর সফর সম্পর্কে কিছু বলবার অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, "আমি ফিলিপাইন থেকে যাত্রা করে আমার গন্তব্যস্থল এ পবিত্র দেশে এসেছি। আমার খুব ভালো লাগছে। চিত্তে প্রশান্তি পাচ্ছি। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি সত্যকে জানবার জন্য। তাঁর অসীম রহমতেই তা সম্ভব হয়েছে।" জনাব রহিম একথা বলবার পর কিছুক্ষণ ভাবলেন। ফিলিপাইনের এ নওমুসলিম পূর্বে ছিলেন একজন খৃস্টান পাদরি। দশ বছর তিনি ধর্মযাজকের কাজ করেছেন। খৃস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে ধর্মযাজক হবার পর। তাঁর প্রথম সন্দেহ : মানুষ কিভাবে ত্রিত্ববাদী হতে পারে? একজন পাদরি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষের পাপ কিভাবে মোচন করতে পারেন? এটি কি সম্ভব যে, যিশু মানব- জাতিকে পাপমুক্ত করবেন? সন্ন্যাস জীবনতো মানবধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন। এটি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য?

আবদুর রহিম বলেন, "খৃস্টধর্মের ওপর এসব প্রশ্ন আমার মনে জাগে। যিশু নাকি খোদার পুত্র;— এটা কিভাবে সম্ভব? আমি এটা মেনে নিতে পারছিলাম না।

সউদি আরবে যখন আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করি তখন এসব প্রশ্ন আমাকে আন্দোলিত করে। কর্মরত অবস্থায় একজন সউদি যুবকের সঙ্গে পরিচিত হই। পরে সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হয়ে যায়।

এ বন্ধু আমাকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের ওপর প্রণীত দু'টি পুস্তক দেন। বই দু'টি পাঠ করবার পর আমার সন্দেহ দূর হতে থাকে; সত্য পেতে শুরু করি।

আমি সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে জানতে পারি এবং এ বিশ্বাস আমার জন্ম নেয় যে, তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। ঈসা (আ), মুসা (আ) ও মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত রসূল। আরও বুঝতে পারি, যারা নবীর পথে চলবে তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর যারা অন্যায় পথে চলবে তাদের জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

আমি জানতে পারলাম, শেষনবী (স)-এর পথই একমাত্র শুদ্ধ পথ। আল-কুরআন আমাদের চলবার একমাত্র গাইড। আমি ইসলামগ্রহণ করলাম। সত্য গ্রহণ করে নিলাম। আমার মনের সকল সন্দেহের অবসান হলো।"

বড় বড় পাদরিরা তাঁকে শিখিয়েছিল যিশুকে কিভাবে উপাসনা করা যায়। আর ইসলামগ্রহণ করবার পর তিনি জানলেন, "যিশু আল্লাহর এক বান্দাহ ও প্রেরিত নবী।"

ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন।

আমি তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করলেন, "আমি যদি দেশের খৃস্টান ধর্মযাজকদের মুসলমান করতে পারতাম এবং ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছাতে পারতাম তা হলে আমার জীবনকে সার্থক মনে করতাম।"

"যদি আমি তাদের সাক্ষাত পাই তাহলে আমি তাদের এ সত্য দীনের দাওয়াতই দেবো, সত্যের দিকে আহবান করবো।"*

---

* মুসলিম জাহান; ১ম বর্ষ, ৩৪তম সংখ্যা ও কেন মুসলমান হলাম? পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

কার্নস মুন এম

মি. কার্নস মুন এম আর্জেন্টিনার সাবেক প্রেসিডেন্টের বড় ছেলে। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সনের জুন মাসে এক হেলিকপ্টর দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইননালিল্লাহি ওয়া ইননা ইলাইহি রাজিউন)।

ইসলামী রীতিতে তাঁর গোসল কাফন দেবার পর রাজধানী বুয়েন্স আয়েরস-এর মুসলিমকবরস্থানে তাঁকে পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। আর্জেন্টিনার ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রেসিডেন্টভবন কুরআন তেলাওয়াতে মুখরিত হয়ে ওঠে। পূর্ণ ইসলামী রীতিনীতিতে লাশের গোসল ও কাফন দেবার পর তা ইসলামিক সেন্টারে নিয়ে জানাযা আদায় ও পরে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মুসলিমগোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ, সেনাবাহিনীর প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সর্বশ্রেণীর সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ সমবেত হয়ে মরহুমের প্রতি শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশের রেডিও, টেলিভিশন এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইসলামে দীক্ষিত প্রেসিডেন্ট-পুত্রের জীবনী, ইন্তেকালের খবর ও ইসলামী রীতিতে দাফন-কাফনের কথা প্রচার করে। প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদে সরকারি উদ্যোগে মুনের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে প্রতিবছর অবিরাম কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়। এ ঘটনা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং জনগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।*

---

* আরবি সাপ্তাহিক আখবার আলম-আল-ইসলামী ও কেন মুসলমান হলাম?, পৃষ্ঠা-১১৩।

ISBN 978-984-90108-3-8